সংসার।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত।

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

Price: In paper cover Rs. 1-4; cloth bound Rs. 1-8.

কলিকাতা।

২৯, বিডন্ ষ্ট্রীট "এল্ম্ প্রেসে"

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ পত্র।

এই শতাব্দীতে যাঁহারা হিন্দুদিগের পথপ্রদর্শক
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,

হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহারা স্বদেশীয়দিগকে
শিক্ষা দান করিয়াছেন,

সামাজিক উন্নতি ও জাতীয় ঐক্যসাধন বিষয়ে
যাঁহারা আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন,

বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্য যাঁহারা স্বহস্তে
সৃষ্ট ও ভূষিত করিয়াছেন,—

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,
ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—

এই মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করিলাম।

চৈত্র সংক্রান্তি,
১২৮২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গরিবের ঘরের দুটী মেয়ে।

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের অনতিদূরে একটী বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনবান্ জমিদার প্রজাদিগের হিতার্থ এবং আপনার কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য সেই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন; সেকালে অনেক ধনবান লোকই এরূপ হিতকর কার্য্য করিতেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তাল গাছে বেষ্টিত, এত ঘন যে দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণী প্রায় অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোনও বড় নগর নাই, কেবল একটী সামান্য পল্লি আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ ও দুই চারি ঘর কুমার, এক ঘর কামার, ও কতকগুলি সদোগাপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। একখানি মুদির দোকান আছে তাহাতে গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যোগায়, এবং তথা

হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটী হাট বসে বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোকে সেই হাটে যায়। পুষ্করিণীর নাম "তালপুখুর," এবং সেই নাম হইতে গ্রামটীকেও লোকে তালপুখুর গ্রাম বলে।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের একজন নারী কলস লইয়া সেই পুখুরে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুইটী কন্যাও গিয়াছিল।

রমণীর বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, বড় কন্যাটীর বয়স ৯ বৎসর ছোটটীর বয়স ৪ বৎসর হইবে।

সন্ধ্যার সময় সে পুখুর বড় অন্ধকার হইয়াছে এবং সেই অন্ধকারে সেই ভীম বৃক্ষ শ্রেণী আকাশে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে ও সেই অন্ধকারময় তাল বৃক্ষগুলি সাঁই সাঁই করিয়া শব্দ করিতেছে, নির্জ্জনে সে শব্দ শুনিলে সহসা মন স্তম্ভিত হয়। পুখুরে আর কেহ নাই, রমণী ঘাটে নামিয়া কলসী নামাইলেন, মেয়ে দুটীও মার নিকট দাঁড়াইল।

কলস নামাইয়া নারী একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দিনের পরিশ্রমের পর একবার বিশ্রামসূচক দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। আকাশের অল্প আলোক সেই শান্ত নয়নদ্বয়ে পতিত হইল, সন্ধ্যার বায়ু সেই পরিশ্রমে ক্লান্ত ঈষৎ স্বেদযুক্ত ললাট শীতল করিল এবং সেই চিন্তাঙ্কিত মুখ হইতে দুই একটী চুলের গুচ্ছ উড়াইয়া দিল। নারী দিনের পরিশ্রমের পর একবার আকাশের দিকে দেখিয়া, সেই শীতল বায়ু স্পৃষ্ট হইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন,

"মা বিন্দু, একবার সুধাকে ধর ত, আমি একটা ডুব দিয়ে নি।"

বিন্দুবাসিনী। "মা আমি ডুব দেব।"

মাতা। "না মা এত সন্ধ্যার সময় কি ডুব দেয়, অসুখ করিবে যে।"

বিন্দু। "না মা অসুখ করিবে না, আমি ডুব দেব।"

মাতা। "ছি মা তুমি সেয়ানা হয়েছ, অমন করে কি বায়না করে। তুমি জলে নামিলে আবার সুধা ডুব দিতে চাহিবে, ওর আবার অসুখ করিবে। সুধাকে একবার ধর, আমি এই এলুম বলে।"

মাতার কথা অনুসারে নবম বৎসরের বালিকা ছোট বোন-টীকে কোলে করিয়া ঘাটে বসিল। সন্ধ্যাকালের অন্ধকার সেই ভগ্নী দুটীকে বেষ্টন করিল, সন্ধ্যার সমীরণ সেই অনাথা দরিদ্র বালিকা দুটীকে সযত্নে সেবা করিতে লাগিল। জগতে তাহাদের যত্ন করিবার বড় কেহ ছিল না, মুখ তুলিয়া তাহাদের পানে চায়, একটু মিষ্ট কথা ব[illegible] একটু [illegible]না ক[illegible] এরূপ লোক বড় কেহ ছিল না।

বিন্দুবাসিনীর মাতা কায়েতের মেয়ে, হরিদাস মল্লিক নামক একটী সামান্য অবস্থার লোকের সহিত বিবাহ হইয়া ছিল। তাঁহার ২০। ২৫ বিঘা জমি ছিল, কিন্তু কায়স্থ বলিয়া আপনি চাষ করিতে পারিতেন না, লোক দিয়া চাষ করাইতেন, লোকের মাহিনা দিয়া জমিদারের খাজনা দিয়া বড় কিছু থাকিত না; যাহা থাকিত তাহাতে ঘরের খরচের ভাতটা হইত মাত্র। অনেক কষ্ট করিয়া অন্য কিছু আয় করিয়া কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ

করিতেন। তারিণীচরণ মল্লিক নামক তাঁহার একটী খুড়তুত ভাই বর্দ্ধমানে চাকরি করিতেন, কিন্তু এক্ষণে খুড়তুত ভাইয়ের নিকট সহায়তা প্রত্যাশা করা বৃথা, আপনার ভাইয়ের নিকট কদাচ সহায়তা পাওয়া যায়। তবে বিপদ আপদের সময় তাঁহাকে অনেক ধরিয়া পড়িলে ৫। ১০ টাকা কর্জ্জ পাইতেন, শোধ করিতে পারিলে তিনি ভাই বলিয়া সুদটা ছাড়িয়া দিতেন। বিবাহের প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর পর তাঁহার একটী কন্যা হয়, এতদিনের পরের সন্তান বলিয়া বিন্দুবাসিনী পিতা মাতার বড় আদরের মেয়ে হইল। কিন্তু আদরে পেট ভরে না, বিন্দু গরিবের ঘরের মেয়ে, আদর ও পিতামাতার ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু পাইল না। বিন্দুর বড় জেঠা তারিণী বাবু যখন পূজার সময় বাড়ীতে আসিতেন তখন মেয়ের জন্য কেমন ঢাকাই কাপড়, কেমন হাতের নূতন রকমের সোণার চুড়ি, কেমন কাণের কাণবালা আনিতেন, বিন্দুর বাপ মা অনেক কষ্টে মেয়ের জন্য দুগাছি অতি সরু সোণার বালা ও দুই পায়ে দুই গাছি রূপার মল, গড়াইয়া দিলেন। বিন্দুর বাপের সেজন্য কিছু ধার হইল, অনেক কষ্টে সে ধার শোধ করিতে পারিলেন না, একটী গরু বিক্রয় করিয়া তাহা পরিশোধ করিলেন। বিন্দু জেঠাইমার মেয়ের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতে যাইত। বিন্দু ভাল মানুষ কখনও কাহাকে রাগ করিয়া কথা কহিত না, সুতরাং সেও বিন্দুকে ভাল বাসিত, কখন কখন সন্দেশ খাইতে খাইতে একটু ভাঙ্গিয়া দিত, কখন মেলায় অনেক পুতুল কিনিলে একটী সোলার পুতুল দিত। বিন্দুর আনন্দের সীমা থাকিত না, বাড়িতে আসিয়া কত হর্ষের সহিত মাকে দেখাইত;

বিন্দুর মা বিন্দুকে চুম্বন করিতেন আর নিজের চক্ষের এক বিন্দু জল মোচন করিতেন।

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পর তাহার একটী ভগ্নী হইল। বড় মেয়েটী একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের রং পরীর মত, চক্ষু ছুটী কাল কাল ভ্রমরের ন্যায় সুন্দর ও চঞ্চল, মাথায় সুন্দর কাল চুল, লাল ঠোঁট ছুটীতে সদাই সুধার হাসি। গরিবের এই অমূল্য ধনকে গরিব বাপ মা চুম্বন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না, বরং ছুইটী মেয়ে হওয়াতে বাপ মার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্য একটু তুদ চাই; এমন সুন্দর মেয়ের হাত ছুখানি খালি রাখা যায় না, ছুই এক খানা গয়না হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়িশীর বাড়ী লইয়া যাইবার সময় একখানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয়। কিন্তু এ সব ইচ্ছা পূরণ হয় কোথা থেকে? বাপ মার মনে কত সাধ হয় কিন্তু উপায় কৈ? গরিব ছুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কন্যা ছুটীকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যা ছুটীকে খাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুঁখুরে যাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া কন্যা ছুটীকে লইয়া সেই সুন্দর বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকাল বেলা পুন-

ন্নায় রন্ধনাদি সংসার কার্য্য করিতেন। তথাপি এসংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা কয়জন সুখী। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা একজন, তাঁহার কষ্ট থাকিলেও তিনি সদা-শিবের ন্যায় স্বামী পাইয়াছিলেন, হৃদয়ের মণির ন্যায় দুইটী কন্যা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তি ভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাঁহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ম্বনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পর হরিদাসের কাল হইল। হতভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র পল্লি কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান্ কেন এ দরিদ্রের একটী ধন কাড়িয়া লইলেন,—কেন এ হতভাগিনীর একটী সুখ হরণ করিলেন এ আঁধারের একটী দীপ নির্ব্বাণ করিলেন? বিধবার আর্ত্তনাদ শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা মজুরগণ সেইপথ দিয়া যাইবার সময় একটী অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরি-দাসের যে জমী ছিল তাহা তারিণী বাবু এখন চাষ করান, বৎসরের শেষে হাত তুলিয়া যাহা দেন বিন্দুর মাতা তাহাই পায়। তাহাতে উদরপূর্ত্তি হয় না, মেয়ে দুটীকে মানুষ করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটীর বিক্রয় করিয়া ভাসুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত, বিন্দু ও সুধাকে ফেলিয়া বাড়ীর

ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাঁট্ দিতেন। তাহা ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথার উত্তর দিতেন না, তিরস্কারে ক্ষুণ্ণ হইতেন না, কখন কখন তাঁহার মৃত স্বামীর নিন্দা করিলে বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি নীরবে পাক ঘরে আসিয়া চক্ষুর জল মুছিতেন। ভাবিতেন "আহা! আমার বিন্দু ও সুধা মানুষ হউক, হে বিধাতা, তুমি ওদের কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয় আমি নিজের দুঃখ নিজের অপমান গ্রাহ্য করি না। আহা যেন বিন্দু ও সুধাকে বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি,—তাহা হইলেই আমার সুখ।"

* * * *

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল কাঁকে লইয়া বলিলেন "আয় মা বিন্দু ঘরে আয়, সুধাকে কোলে নে, আহা বাছার ননির শরীর এই টুকু এসে ক্লান্ত হয়েছে। আহা বাছা যে ছেলে মানুষ, হাঁটতে পারবে কেন? ওকি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

বিন্দু। "হ্যা মা ঘুমিয়ে পড়েছে, এই আমি কোলে করে নিয়ে যাই।"

মাতা। "না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে, আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল ধরে পথ দেখে দেখে আয়, বড় অন্ধকার হয়েছে, একটু একটু মেঘও হয়েছে, রাত্রিতে বোধ হয় জল হবে।"

বিন্দু। "না মা আমিই কোলে নি,—সে দিন ঘোষেদের

বাড়ী থেকে রাত্রিতে সুধাকে কোলে করে এনেছিলাম, আর আজ এই ঘাট থেকে ঘরে নেযেতে পারবো না? ঐ ত রান্না ঘরের আলো দেখা যায়।"

মাতা। "তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস মা সাবধানে আনিস, বড় অন্ধকার যেন প'ড়ে যাস্‌নি। ঐ সেদিন তোর জেঠাইমার মেয়ে উমাতারা রাত্রি বেলা মেলা থেকে আস্‌ছিল, পথে পড়ে গিয়েছিল, আহা বাছার কপালটা এত খানি কেটে গিয়েছে।"

বিন্দু। "মা উমাতারারা কোন্‌ মেলায় গিয়েছিল? কেমন সুন্দর সুন্দর পুতুল এনেছিল, একটা কাঠের ঘোড়া এনেছিল, আর একটা মাটীর সিংহ এনেছিল, আর একটা কেমন কল এনেছিল সেটা ঘোরে। সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা?"

মাতা। "তা জানিস্‌নি? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়েছিল, সেখানে বছর বছর ভারি মেলা হয় কত হাজার হাজার লোক যায়, কত বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গান বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।"

বিন্দু। "মা তুমি কখন সেখানে গিয়াছিলে?"

মাতা। "গিয়েছিলাম বাছা যখন আমি ছোট ছিলুম এক বার আমার বাপ মা গিয়াছিলেন, আমরা বাড়ী সুদ্ধ গিয়া ছিলাম, সেখানে তিন চারি দিন ছিলাম, একটা গাছ তলায় বাসা করে ছিলাম।

বিন্দু। "কেন ঘর ছিল না? গাছ তলায় বাসা করেছিলে কেন মা?"

মাতা। "সেখানে কত হাজার হাজার লোকে যায় ঘর কোথায়? সকলেই গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি

আঁব বাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত রাজ্যের দোকানি পসারি আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রি হয়।"

বিন্দু। "মা আমি একবার যাব, আমার বড় দেখিতে ইচ্ছা হয়।"

মাতা। "আমার কি তেমন কপাল আছে মা যে তোকে নিয়ে যাব ? কত টাকা খরচ হয়।"

বিন্দু। "না মা আমি আর বৎসর যাব। উমাতারারা দেখেছে, আমি কেন যাব না ?"

মাতা। "ছি মা তুমি সেয়না মেয়ে অমন করে কি বায়না করে ? তোর জেঠাইমারা বড় মানুষ, তাঁহার মেয়ে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যায়। তোরা মা গরিবের ঘরের মেয়ে তোদের কি বাছা বায়না করিলে সাজে ? আহা ভগবান্ যদি তোদের কপালে সুখ লিখিত তাহা হইলে কি আর অন্ন বস্ত্রের জন্য তোদের এমন লালায়িত হইতে হয় ? তাহা হইলে কি আমার সোনার পুথুলেরা যেন পথের কাঙ্গালীর মত দ্বারে দ্বারে ফেরে ? হা ভগবান্! তোমারই ইচ্ছা!"

চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে, পশ্চিম দিকে কালো মেঘ উঠিয়াছে, আকাশ হইতে এক একবার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে, অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্য দিয়া শব্দ করিয়া নিশার বায়ু বহিয়া যাইতেছে। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে কেবল এক এক বার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; অথবা দূর হইতে শৃগালের রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার, কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটী হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম হইতে দুই একটী

প্রদীপ বা চুলার আগুন দেখা যাইতেছে, আর এক এক বার অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে যাইতেছিল, যদি সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত, তবে সে দেখিত মাতার চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে দুই একটী অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই ভগিনী।

তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্র চাষ দিয়াছে, গরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই এক জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্র মধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগ্নী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাইতেছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুখুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম কাঁঠাল তাল নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলী বৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মোনসা প্রভৃতি কাঁটা

গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য পথ পুরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বথ বা বট গাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০।৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষীগণ কুলায় নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই অম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সেই তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটী ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫। ৬ টী নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটী রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়াল ঘরে একটী মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, উনুনে আগুণ নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই এক খানি কাপড় শুখাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটী তকতাপোষ ও দুই একটা চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটী ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটী কুল গাছ,

কয়েকটি কলা গাছ, ও একটী আঁব গাছ, আর অনেক কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটী ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর গৃহিণী নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার একটি তিন বৎসরের কন্যা ভূমিতে মাতুরের উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটী ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী ধীরে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক এক বার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক এক বার গুন্ গুন্ শব্দে ঘুম পাড়াইবার ছড়া গাইতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর ক্ষীণ, মুখখানি প্রশান্ত কিন্তু একটু শুখাইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল। অষ্টাদশ বৎসরের রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপন্যাসে পাঠ করি তাহার কিছু ইহার নাই, সে প্রফুল্লতা, সে উদ্বেগ সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নাই। উপন্যাস বর্ণিত সুখ সকলের কপালে ঘটে না, উপন্যাস বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, দুই একজন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, আমাদিগের দরিদ্র ভগ্নী বা কন্যা বা আত্মীয়গণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়, সংসারযাত্রা করেন চাহিয়া দেখ, দেখিয়া বল ছার উপন্যাসের কাল্পনিক অলীক সুখ কয়জনের কপালে ঘটিয়াছে, রূপার ঝিনুক ও গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া

কয়জন এসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষণেক বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সযত্নে মেজেতে মাদুরের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া ক্ষণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে। স্থির প্রশান্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুইটী সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে মাতার স্নেহ মাতার যত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার অসীম সহিষ্ণুতা লক্ষিত হইতেছে। শরীরখানি ক্ষীণ কিন্তু সুগঠিত। ক্ষীণ সুগঠিত বাহু দ্বারা নারী ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাঁহার কত চিন্তা উদয় হইতেছিল। সংসারের চিন্তা, এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জগতের চিন্তা, আর কখন কখন পূর্ব্বকালের চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে ধীরে সেই রমণীর হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

ছেলে বেশ ঘুমাইয়াছে। তখন মাতা পাখাখানি রাখিয়া আপন বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া ছেলের পাশে মাটীতে শুইলেন, নয়ন দুইটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে ঘরটিও নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় সন্তান দুটীর পার্শ্বে স্নেহময়ী মাতা নিদ্রিত হইলেন। সংসারের অশেষ ভাবনা ক্ষণেক তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল, সেই শান্ত সহিষ্ণু চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে চিন্তার দুই একটী রেখা অপনীত হইল।

রমণী দুই তিন দণ্ড এইরূপ নিদ্রিত রহিলেন। পরে একটু শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন

তখন তাঁহার পার্শ্বে একটী প্রফুল্ল-নয়না, হাস্য-বদনা, সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা বালিকা বসিয়া একটী বিড়াল শিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে, তাহারই শব্দ। বিড়াল শিশু লাফাইয়া লাফাইয়া বালিকার হস্তের খেলিবার দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, বালিকা হস্ত টানিয়া লইতেছে। সে সুন্দর গৌরবর্ণ চিন্তাশূন্য ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ চুল পড়িতেছে, সরিয়া যাইতেছে, আবার পড়িতেছে; সে প্রফুল্ল অতি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুটী যেন উল্লাসে হাসিতেছে, সে বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ দুইটী হইতে যেন সুধা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, সে সুগঠিত সুন্দর ললিত বাহুলতা বায়ু-সঞ্চালিত লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখখানি ও হাস্য বিস্ফারিত নয়নদ্বয়, তাহার চিন্তাশূন্য মন ও উদ্বেগশূন্য হৃদয় বালিকারই বটে, নারীর নহে।

রমণী অনেকক্ষণ সেই প্রেমের পুত্তলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই বালিকা ও বিড়াল শিশুর খেলা ক্ষণেক দেখিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"সুধা, তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

সুধা। "দিদি আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি ঘুমাইতেছিলে তাই জাগাই নাই। আর দেখ দিদি, এই বেরাল ছানাটা আমি যেখানে যাব সেইখানে যাবে, আমি রান্নাঘরে বন্ধ করিয়া বাসন মাজিতে গেলুম ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।"

বিন্দু। "বাসন মাজা হয়েছে? বাসনগুল সব ঘরে বন্ধ করিয়া রেখে এসেছ ত?"

সুধা। "হাঁ সব মেজে রেখে এসেছি। আর তারপর

বেরালকে গোয়াল ঘরে বন্ধ করে এলাম আবার সেখান থেকে বেড়া গ'লে এখানে এসেছে। ও আমার এই পুথুলটা নিতে চায়, তা আমি দিচ্চি এই যে।"

বিন্দু। "তা ব'ন এতক্ষণ এসেছ একবার শোও না, গেল রাত্রিতে তোমার ভাল ঘুম হয় নি, একটু ঘুমও না।"

সুধা। "না দিদি আমার দিনে ঘুম হয় না, আমি রাত্রিতে বেশ ঘুমিয়েছিলুম। কেবল একবার খোকা যখন কেঁদেছিল তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে ছিল। আজ খোকা কেমন আছে দিদি?"

বিন্দু। "এখন ত আছে ভাল, রাত্রি হইলেই গা তপ্ত হয়। তা আজ তিনি কাটোয়া থেকে একটা ঔষুধ আনবেন বলেছেন, তাতে একটু ঘুমও হবে, জ্বরও আস্‌বে না।"

সুধা। "হেমচন্দ্র কখন্ আস্‌বেন দিদি?"

বিন্দু। "বলেছেন ত সন্ধ্যার সময় আস্‌বেন, কেন?"

সুধা। "তিনি এলে একটা মজা করব, তা দিদি তোমাকে বল্‌ব না, তিনি এলে দেখতে পাবে। যেমন আমার গায়ে সে দিন ফাগ দিয়েছিলেন।"

বিন্দু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিবে বল না।"

সুধা। "না দিদি তুমি বলে দেবে।"

বিন্দু। "না বলিব না।"

সুধা। "সত্য বলিবে না?"

বিন্দু। "সত্য বলিব না।"

তখন সুধা আপন আঁচলে বাঁধা একটা জিনিস বাহির করিল। জিনিসটা প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ!

বিন্দু। "ও কি লো? ওটা কি?"

সুধা। "দেখতে পাচ্চো না।"

বিন্দু। "দেখছি ত, এ কি পাঁট?"

সুধা। "হাঁ পাট, কিন্তু কেমন কুসুম ফুল দিয়ে রং করেছি।

বিন্দু। "কেন উহাতে কি হবে?"

সুধা। "বল দিকি কি হবে?"

বিন্দু। "কি জানি?"

সুধা। "এইটে ঠাওরাইতে পারিলে না। যখন আজ রাত্রিতে হেমচন্দ্র একটু ঘুমবেন, আমি এইটা তাঁহার দাড়িতে বেঁধে দেব, তাহার পর উঠিলে তাঁহাকে জটাধারী সন্ন্যাসী বলে ঠাট্টা করিব। খুব মজা হবে।" এই বলিয়া বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

বিন্দু একটু হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সস্নেহে ভগ্নীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "সুধা, তোর সুধার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয়। আহা বালিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে কি হইয়াছে জেনেও জানে না! নিদারুণ বিধি! কেমন করে এই কচি ছেলের কপালে এ ভীষণ যাতনা লিখিলে,—কেমন করে এ প্রফুল্ল সুধাপাত্রে গরল মিশাইলে?"

বলা অনাবশ্যক যে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা বলিতেছিলাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার ৯ বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। আমাদের গল্প এই সময় হইতে আরম্ভ। এই নয় বৎসরের ঘটনা গুলি কতক কতক উপরেই প্রকাশ হইয়াছে, আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বিন্দুর মাতা আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া কষ্টে ও শোকে দুইটী অনাথা কন্যাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর এ সংসারে তিনি আর কোনও সুখের আশা রাখেন নাই, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল মরিবার পূর্ব্বে দুইটী মেয়েকে বিবাহ দিয়া যান। যে দিন তিনি দুইটী কন্যাকে লইয়া তালপুখুরে গিয়াছিলেন তখন বিন্দুর বয়সও ৯ বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মাতা বিবাহের পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গরিবের ঘরের মেয়েরা শীঘ্র বিবাহ হয় না। কলিকাতায় বরের পিতা যেরূপ রাশি রাশি অর্থ চাহেন, পল্লিগ্রামে এখনও সেরূপ হয় নাই, কিন্তু তথাপি বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করা সকলেরই সাধ, আত্মীয়ের বাড়ীতে কায কর্ম্ম করিয়া যিনি কন্যাকে লালন পালন করিতেছেন, তাহার মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে সকলের সাধ যায় না। আত্মীয়েরাও এবিষয়ে বড় মনোযোগ করিলেন না, কন্যাও গৌরবর্ণা ছিল না, তবে মুখে শ্রী ছিল, চক্ষু দুটী সুন্দর ছিল, শরীর সুগঠিত ছিল, কিন্তু ক্ষীণ। সম্বন্ধ আসিতে লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। মেয়ের জেঠাইমা রকের উপর দুই পা মেলাইয়া বসিয়া বৈকাল বেলা কেশবিন্যাস করিতে করিতে সহাস্যে বিন্দুর মাকে বলিলেন (বিন্দুর মা চুলের দড়ি ধরিয়াছিলেন) "তা ভাবনা কি বন, আমাদের বাড়ির মেয়ের বের জন্য ভাব্‌তে হয় না, আমাদের কুল, মান, বর্দ্ধমানে ভারি চাকরী, এ কে না জানে বল, কত তপিস্যে করলে তবে এমন বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা? এই র'স না, তিনি পূজার

সময় বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সম্বন্ধ করিয়া দিব যে কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধা-সাধি করিতেছে, বে দিলেই এখনি মাথায় করিয়া লইয়া যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সম্বন্ধ করিব যে কুটুমের মত কুটুম হইবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেল্লা আছে, তোমার মেয়ে একটু কাল, আর তোমাদের বন তেমন টাকা কড়ি নাই আমার দেওয়র তেমন সেয়না ছিল না, কিছু রেখে যায় নি, তাই যা বল। তা ভেবনা বোন, আমি যখন এবিষয়ে হাত দিয়াছি তখন আর কোন ভাবনা নাই।” আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই সুন্দর তাবিজ বিভূষিত বাহুর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন,—কিন্তু জেঠাইমার বাহু নাড়াতে বিন্দুর বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্য পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আহ্লাদে আটখানা! বাড়ীর ছেলেদের জন্য কত পোশাক, কাপড়, জুতা, উমাতারার জন্য ঢাকাই কাপড়, মাথার ফুল ইত্যাদি। নাজির মশাই বাড়ী আসিয়াছেন গ্রামে ধুম পড়িয়া গেল, কত লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, কত খোসা-মোদ, কত সুখ্যাতি, কত আরাধনা। কাহারও পূজার সময় দুই পাঁচ টাকা কর্জ্জ চাই, কাহারও বিপদে সৎপরামর্শ চাই, কাহারও ছেলের একটী চাকুরি চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাতক্তঃ চাই না, কেবল বড় লোকের খোসামোদটা অভ্যাস

মাত্র, সেই অভ্যাসেই সুখ হয়। এত ধুমধামের মধ্যে বিন্দুর কথা কেই বা বলে কেই বা শোনে। ১৫ দিনের ছুটী ফুরাইয়া গেল, নাজির মশাই আবার বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সম্বন্ধের কিছুই স্থির হইল না।

পড়ষীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধাদিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্যার একটী সম্বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহারাও আগ্রহচিত্তে বলিতেন, "তা দিব বৈকি, তোমার দেব না ত কার দেব। তবে কি জান বাছা, আজ কাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি ত কিছু দিতে থুতে পারবে না, বিন্দুর বাপ ত কিছু রেখে যায় নাই, তেমন গোছান লোক হতো, ঐ তোমার ভাসুরের মত টাকা করিতে পারিত, তবে আর কি ভাবনা থাকিত? সেই সময় আমি কত বলেছিলাম, তা তখন সে গা করত না, তোমরাও গা করিতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথাটা বাসি হইলেই ভাল লাগে। তা দেব বৈকি বাছা, তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিব এ বড় কথা?" অথবা অন্য একজন বৃদ্ধা বলিলেন "তার ভাবনা কি? বিন্দুর বের আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কি জান, বিন্দু দেখতে শুনতে একটু ভাল হত, তবে এ কাযটা শীঘ্র শীঘ্র হইত। তা মেয়ের মুখের ছিরি আছে, ছিরি আছে, তবে রংটা বড় কালো, আর চোক্ দুটো বড় ডেব্‌ডেবে, আর মাথায় বড় চুল নাই। না তা মেয়ের ছিরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড় গুল যেন জির জির করছে, হাত পা গুল কেমন লম্বা লম্বা, আর এর মধ্যে ঢেঙ্গা হয়ে উঠেছে। তা হোক, তুমি ভেবো না, কাল মেয়ে কি আর বিকোয় না, তবে কি

আট্‌কে থাকে, তা থাকবে না, যথন আমরা আছি তথন কিছু আট্‌কাবে না।" এইরূপে বৃদ্ধাদিগের যথেষ্ট আশ্বাস বাক্য ও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দা সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত ও আপ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই একজন প্রাচীন লোক ছিলেন তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে যাতায়াত করেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা কয়েক দিন তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাহাটি করিলেন, কোন দিন ছেলেদের জন্য দুই চারি পয়সার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কথন বা কিছু মিশ্রী বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনস্তুষ্টি করিলেন। গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাস বাক্য দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্ত্তাকে বলিবেন, এইরূপ অনেক মধুর বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা ঘোমটা দিয়া সেই কর্ত্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটি মনে রাখিবার জন্য মিনতি করিলেন। তাঁহারাও বলিলেন "তা এ কথা আমাদের এত দিন বলনি? এ সব কায কি আমাদের না বলিলে হয়, ঐ ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর কালীতারার বের জন্য কত হাঁটাহাঁটি করেছিল, শেষে বড় বৌ একদিন আমাকে ডেকে বলিলেন, অমনি কাযটা হইয়া গেল। কেমন বে দিয়ে দিয়েছি, রায়েদের বনিয়াদি ঘর, খাবার অভাব নাই, টাকার অভাব নাই, যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলের সঙ্গে ঘোষেদের মেয়ের বের সম্বন্ধ করিয়া দিলাম। ছেলেটী

দোজবরে বটে আর একটু কাহিল ও একটু বয়স নাকি হয়েছে, তা এখনও চল্লিশের বড় বেশী হয় নাই, আর কালীতারা ৮ বৎসরের হইলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রাম শুদ্ধ এ সম্বন্ধের সুখ্যাতি করিতেছে। ছেলেটী বর্দ্ধমানে থাকে, লেখা পড়া না জানুক তার মান কত, যশ কত, সাহেবদের খানা দেয়, মজলিশ লোকে ভরা, গাড়ী ঘোড়া লোক জন বাবুয়ানা দেখিলে লোকে বলে হাঁ জমিদারের ঘরের ছেলে বটে। তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সম্বন্ধ হয়? তুমি মা এত দিন কোথা হাঁটাহাঁটি কর্‌ছিলে, আমাদের একবার জিজ্ঞাসাও কর না, এখন যে যার আপন আপন প্রভু হয়েছে তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাকে মনে পড়েছে তবু ভাল।" সজল নয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন, এবং এমন লোকের নিকট পুর্ব্বে না আসা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুষ্ট হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন "তা ভেব না মা, এখন আমাকে যখন বলিলে তখন আর ভাবনা নাই, দুই চারি দিনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতেছি।" বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অনেক আশা করিয়া খাওয়া ঘুম ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন অতীত হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সম্বন্ধ হইল না, গরিবের মেয়ে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন তালপুকুরের লোক অনেক সদ্‌গুণ বিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌ ঝি কি করিতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন; ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে সে

বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্ম নিঃস্বার্থ যত্ন করেন; কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্ব্ব দোষের জন্ম বিশেষরূপে নীতিগর্ভ তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন, এবং নিঃস্বার্থরূপে তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে যত্ন বা বাক্যব্যয়ে ক্রটী করেন না। তবে কাযের সময় সহায়তা করা,—সে সতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম কেহ হস্ত প্রসারণ করিলেন না, তাঁহার যাচ্ঞায় কেহ একটী কপর্দ্দক দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থে কেহ বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কথনও তাল পুকুর হইতে বাহিরে যাইতেন তবে দেখিতেন এ সদ্‌গুণগুলি জগতের অন্যান্ম স্থানেও লক্ষিত হয়। তবে বিন্দুর মাতা নির্ব্বোধ, এক একবার তাঁহার মনে এরূপ উদয় হইত যে এ প্রচুর আশ্বাস বাক্য ও সৎপরামর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এই সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্নতি না হউক সংসারিক সুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুকুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হেমচন্দ্র নামক একটী পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। পিতা দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক যত্নে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং হেমচন্দ্রও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কয়েক মাসের পরই পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি পড়া শুনা বন্ধ করিয়া তালপুখুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র বসু বিন্দুর মা ও বিন্দুকে বাল্যকাল অবধি জানিতেন। তাঁহার বিষয় বুদ্ধি কিছু অল্প থাকা বশতঃই হউক, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়কর বিদ্যা কয়েক মাসাবধি শিখিয়াই হউক, অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, (আমাদের লিখিতে লজ্জা করে) বিন্দুর শুষ্ক ম্লান মুখখানিও দুই একবার গোপনে দেখিলেন, এবং তৎপরে বিন্দুর মাতাকে ও জেঠাইমাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জেঠাইমা মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড় মানুষের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করে, তাহাতে যদি একটু বড়মানুষী রকম দর্প থাকে, একটু বড় কুটুম করিবার ইচ্ছা থাকে, দরিদ্রের সহিত যদি সহানুভূতি একটু কম থাকে, তাহা মার্জ্জনীয়। দুই একটী দোষ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যেন নিন্দাপরায়ণ না হই,—আমাদিগের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটী দোষ নাই ?

বিন্দুর সরলস্বভাব জেঠাইমা বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই,—কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না,—কিন্তু বিন্দুর একটী সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি

প্রকৃতই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া হেম চন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন, এবং পাড়া পড়ষী মেয়েরা যখন বিবাহ বাটীতে আসিল, তখন সেই তাবিজবিভূষিত বাহু সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আহা আমার উমাতারাও যে বিন্দুও সে, আমি বিন্দুর বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পয়সা রেখে যায় নাই, আমি না করিলে কে করে বল।" ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়ষীগণও "তুমি বলিয়া করিলে, নৈলে কি অন্যে এতটা করে" এইরূপ অনেক যশোগান ও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা সুধারও বিবাহ দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাঙ্গালা শিখাইয়া পরে ১০। ১২ বৎসরের সময় নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন "বাছা সুধার বিয়ে না দিয়া যদি মরি তবে আমার জীবনের সাধ মিটিবে না।" হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে একটী সামান্য অবস্থার শিক্ষিত যুবার সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন। দুই বিবাহিতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণী বাবুর বাটীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরেই তিনি জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন।

আর একটী কথা আমাদিগের বলিবার আছে। পঞ্চম

বৎসরের সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল। সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে জানে না, বিধবা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাটীতে আসিয়া সাত বৎসরের প্রফুল্লা বালিকা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া আনন্দে পুথুল খেলা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের কথা।

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইয়াছে। চন্দ্রের নির্ম্মল শীতল কিরণে সুন্দর তালপুখুর গ্রাম সুপ্ত রহিয়াছে। বড় বড় তালবৃক্ষসার আকাশপটে অন্ধকারময় ও বিস্ময়কর ছবির ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে প্রচুর ও সুন্দর বাঁশ ঝাড়ের সুচিক্কণ পত্রের উপর সুপ্ত চন্দ্র কিরণ রহিয়াছে, পুষ্করিণীর ঈষৎ কম্পমান জলের উপর চন্দ্রালোক সুন্দর খেলা করিতেছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গনে, প্রাচীরে ও তৃণাচ্ছাদিত ঘরের চালের উপর সেই সুন্দর আলোক যেন রূপার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। সমস্ত সুপ্ত গ্রামের উপর চাঁদের আলোক যেন যূঁই ফুলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকেই খাওয়া-দাওয়া করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কেবল কোথাও কোথাও কোন নিদ্রাহীন বৃদ্ধ বাহিরের প্রাঙ্গনে বসিয়া এখনও ধূম পান করিতেছেন, আর কোথাও বা অল্পবয়স্কা গৃহস্থবধূ এখনও

বাটীর পার্শ্বের পুখুরে বাসন মাজিতেছেন, সংসারের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। নৈশবায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আর দূর হইতে কোন প্রফুল্লমনা কৃষকের গান সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শুনা যাইতেছে।

বিন্দু সংসার কার্য্য শেষ করিয়া এখনও স্বামী আসেন নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন মনে সেই শুইবার ঘরের রকে বসিয়া রহিয়াছেন, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ তাঁহার শুভ্রবসন ও শান্তনয়নের উপর পড়িয়াছে। সুধা আজ শুইতে যাইবে না, হেমচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু বালিকা ভগিনীর পার্শ্বে সেই রকে একটু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কুসুম-রঞ্জিত পাট তাহার আঁচলেই রহিল। নিদ্রাতেও সে সুন্দর পরিপক্ক বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ দুটী হাস্যবিস্ফারিত, বোধ হয় বালিকা এই সুন্দর সুশীতল রজনীতে কোনও সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্ষণেক পর বাহিরের কবাটে শব্দ হইল, বিন্দু তাহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ গিয়া খুলিয়া দিলেন, হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হেমচন্দ্রের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্যামবর্ণ কিন্তু সুন্দর, নয়ন দুটী অতিশয় তেজোব্যঞ্জক। অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, শরীরে ধূলি লাগিয়াছে, পা দুটী ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। বিন্দু সযত্নে তাঁহাকে একখানি চৌকি আনিয়া দিলেন এবং পা

ধুইবার জল ও গামছা আনিয়া দিলেন; হেম হাত মুখ ধুইলেন।

বিন্দু। তোমার আসিতে এত রাত্রি হইল? এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই?

হেম। আমি সন্ধ্যার সময়ই আসিতাম, তবে কাটওয়ার একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি বৈকালে আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন, উপরোধ করিয়া কিছু জল খাবার খাওয়াইলেন, সেই জন্য এত দেরি হইল। তা তোমরা খাইয়াছ ত?

বিন্দু। সুধা খাইয়া ঘুমাইয়াছে, আমি খাব এখন। তুমি ত বৈকালে জল খাইয়াছ আর কিছু খাও নাই, তবে ভাত এনে দি।

হেম। আমার বিশেষ ক্ষুধা পায় নাই, তবে ভাত নিয়ে এস, আর রাত্রি করার আবশ্যক নাই।

বিন্দু সেই রকে একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে থালে করিয়া ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য, ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে তাহাই ভাজা ও তরকারি। আর গাছে নেবু হইয়াছিল বিন্দু তাহা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, গাছ হইতে দুইটী ডাব পাড়িয়া তাহা শীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাড়ীতে গাভী ছিল তাহার দুগ্ধ ঘন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আহারে বসিলেন, বিন্দু পার্শ্বে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন।

হেম। খোকার জন্য একটা ঔষধ আনিয়াছি, সেটা এখন খাওয়াইও না, রাত্রিতে যদি ঘুম ভাঙ্গে, যদি কাঁদে, তবে

খাওয়াইও। আর যে চেষ্টায় গিয়াছিলাম তাহার বড় কিছু হইল না।

বিন্দু। কি হইল ?

হেম। কাটওয়াতে আমার পরিচিত একটী উকিল আছেন আমি তাঁহার কাছে তোমার বাপের জমির কথা বলিলাম, এবং সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম।

বিন্দু। তার পর ?

হেম। তিনি বলিলেন মকদ্দমা ভিন্ন উপায় নাই।

বিন্দু। ছি! জেঠা মশাইয়ের সঙ্গে কি মকদ্দমা করে ? তিনি যাহা হউক ছেলে বেলা আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, আমার বে দিয়েছেন, জেঠাই মা এখনও আমাদের জিনিষ টিনিষ পাঠিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে কি মকদ্দমা করা ভাল ?

হেম। আমাদের বিবাহের জন্য আমরা তোমার জেঠা মহাশয়ের নিকট বড় ঋণী নই ; কিন্তু তুমি তখন ছেলে মানুষ ছিলে সে সব কথা বড় জাননা, জানিবার আবশ্যকও নাই। তথাপি তিনি তোমার জেঠা, এই জন্যই তাঁহার সহিত বিবাদ করা ইচ্ছা নাই, কেবল অগত্যা করিতে হয়।

বিন্দু। ছি! সে কাযটা কি ভাল হয় ? আর দেখ আমরা গরিব লোক আমাদের কি মকদ্দমা পোষায় ? আমরা গরিবের মত যদি থাকিতে পারি, দুবেলা দুপেট যদি খেতে পাই, ভগবানের ইচ্ছায় যদি ছেলে দুটাকে মানুষ করিতে পারি, তাহা হইলেই ঢের হইল। তোমার যে জমি জমা আছে তাহাতেই আমাদের গরিবের সোণা ফলে, তোমার পৈতৃক বাড়ীই আমার সাত রাজার ধন।

হেম। আমি যখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, এরূপ কষ্টে চিরকাল জীবন যাপন করিব তাহা মনে করি নাই। তুমি সহিষ্ণু, সাধ্বী, পতিব্রতা, এত কষ্ট সহ্য করিয়াও মুখ ফুটে একটী কথা কও না সে তোমারই গুণ, কিন্তু আমি তাহা চক্ষে দেখিতে পারি না।

বিন্দুর চক্ষে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, "পথের কাঙ্গালীকে কোলে করিয়া লইয়া স্বর্গে স্থান দিয়াছ সেটা কি ভুলে গেলে ?" প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন এমন ঘর বাড়ী, এখানে রাজার উপাদেয় দ্রব্য পাওয়া যায়, ইহাতে আমাদের অভাব কিসের ? একটী রাজার উপাদেয় জিনিস দেখিবে ?"

হেম একটু হাসিয়া বলিলেন "কৈ দেখি।"

বিন্দু উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। সেই দিন গাছের কচি কচি আঁব পাড়িয়া তাহার অম্বল করিয়াছিলেন, স্বামীর সম্মুখে পাথর বাটীটী রাখিয়া বলিলেন "একবার খেয়ে দেখ দেখি।"

হেম হাসিয়া অম্বল ভাতে মাখিলেন। খাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ এ রাজার উপাদেয় দ্রব্য বটে, কিন্তু সে আমাদের এ রাজ্যের গুণ নহে, রাজ রাণীর হাতের গুণ।"

ক্ষণেক পর হেম আবার বলিলেন "আমি সত্য বলিতেছি জেঠা মহাশয়ের সহিত মকদ্দমা করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তিনি তোমার পৈতৃক ধন কাড়িয়া লইবেন, আমাদিগকে দরিদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিবেন তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দরিদ্র কিন্তু আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি না।"

বিন্দু। তবে এক কাজ কর দেখি। ঐ ভাত কটি এই ঘন দুদ দিয়া খেয়ে নাও দেখি, তা হইলে গায়ে জোর হবে, তাহার পর কোমর বেধে লড়াই করিও।

হেমচন্দ্র যুদ্ধের সেই উদ্যোগ করিলেন, আবার গাভী-দুগ্ধের অথবা রাজ্ঞীর রন্ধন নৈপুণ্যের প্রশংসা করিলেন। তখন বিন্দু বলিলেন,

আচ্ছা জেঠা মশাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়টা মিটাইয়া ফেলিলে ভাল হয় না? গ্রামেও পাঁচজন ভদ্র লোক আছেন।

হেম। "সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। তোমার জেঠা মহাশয় বলেন যে জমিতে তাঁহারই সত্ব আছে, তিনি এখন দশ বৎসর অবধি জমিদারকে খাজনা দিতেছেন, তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া জমির উন্নতি করিয়াছেন, এবং জমিদারের সেরেস্তায় আপনার নাম লিখাইয়াছেন, এখন তিনি এ জমি হাতছাড়া করিবেন না। তবে তোমাকে ও সুধাকে কিছু নগদ অর্থ দিতে সম্মত আছেন, তাহা জমির প্রকৃত মূল্য নহে, অর্দ্ধেক মূল্য অপেক্ষাও অল্প। কেবল আমরা দরিদ্র এই জন্য তিনি এরূপ অন্যায় করিতেছেন।"

বিন্দু। আমি মেয়ে মানুষ, তুমি যতদূর এ সব বিষয় বুঝ আমি ততদূর পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি যাহা দিতে চাহেন, তাতেই স্বীকার হওয়া ভাল। তিনি আমাদের গুরু, এক সময়ে আমাকে পালন করিয়াছিলেন, যদি কিছু অল্প মূল্যেই তাঁহাকে একটা জিনিস দিলাম তাতেই বা ক্ষতি কি? আর দেখ, মকদ্দমা করিলে আমাদের বিস্তর খরচ, কর্জ্জ করিতে হইবে, তাহা কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? যদি মকদ্দমায়

জমি পাই তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিতে সে জমি বিক্রয় হইয়া যাইবে, আর জেঠা মশাই চিরকাল আমাদের শত্রু থাকিবেন। আর যদি মকদ্দমায় হারি, তবে এ কুল ও কুল দুকুল গেল। তিনি যদি কিছু অল্প মূল্যই দেন, না হয় আমরা কিছু অল্পই পাইলাম, গোলমালটা এই খানেই শেষ হয়। আমি মেয়ে মানুষ, ও সব গোলমাল বুঝি না, মকদ্দমা বড় ভয় করি, সেই জন্যই এরূপ বলিলাম; কিন্তু তুমি রাগ না করিয়া বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, শেষে যেটা ভাল বোধ হয় সেইটে কর।

হেমচন্দ্র আহার সমাপন করিলেন, এক ঘটি জল খাইলেন, অনেকক্ষণ বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

তোমার ন্যায় মেয়ে মানুষ যাহার বন্ধু সে এ জগতে ভাগ্যবান্। আমি তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া যে উকিলের নিকট গিয়াছিলাম সে আমার মূর্খতা। তোমার পরামর্শটি উৎকৃষ্ট। আমি এই পরামর্শই গ্রহণ করিলাম, জেঠা মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন, কল্যই আমি এ বিষয় নিষ্পত্তি করিব। আর পুনরায় যখন কোন পরামর্শের আবশ্যক হইবে, এই ঘরের বৃহস্পতির সহিত আগে পরামর্শ করিব।

বিন্দু সহাস্যে বলিলেন, "তবে বৃহস্পতির আর একটী পরামর্শ গ্রহণ কর।"

হেম। কি বল, আমি কিছুই অস্বীকার করিব না।

বিন্দু। ঐ বাটীতে যে দুধটুকু পড়িয়া আছে সেটুকু চুমুক দিয়ে খাও দেখি।

হেমচন্দ্র অগত্যা বৃহস্পতির এই দ্বিতীয় পরামর্শটীও গ্রহণ করিলেন, পরে আসন ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেন।

বিন্দু তখন হেমচন্দ্রের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, হাতে একটী পান দিলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র সেই স্নেহময়ীকে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন "যাও, অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমি খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে।" জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বিন্দুবাসিনী তখন উঠিয়া পাকগৃহে আহারাদি করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাষবাসের কথা।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। উষা তরুণীগৃহিণীর ন্যায় সংসার কার্য্যের জন্য জগতে সকলকে উঠাইলেন, সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। মাতা যেরূপ কন্যাকে সুন্দর রূপে সাজাইয়া দেয়, সেইরূপ সুন্দর সাজ পরিধান করিয়া উষা আকাশে দর্শন দিলেন। হাস্যমুখী তরুণীর প্রণয়াভিলাষে প্রণয়ী সূর্য্য অচিরেই উদিত হইলেন, উষার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন! তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ রূপ সপ্ত অশ্ব রথে সংযোজিত করিয়া সেই জলন্তকেশী সবিতা আকাশমার্গে ধাবমান হইলেন,

আকাশ আলোকে পূর্ণ করিলেন, জগতে সংজ্ঞাশূন্যকে সংজ্ঞা দান করিলেন, রূপশূন্যকে রূপ দান করিলেন। উষা ও সূর্য্যোদয়ের শোভায় বিস্মিত হইয়া চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের প্রাচীন ঋগ্বেদের ঋষিগণ এইরূপ সুন্দর কল্পনা দ্বারা সে শোভাটি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন ;—সেরূপ সরল, সুন্দর এবং প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিত্ব তাহার পর আর রচিত হয় নাই !

হেমচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাটী হইতে বাহির হইলেন গ্রামের বৃক্ষ পত্র ও কুটীর গুলি সূর্য্যের লোহিত আলোকে শোভা পাইতেছিল, গ্রাম্য পুষ্পগুলি বৃক্ষে ঝোপে বা জঙ্গলে ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের পাখী গুলি নানাদিক হইতে রব করিতেছে। গৃহস্থের মেয়েরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর দ্বার ও প্রাঙ্গন ঝাঁট দিয়া পুখুর হইতে কলস করিয়া জল আনিতেছে অথবা রন্ধনাদি আরম্ভ করিতেছে। বালকগণ পাঠশালায় বা খেলায় যাইতেছে, কৃষকগণ লাঙ্গল ও গরু লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। হেমচন্দ্রও আজি নিজের জমিখানি দেখিতে যাইবেন মানস করিয়াছিলেন।

ছায়াপূর্ণ গ্রাম্য পথ দিয়া কতকদূর আসিয়া হেমচন্দ্র একজন কৃষকের বাড়ীর সম্মুখে পঁহুছিলেন ; কৃষকের নাম সনাতন কৈবর্ত্ত।

সনাতন কৈবর্ত্তের একখানি উচ্চ ভিটিওয়ালা ঘর ছিল, তাহারি পার্শ্বে একখানি ঢেঁকির ঘর ও একখানি গোয়াল ঘর, তথায় ৪।৫টি গরু ছিল। উঠানেই উনুন, পার্শ্বে একখানি

চালা আছে, বৃষ্টি বাদলের দিন সেই চালার ভিতর রান্না হয়, নচেৎ খোলা উঠানে। সম্মুখে কতকগুলা কাঁটা গাছ ও জঙ্গল, এক স্থানে একটা বড় খানা আছে তাহাতে বৎসরের গোবর সঞ্চিত হয়, চাষের সময় উপকারে লাগে। গোয়াল ঘরের পাশে গাড়ীর দুখানা চাকা ও খান দুই লাঙ্গল পড়িয়া আছে, এবং বাড়ীর পশ্চাতে একটা ডোবার ন্যায় ময়লা পুখুর আছে। আমাদের বলিতে লজ্জা করে যে এক্ষণকার নূতন মিউনিসিপাল আইন ও নিয় শিক্ষা সত্ত্বেও সনাতনের প্রণয়িনী এই ডোবাতেই যে কেবল বাসন ধুইতেন এমন নহে, তাঁহার স্নান ও কাপড়কাচাও এইখানে হইত, এবং তাঁহার হৃদয়েশ্বরের পানের জল ও সংসারের রান্নার জলও এই পুখুরের।

হেমচন্দ্র আসিয়া সনাতনকে ডাকিলেন। সনাতনের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তবে গাত্রোত্থান রূপ মহৎ কার্য্যের উদ্যোগ পর্ব্বে রত ছিল, দুই একবার এ পাশ ও পাশ করিতেছিল, দুই একবার হস্ত বিস্তার করিয়া হাই তুলিতেছিল, আর কখন কখন পার্শ্বে শয়ানা সহধর্ম্মিণীর সহিত, "পোড়ারমুখী এখন উঠ্‌লিনি, এখনও মাগীর ঘুম ভাঙ্গল না বুঝি" ইত্যাদি মিষ্টালাপ করিতেছিল, এবং আলস্য বড় দোষ এই নীতি বাক্যটী প্রকটিত করিতেছিল। এই নৈতিক বক্তৃতার মধ্যে সনাতন হেমচন্দ্রের ডাক শুনিল।

গলাটা মহাজনের গলার ন্যায়, অতএব বুদ্ধিমান সনাতন সহসা উঠিল না। আবার ডাক,—তৃতীয়বার ডাক, সুতরাং সনাতন কি করে, একটা উপায় করিতে হইল। বিপদ আপদে

সনাতনের একমাত্র উপায় তাহার গরীয়সী সহধর্ম্মিণী, অতএব তাহাকেই একটু অনুনয় করিয়া বলিল "এই দরজাটা খুলে উঁকি মেরে দেখ্ত কে এসেছে। যদি হারাণ সিকদার মহাজন হয় তবে বলিস বাড়ী নেই।" সনাতনের প্রণয়িনী প্রিয় স্বামীর "পোড়ারমুখী" প্রভৃতি মিষ্টালাপ শুনিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন সময় পাইলেন। স্বামীর কথাটী শুনিয়া আস্তেঽ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। একটী হাই তুলিয়া সনাতনের দিকে পেছন করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে আর একবার নিদ্রা গেলেন।

সনাতন দেখিল বড় বিপদ, অথচ আপনি সহসা বাহির হইতে পারে না, কি করে? দুই একবার প্রণয়িনীকে ডাকিল, কোন উত্তর নাই, একবার টানিল, সাড়া নাই, একবার ঠেলা দিল, তথাপি চৈতন্য হইল না! সকল যত্ন ব্যর্থ গেল, সকল বাণ কাটা গেল, তখন বীর পুরুষ একেবারে রোষে দণ্ডায়মান হইয়া রিক্ত হস্তে যুঝিবার উদ্যম করিল। বলিল "এত বেলা হলো এখনও মাগীর উঠা হইল না, এত ডাকাডাকি করিলাম তবুও হারামজাদীর সাড়া নাই, এবার সাড়া করাচ্চি, দুটো গুঁতো দিলেই ঠিক হবে।"

সনাতনপত্নী দেখিলেন আর মৌন অস্ত্র খাটে না, এখন অন্য অস্ত্র না ধারণ করিলে বড় বিপদ। অতএব তিনিও একবারে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন "কি হয়েছে কি? সকাল থেকে উঠে বাপ মা তুলে গাল দিচ্ছ কেন, মাতাল হয়েছ্ নাকি?—দেখ না, মিনষের মরণ আর কি!" বিধুমুখী এইরূপে স্বামীর দীর্ঘায়ু বাঞ্ছা করিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সে তীব্র স্বর শ্রবণে ও আরক্ত নয়ন দর্শনে সনাতনের বীর হৃদয় বসিয়া গেল, তথাপি সহসা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিল না।

সনাতন। বলি আবার শুলি যে!

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে হবে না?

স্ত্রী। হবে না?

সনাতন। জল আনবিনি?

স্ত্রী। আনবো না?

সনাতন। রান্না চড়াবি নি?

স্ত্রী। চড়াব না?

সনাতন। তবে আবার শুলি যে?

স্ত্রী। শোব না?

সনাতন। তবে ঘরকন্না করবে কে?

স্ত্রী। তা আমি কি জানি? আমি পোড়ারমুখী, আমি হারামজাদী, আমার বাপ হারামজাদা, আমার ঠাকুরদাদা হারামজাদা, আমার আর ঘর কন্না করে কি হবে? আর একটী ভাল দেখে ডেকে আনগে।

সনাতন। না, বলি রাগ কল্লি নাকি?

স্ত্রী। রাগ আবার কিসের?" বলিয়া গৃহিণী আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন, আর একটি হাই তুলিয়া দীর্ঘ নিদ্রার সূচনা করিতে লাগিলেন।

সনাতন তখন পরাস্ত হইল; তখন বিধুমুখীর হাতে পায়ে ধরিয়া খাট মানিয়া অনেক মিনতি করিয়া উঠাইল। সেই

অব্যর্থ সাধনে বিধুমুখীর কোপের কিঞ্চিৎ উপশম হইল এবং তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। মনে মনে হাসিতে হাসিতে মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলেন,

"এখন কি করিতে হবে বল। এমন লোকেরও ঘর করিতে মানুষে আসে। গালাগালি না দিলে রাত্রি প্রভাত হয় না।"

সনাতন। না গালি দিলাম কৈ, একটীবার আদর করে পোড়ামুখী বলেছি বইত নয়, তা আর বলব না।

স্ত্রী। না কিছু বল নাই, আমার আদর সোহাগে কাজ নাই, কি করিতে হবে বল।

সনাতন। বলি ঐ দরজায় কে ডাকাডাকি করছে এক-বার গিয়ে দেখ্ না; যদি হারাণ সিকদার হয় তবে বলিস আমি বাড়ী নেই।

তখন বিধুমুখী গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার বিশাল শরীর খানি তুলিলেন। মুখখানি একখানি মধ্যমাকৃতি কাল পাথরের থালার ন্যায়, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জ্বল বর্ণ। শরীরখানি বেশ নাদশ নোদশ, স্থূলাকার, গোলাকার পৃথিবীর ন্যায়! পা দুখানি মাটিতে পড়িলে পৃথিবী তাহার সুন্দর চিহ্ন অনেক ক্ষণ ধারণ করিতে ভাল বাসিতেন! বাহু দুই খানি দেখিয়া সনাতনের মনে মনে ভয় সঞ্চার হত, কোন্ দিন এই রমণী-রত্নের প্রিয় আলিঙ্গনে বা আমার শ্বাস রোধ হইয়া অপঘাৎ মৃত্যু হয়! দীর্ঘে বর বড় না কনে বড় দর্শকের কিছু সন্দেহ হইত, পার্শ্বে কনে তিনটী সনাতন!

গরীয়সী বামা দরজা একটু খুলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন "কে গা।"

হেম। আমি এসেছি গো। সনাতন বাড়ী আছে?

মনিবকে দেখিয়া সনাতনের স্ত্রী তখন ব্যগ্র ও লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া একটী কাঠের চৌকি লইয়া বাবুকে বসিতে দিলেন ও সনাতনকেও ডাকিয়া দিলেন।

সনাতন তখন নির্ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল, দণ্ডবৎ হইয়া বলিল,

"আজ্ঞে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, তা আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়েছে।"

হেম। তা হোউক, এখন চল মাঠে যেতে হবে, ক্ষেতখানা দেখিতে হবে। কৈ তোমার লোক কৈ।

সনাতন। আজ্ঞে জন ঠিক করেছি, এই যাই। আপনি অনেকটা পথ চলিয়া এসেছেন একটু দুদ খাবেন কি।

হেম। না আবশ্যক নাই।

সনাতন। না একটু খান, আমাদের বাড়ীর গরুর দুদ একটু খান। এই বলিয়া সনাতন দুধ দুইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর বাটী আনিল।

দোয়া হইলে সনাতনের স্ত্রী একটু ঘোমটা দিয়া একটী ছেলে কোলে করিয়া এক বাটী দুধ বাবুর কাছে আনিয়া রাখিল। হেম আনন্দচিত্তে সেই কৃষকের ভক্তিদত্ত দুগ্ধ পান করিলেন।

সনাতনও লোককে ডাকাডাকি করিয়া হাজির করিয়া

দুই খানি হাল ও চারিটী বলদ লইয়া প্রস্তুত হইল। সকলে ক্ষেতের দিকে চলিল। পথে অন্যান্য কথা হইতে ২ সনাতন বলিল "তা বাবু এত কষ্ট করিয়া যাবেন কেন, আমি আপনার জমি দুটা চাষ দিয়াছি, আর একটা চাষ হইলেই হয়, আজ সব হইয়া যাবে, তার পর কাল ধান বুনে দিব। আপনি আর কষ্ট করেন কেন ?"

হেম। না আমি অনেক দিন অবধি আমার জমিটা দেখি নাই তোরা কি কচ্ছিস না কচ্ছিস একবার দেখা ভাল, তাই আজ সকালে মনে করিলাম একবার দেখে আসি।

সনাতন। তা দেখুন না, আপনার জিনিস দেখ্‌বেন না ? জমিটী ভাল, ধান বেশ হয়, তবে আপনারা ভদ্রলোক, জন খাটিয়ে চাষ করাতে হয় তাই বোধ হয় আপনাদের তত লাভ হয় না।

হেম। সামান্যই লাভ হয়। তোমাদের জন মজুরদের দিয়ে বেশী থাকে না। গেল বার বুঝি ২০০।২৫০ মন ধান হইয়াছিল কিন্তু তোদের দিয়ে, বিচ খরচ দিয়ে, জমিদারের খাজনা দিয়ে ১০০ টাকার বড় বেশী ঘরে উঠে না।

[illegible]ন। তা বাবু সেই যে একবার বলেছিলেন, জমিটা ভাগে দিবেন, তা কি এখন ইচ্ছা আছে ? যদি দেন তবে আমাকেই দিবেন, আমি আপনার বাড়ীর চাকর, আপনার বাপের আমল থেকে ঐ জমি করিতেছি। আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না, কিছু দেখ্‌তে হবে না, আমি নিজের খরচে

চাষবাস করিব, আমার হাল গরু সবই আছে, বছরের শেষে অর্দ্ধেক ধান মাপিয়া গাড়ী করিয়া আপনার বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিব।

হেম। কেন বল দেখি, তোর ভাগ নেবার এত ইচ্ছে কেন ?

সনাতন। আজ্ঞে আপনি ত জানেন, আমার একখানি নিজের ছোট জমি আপনার জমির পাশে আছে, কিন্তু ৮।১০ কুড়ো, তাহাতে পেট ভরে না, আপনাদের কাছে মজুরি করিয়া যা পাই তাহাতে আমার চলে। তবে যদি আপনার জমিটা ভাগে পাই তবু লোকের কাছে বলিতে পারিব এতটা জমি ভাগে করি। আর আপনাদের যত খরচ হয়, আমরা ছোট লোক আমাদের চাষে তত খরচ হবে না, দুই পয়সা পাব, ছেলে গুলি খেয়ে বাঁচবে।

হেম। তা আচ্ছা দেখা যাক কি হয়। তুই এখন ত আমার জমিটা বুনে দে, তার পর যাহা হয় করিব এখন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা করিতে করিতে হেমচন্দ্র ও সনাতন ও সনাতনের লোক জন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে গিয়া পড়িলেন।

বৈশাখ মাসের দুই একটী বৃষ্টির পর সকল জমিই চাষ হইতেছে। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে কৃষকগণ আনন্দে গান করিতে করিতে অথবা গরুকে নানা রূপ নিকট সম্বন্ধ বাচক কথায় উত্তেজিত করিতে করিতে চাষ দিতেছে। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র, বঙ্গ দেশের উর্ব্বরা ভূমির অন্ত নাই, তাহাই বাঙ্গালি-দিগের প্রাণ সর্ব্বস্ব। জমির পার্শ্বস্থ আইলের উপর দিয়া

অনেক জমি পার হইয়া অনেক কৃষকের কৃষি কার্য্য দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র নিজ জমির দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্যও তাঁহার জমি দেখা হইল না, পথে তিনি সহসা তাঁহার শ্বশুর মহাশয় তারিণী বাবুকে দেখিতে পাইলেন। তারিণী বাবু পূর্ব্বদিন কার্য্য বশতঃ অন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, অদ্য প্রত্যূষে বাটী ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ কি বাবা, এখানে মজুরের সঙ্গে কোথা যাইতেছ এস ঘরে এস। তবে ভাল আছ ? আমি প্রত্যহই মনে করি তোমাকে একবার ডেকে খাওয়াই, তবে কি জান বর্দ্ধমান থেকে ছুটী নিয়ে এসে অবধি নানা বিষয় কার্য্যে বিব্রত, আর শরীরও ভাল নাই, আর ছেলে গুলকে টিক টিক করে বলি তোমাকে একবার নিমন্ত্রণ করে আসবে, তা যদি তারা ঘরথেকে একবার বেরয়। তা তুমি একদিন এস খাওয়া দাওয়া করিও।"

হেমচন্দ্র শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে ফিরিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে তা যাব বৈ কি, আমিও মনে করেছিলাম আজ কালের মধ্যে একদিন দেখা করি, কিছু আবশ্যক আছে। মহাশয়ের যদি অবকাশ থাকে তবে আজই সন্ধ্যার সময় আসিব।

তারিণী। তা তুমি ঘরের ছেলে আবার অবকাশ অনবকাশ কি, যখন আসিবে তখনই দেখা হবে। বাছা উমাতারা শ্বশুর বাড়ী হইতে এসেছে সেও কতবার বলেছে, বাবা একবার হেম বাবুকে নিমন্ত্রণ কর না, আর গিন্নীও তোমার কথা কত বলেন। তা আসবে বৈ কি, এস, আজ সন্ধ্যার সময় এস, কিছু জলযোগ করিও।

এইরূপ কথা বার্ত্তা করিতে করিতে উভয়ে একত্রে গ্রামে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বড় মানুষের কথা।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র তারিণী বাবুর বাড়ীতে যাইলেন। বাড়ীর বাহিরে গোয়াল ঘর আছে, দু তিনটী ধানের গোলা আছে, একটী পূজার চণ্ডীমণ্ডপ আছে ও তাহার সম্মুখে যাত্রার একখানি বড় আটচালা আছে। নাজির বাবুর বাড়ীতে বড় ধূমধামে দুর্গাপূজা হয়, নাচ গাওনা বাজনা হয়, প্রসিদ্ধ যাত্রার দল বৎসর বৎসর আইসে, এবং গ্রামের লোকে সে বাটী সমাকীর্ণ হয়। প্রতিবারই নাজির মশাই পূজার সময় বাড়ী আসেন, এবার কোনও আবশ্যকের জন্য বৈশাখ মাসে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়াছেন।

আজ দুই বৎসর হইল, তারিণী বাবু আপনার বসিবার জন্য বাহিরে একটী পাকা ঘর করিয়াছেন, এবং বাড়ীর পার্শ্বে কতকগুলি ইটের পাঁজা পোড়ান হইয়াছে, গৃহিণীর বড় ইচ্ছা যে শুইবার ঘরটীও পাকা হয়। সেই পাকা বৈঠকখানা ঘরে একটী তেলের বাতি জ্বলিতেছে, একটী বড় তক্তপোশের উপর সতরঞ্চ ও চাদর বিছান আছে, তাহার উপর তারিণী বাবু বসিয়া ধূম সেবন করিতেছেন, পাড়ার ৪।৫ জন

লোক সম্মুখে বসিয়া নানারূপ আলাপ ও গল্প রহস্য করিতেছে।

হেমচন্দ্র আসিবামাত্র তারিণী বাবু তাহাকে বসিতে দিলেন এবং দুই চারিটী মিষ্টালাপ করিয়া একটী ছেলেকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রসস্ত প্রাঙ্গন, সম্মুখে শুইবার ঘর, উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর বড় আটচালা, তাহার এ পাশে ও পাশে উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর সুন্দর তিন চারি খানি চৌচালা বা পাঁচচালা ঘর। ঘরের ভিটিগুলি সুন্দররূপে লেপা, উঠান ঝাট দেওয়া ও পরিষ্কার, এবং তাহার এক পার্শ্বে রান্নাঘর। বাটীর পশ্চাতে একটী বড় রকম পুখুর, তাহার চারিদিকে বাগান, নারিকেল আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানারূপ গাছ আছে।

হেমচন্দ্র বাড়ীর ভিতর আসিয়াই শাশুড়ীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পার হইয়াছে, শরীরখানি গৌরবর্ণ স্থূল এবং কিছু খর্ব্ব হইলেও জমকাল। স্থূল বাহুর উপর মোটা মোটা তাবিজ ও বাজু বাহুর সৌন্দর্য্য ও সংসারের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। হাতে মোটা মোটা দুই গাছি বালা পায়ে মোটা মোটা মল। তাঁহার সেই বহুমূল্য গহনা ও গৌরবের শরীর খানি দেখিলে, তাঁহার আস্তে আস্তে চলন ও ভারি ভারি পদবিক্ষেপ দেখিলে, তাঁহার অল্প অল্প হাসিমাখা একটু একটু গৌরব ও দর্পমাখা কথা গুলি শুনিলে তাঁহাকে বড় মানুষের গৃহিণী বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি তারিণী

বাবুর গৃহিণী মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সাদা, তাঁহার কথা গুলিতে একটু একটু দর্প থাকিলেও হাস্যপূর্ণ ও মিষ্ট, তিনি আপনার সুখ্যাতি বা ধন গৌরবের কথা শুনিতে ভাল বাসিলেও পরের নিন্দা, পরের অনিষ্ট বা পরকে ক্লেশ দেওয়া ইচ্ছা করিতেন না।

শাশুড়ী। বলি, বাড়ীর পাশে বাড়ী, তবু কি এক দিনও আসতে নেই? বুড়ী আছে কি মরেছে বলে আর খবর নাও না?

হেম। না তা নয়, প্রত্যহই আপনাদের খবর পাই, তবে আমাদের অবস্থা সামান্য, সর্ব্বদাই কাজ কর্ম্মে রত থাকিতে হয়।

শাশুড়ী। হ্যাঁ, এখন তাই বলবে বই কি? এই এত করে বিন্দুকে হাতে করে মানুষ করলাম, এত করে তার বিয়ে থা দিলাম, তা সেও কি একবার জিজ্ঞেস করে না যে জেঠাই মা কেমন আছে।

হেম। সে সর্ব্বদাই আপনার তত্ত্ব লয়, আর এই উমা-তারা আসিয়া অবধি একবার আসবে আসবে মনে করছে, কিন্তু সংসারের সকল কাজ তাহাকেই করিতে হয় আর ছেলেটীরও ব্যারাম, সেই জন্য আসতে পারে না। তা উমাতারা যদি এক-দিন আমাদের বাড়ী যায় তবে তার বোনের সঙ্গেও দেখা হয়, ছেলে দুটীকেও দেখিয়া আসিতে পারে।

শাশুড়ী। না বাপু, উমার যে ঘরে বিয়ে হয়েছে, তাদের এমন মত নয় যে উমা কারও বাড়ীতে যাওয়া আসা ক-
তারা ভারি বড় মানুষ, ধনপুরের বনিয়াদি বড় ম-

ঐ যে আগে ধনেশ্বর বলে নবাবদের দেওয়ান ছিল না, তাদেরই ঝাড়, ভারি বড় লোক, এ অঞ্চলে তেমন ঘর নাই।

হেম। হাঁ তা আমি জানি।

শাশুড়ী। হ্যাঁ, জানবে বৈকি, তাদের ঘর কে না জানে? ক্রিয়া, কর্ম্ম, দান, ধর্ম্ম, সকল রকমে, বুঝলে কি না, তাদের যেমন টাকা তেমনি যশ। এই এবার তাদের একটী মেয়ের বিয়ে হল বর্দ্ধমানে, ঐ ইনি যেখানে কর্ম্ম করেন, সেই খানে, তা বিয়েতে দশ হাজার টাকা খরচ করলে। তাদের কি আর টাকার গুণাগুন্তি আছে। বছর বছর পূজা হয়, তা দেশের যত বামুন আছে, বুঝলে কি না, এ ধনপুরে দক্ষিণা পায় না এমন বামুনই নাই।

হেম। তা আমি জানি।

শাশুড়ী। তা, উমাকে কি শিগ্‌গির পাঠায়; সেই পূজার সময় একবার করে পাঠায়, আর পাঠায় না। এবার এই ইনি ছুটি নিয়ে এসেছেন, তাই কত লোক পাঠিয়ে হাঁটা-হাঁটি করে তবে উমাকে পাঠিয়েছে, তাও বলে দিয়েছে ১৪ দিনের বাড়া যেন এক দিনও না থাকে, তা এই ১৪ দিন হলেই পাঠাব। এই বর্দ্ধমানে আমাদের লোক গিয়েছে, কাপড়, সন্দেশ, আঁব, নিচু, এই সব আন্‌তে দিয়েছি, মেয়ের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে কিছু খরচ কর্‌তেই হয়।

হেম। তা হয়ই ত, তা ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীকে ছেলেদের নিয়ে পাঠিয়ে দিব এখন। সে উমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

শাশুড়ী। হাঁ, তা আস্‌বে বৈ কি, বিন্দু আমার পেটের ছেলের মত, সে আস্‌বে না? সে আসবে, আর তুমিও বাছা মধ্যে মধ্যে এসো, আমাদিগের খোঁজ খবর নিও।

হেম। হাঁ তা আসবো বৈ কি। এখন উমা আর কাছে কয় দিন?

শাশুড়ী। আর আছে কৈ? এই বর্দ্ধমান থেকে আঁব সন্দেশ এলেই উমাকে পাঠিয়ে দিব; মেয়ের সঙ্গে কিছু না দিলে ত ভাল দেখায় না, বড় মানুষ কুটুম করেছি, কিছু না দিলে থুলে কি ভাল দেখায়? আবার দেখ এই আস্‌ছে মাসে ষষ্ঠিবাটা, আবার তত্ত্ব করতে হবে। তাতেও বিস্তর খরচ আছে।

হেম। তা বটেই ত।

শাশুড়ী। কাযেই, যেমন কুটুম করেছি তেমনি তত্ত্ব করতে হয়, লোকের কাছেও আমাদের একটু মান সম্ভ্রম আছে, কুটুমেরাও জানে আমরা বিষয়ী লোক, কাজেই কিছু দিয়ে থুয়ে তত্ত্ব না করিলে ভাল দেখায় না। তবে তোমার ছেলে দুটী ভাল আছে?

হেম। না, খোকার ৫।৭ দিন থেকে একটু রাত্রিতে গা গরম হয়, তা আমি কাল কাটোয়া থেকে ঔষুধ এনে খাওয়াচ্ছি আজ একটু ভাল আছে।

শাশুড়ী। বেশ করেছ। বাছা বিন্দুও ঐ রকম ছিল, কাহিল ছিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হত। আহা সেদিনকার ছেলে, বাছা এমন ধীর শান্ত ছিল যে মুখটী খুলে কখনও কিছু চায় নি,

আমি যতক্ষণ না ডেকে তাকে ভাত থাওয়াতাম ততক্ষণ সে মুখটী তুলে একবার বলত না যে জেঠাই মা, ক্ষিদে পেয়েছে। জেঠাই মা তার প্রাণ; তার বাপ মরে অবধি তার মার আর মন স্থির ছিল না, সুতরাং বিন্দুকে আর সুধাকে আমি যত-ক্ষণে থাওয়াতাম ততক্ষণে খেত, যতক্ষণ পরাতাম, ততক্ষণ পরিত। আমার উমাতারা যে বিন্দুও সে, আহা বেঁচে থাকুক, আর একবার আসতে বলো।

হেম। হাঁ, আসবে বৈ কি।

শাশুড়ী। এই পূজার সময় বিন্দু আসিল, আবার সেই দিনই চলে গেল; এবার পূজার সময় ত তা হবে না। ঘরের মেয়ে, পূজার সময় ঘরে ৫।৭ দিন থেকে কায কর্ম্ম করবে। আর কায কর্ম্ম ত এমন নয়, এই আমাদের ঠাকুর দর্শন করিতে, বুঝলে কি না, এই ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম আছে, সব গ্রামের কি ইতর কি ভদ্র সকলেই আসে। তোমরা বাছা বাইরে থেকে আস, বাইরে থেকে চলে যাও, ঘরের কায ত জান না। রাত তিনটের সময় হাঁড়ি চড়ে আর বেলা তিনটে পর্য্যন্ত উনুনের জ্বাল নেবে না তবু ত কুলিয়ে উঠতে পারি নি! লোকই কত, থাওয়া দাওয়াই কত, তার কি সীমা পরিসীমা আছে?

হেম। তা আর আমি দেখিনি, প্রতি বছরই দেখিতেছি, আপনার বাড়ীতে পূজার ধূমধাম, এ সকলেই জানে।

শাশুড়ী। তা কি জান বাপু, বংশানুগত ক্রিয়া কর্ম্মটা উনি না করিলে নয়। তবে যদি টাকা না থাকিত সে আলাদা কথা। এই গ্রামে কি সকলেই পূজা করে, এই তোমরা কি

পূজা কর, তা ত নয়, তার জন্য লোকে ত কিছু বলে না। তবে আমাদের পুরুষানুক্রম থেকে এটা আছে, মল্লিকদের বাড়ীর একটা নাম আছে, এঁর চাকুরিও আছে, কাজেই আমাদের না করিলে নয়, এই জন্য করা।

হেম। তা বটেইত।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত হেমচন্দ্র এই মল্লিক বাড়ীর ইতিহাস, ধনের ইতিহাস, পূজার ইতিহাস, ধনপূরের ধনেশ্বরের বংশের গৌরব, মেয়ের গৌরব, তত্ত্বের গৌরব এই সমুদয় হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সেই দিন সায়ংকালে শুনিয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে ক্ষণেক পর হেমচন্দ্রের (দৈনিক পরিশ্রমের জন্যই বোধ হয়) চক্ষু দুটী একটু একটু মুদিত হইয়া আসিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে তিনি কথার স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করিয়াই "তা বটেই ত," "তা বৈকি" ইত্যাদি শাশুড়ীর সন্তোষ জনক শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে এমন সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া শব্দ হইল; ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধূ, ষোড়শবর্ষীয়া, হীরক-মুক্তা-বিভূষিতা, রূপাভিমানিনী উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

উমাতারা অতিশয় গৌরবর্ণা, মুখখানি কাঁচা সোণার মত, এবং তাহার উপর সুবর্ণ ও হীরকের জ্যোতি বড় শোভা পাইতেছে। মাথায় সুন্দর চিক্কণ কালো চুলের কি সুন্দর চিক্কণ খোপা, তার উপর কপালে জড়ওয়া সিঁতির কি বাহার হইয়াছে! খোপায় সোনার ফুল, সোণার প্রজাপতি আর একটী হীরার প্রজাপতি! হাতে পৈচা, যবদানা, মরদানা, আর

জড়োয়া বালা, বাহুতে জড়োয়া তাবিজ ও বাজুর কি শোভা! পিঠে পিঠঝাঁপা দুলিতেছে, কটিদেশে চন্দ্রবিনিন্দিত চন্দ্রহার! গলায় চিক, বুকে সখের সাতনর মুক্তাহার! হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

ইস্ আজ কি ভাগ্যি, না জানি কার মুখ দেখে উঠেছি!

হেমচন্দ্র। আমার ভাগ্য বল; ভাগ্য না হইলে কি তোমাদের মত লোকের সঙ্গে হটাৎ দেখা হয়।

উমা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা নৈলে আর এই দশ দিন এখানে এসেছি একবার ও দেখা করিতে আস না? তা যা হোক ভাল আছ ত? বিন্দুদিদি ভাল আছে?

হেম। সে ভাল আছে। তুমি ভাল আছ?

উমা। আছি, যেমন রেখেছ, তবু জিজ্ঞাসা করিলে এই ঢের। তা আজ এখানে আমাদের দর্শন দিলে কি মনে করে? বিন্দুদিদি যে বড় ছেড়ে দিলে, এতক্ষণ এখানে আছ রাগ করিবেন না ত?

হেম। তোমার বিন্দুদিদি আপনি আস্‌তে পারলে বাঁচে সে আর ছেড়ে দেবে না। সে এই কত দিন থেকে তোমাকে দেখবার জন্য আসবে আসবে করছে। তা কাল পরশুর মধ্যে একদিন আসিবে।

উমা। তবে কালই পাঠিয়ে দিও। দেবেত?

হেম। আচ্ছা কালই আসিবে। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে অতিশয় উৎসুক, তুমি শ্বশুরবাড়ী

থাকিলে সর্ব্বদাই তোমার মার কাছে তোমার খবর জেনে পাঠায়।

উমা। তা আমি জানি। বিন্দুদিদি আমাকে ছেলে বেলা থেকে বড় ভাল বাসে, ছেলে বেলা আমরা দুইজনে একত্রে খেলা করিতাম, আমাকে এক দণ্ড না দেখে থাক্‌তে পারিত না। ছেলেবেলা মনে করিতাম বিন্দুদিদির সঙ্গে চিরকাল একত্র থাকিব, প্রত্যহ দেখা হবে, কিন্তু ছেলেবেলার ইচ্ছাগুলি কি কখনও সম্পন্ন হয়? মনের ইচ্ছা মনেই থাকে। তা কাল তোমার ছেলেদুটীকেও পাঠিয়ে দিবে?

হেম। দিব বৈ কি, অবশ্য দিব।

উমাতারা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে উমার পিতার ধনলিপ্সায়, মাতার ধন গৌরবে, শ্বশুরবাড়ীর বড়মানুষী চালে, উমার বাল্যহৃদয়, বাল্য ভালবাসা একেবারে বিলুপ্ত করে নাই, সে এখনও বাল্যকালের সৌহৃদ্য কখন কখন মনে করিত, বাল্যকালের সুহৃদ্‌কে একটু স্নেহ করিত। ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধুর অপূর্ব্ব রূপগরিমা ও বহুমূল্য হীরকমুক্তাদি দেখিয়া আমরা প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিলাম,—এগুলি দেখিলেই আমাদিগের একটু ভয় সঞ্চার হয়,—এক্ষণে যাহা হউক তাহার হৃদয়ের সদ্‌গুণ দেখিয়াও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম;—আর এই সামান্য সদ্‌গুণটী জগৎসংসারে সচরাচর দেখিতে পাইলে সুখী হইব। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর উমা বলিলেন,

তবে এখন একবার উঠ, অনুগ্রহ করে যখন এসেছ, একটু জলটল খেয়ে যাও, জল খাবার তৈয়ের হয়েছে।

উমা ঝম্ ঝম্ করিয়া আগে আগে গেলেন, হেমচন্দ্র বিনীত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। খাবারঘরে ঢুকিলেন, খাবার সম্মুখে দুটী সমাদান জ্বলিতেছে, রূপার থালে খানকত লুচি আর নানা রূপ মিষ্টান্ন, চারিদিকে রূপার বাটীতে নানা রকম ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ ক্ষীর, যেন পূর্ণচন্দ্রের চারিদিকে কত নক্ষত্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে! হেমচন্দ্রের কপালে এরূপ আয়োজন, এরূপ খাবার দাবার সহসা ঘটে না, এই রৌপ্য সামগ্রীর মূল্যে তাঁহার এক বৎসরের সাংসারিক খরচ চলিয়া যায়!

উমাতারা আবার বলিলেন,—তবে খেতে বস, আমাদের গরিবদের যথা সাধ্য কিছু করেছি, ত্রুটী হইয়া থাকিলে কিছু মনে করিও না।

শ্যালীর সহিত অনেক মিষ্টালাপ করিতে করিতে হেমচন্দ্র আহার করিতে লাগিলেন। যে বৎসর বিন্দুর বিবাহ হইয়াছিল তাহারই পর বৎসর উমার বিবাহ হয়। উমা অতিশয় গৌরবর্ণা ও সুন্দরী, হেমচন্দ্রের মতে উমার চেয়ে বিন্দুর নয়ন দুটী সুন্দর ও মুখের শ্রী অধিক, কিন্তু এ বিষয়ে হেমচন্দ্র নিরপক্ষ সাক্ষী নহেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। গ্রামে সকলে বলিত বিন্দু কালো মেয়ে, উমা সুন্দরী, এবং সেই সৌন্দর্য্য গুণেই উমার বড় ঘরে বিবাহ হইল। ধনপুরের জমিদারের ছেলে সুন্দরী না হইলে বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, উমা সুন্দরী মেয়ে বলিয়া তাহার সেই স্থানে বিবাহ হইল।

তারিণী বাবু এত ধনবান্ সম্বন্ধ করিয়া অনেক লাঞ্ছনা সহ

করিতেন, তারিণী বাবুর মহিষী ও ধনপুরের দাসীর নিকট গঞ্জনা সহিতেন ; কিন্তু বড় মানুষের কাছে লাথী ঝাঁটাও সয়, গরিবের একটী কথা সয় না।

তারিণী বাবু বড় কুটুম্ব করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার মান সম্ভ্রম বাড়িল ; তিনি ক্রমে দেশের মধ্যে একজন বড় লোক হইতে চলিলেন। এরূপ লাভ হইলে গোপনে দুই একটী গঞ্জনা ও তিরস্কার ও কুটুম্বের ঘৃণা কোন্ বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকে হেলায় না বহন করেন ?

উমাতারার টাকার সুখ হইল, অন্য সুখ তত হইয়াছিল কি না জানি না, যদি এই উপন্যাসের মধ্যে ধনপুরের জমিদার পুত্রের সহিত কখনও দেখা হয় তবে সে কথার বিচার করিব। তবে শুনিয়াছি বয়সের সহিত সেই জমিদার পুত্রের রূপ-লালসা বাড়িতে লাগিল এবং নানা দিকে প্রবাহিত হইল। কিন্তু বড় মানুষের কথায় আমাদের এখন কায নাই, আমরা গরিব গৃহস্থের ইতিহাস লিখিতেছি।

উমার শ্বশুর বাড়ীতে অন্ন কষ্টেরও অভাব ছিল না। গরিবের মেয়ে বলিয়া তাঁহাকে কখন কখন কথা সহিতে হইত, ননদদিগের লাঞ্ছনা, সময়ে সময়ে দাসীদিগেরও গঞ্জনা! কিন্তু গা-ময় গহনা পরিলে বোধ হয় অনেক কষ্ট সয়, মুক্তাহার ও জড়োয়া দেখিলে বোধ হয় হৃদয়জাত অনেক দুঃখের হ্রাস হয়। এ শাস্ত্রে আমরা বড় বিজ্ঞ নহি, সুবর্ণ রৌপ্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, জড়োয়া চক্ষুতে বড় দেখি নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও জানি না। হীরকের জ্যোতিতে মনের মালিন্য ও অন্ধকার কতদূর দূর হয় বিজ্ঞবর

পণ্ডিত ও পণ্ডিতাগণ নির্দ্ধারণ করুন। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অবধি উমাতারার সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে এবং অনেকবার উমাতারার সেই স্বর্ণ-মণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে একটু সন্দিগ্ধ-মনা হইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন সেই হীরকমণ্ডিত সুন্দর ললাটে এই বয়সেই এক একবার চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে, যেন সেই হাস্য-বিস্ফারিত নয়নের প্রান্তে সময়ে সময়ে চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। এটী কি প্রকৃতই চিন্তার ছায়া? না সেই সমাদানের আলোক এক একবার বায়ুতে স্তিমিত হইতেছে তাহার ছায়া? না ভবিষ্যৎ জীবন সেই যৌবনের ললাটে আপন ছায়া অঙ্কিত করিতেছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিষয় কর্ম্মের কথা।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বাহির বাটীতে আসিলেন, দেখিলেন তারিণী বাবু তখন একাকী বসিয়া আছেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একখানি কাগজ পড়িতেছেন,—সেখানি দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র নহে, সে একটী পুরাতন তমস্থক। তারিণী বাবুর কপালে দুই একটী বয়সের রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, শরীর স্থূল, বর্ণ শ্যাম, চক্ষু দুটী ছোট ছোট কিন্তু উজ্জ্বল, মস্তকে টাক পড়িতেছে, সম্মুখের কয়েকটী চুল পাকিয়াছে। তারিণী বাবুর আকারে বা আচরণে কিছু মাত্র বাহ্যাড়ম্বর বা অর্থের দর্প ছিল না, যাঁহারা বিষয় সৃষ্টি করেন

তাঁহাদের সে গুলি বড় থাকে না, যাঁহারা ভোগ করেন বা উড়াইয়া দেন তাঁহাদেরই সে গুলি ঘটিয়া থাকে। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া তারিণী বাবু কাগজ খানি রাখিলেন, ধীরে ধীরে চস্‌মাটী খুলিয়া রাখিলেন, পরে নম্র ও ধীর বচনে বলিলেন "এস বাবা বস।" হেমচন্দ্র উপবেশন করিলেন।

মিষ্টালাপ ও অন্যান্য কথার পর হেমচন্দ্র বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন, তারিণী বাবু কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া তাহা শুনিলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিলেন।

হেম। অনেক দিন পরে আপনি বাড়ী আসিয়াছেন আপনাকে দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম, যদি অনুমতি করেন তবে একটু বিষয় কর্ম্মের কথা কহিতে ইচ্ছা করি।

তারিণী। হাঁ তা বল না, তার আার অনুমতি কি বাবা, যা বলিতে হয় বল আমি শুনিতেছি।

হেম। আমার শ্বশুর মহাশয় যে সামান্য একটু জমি চাষ করাইতেন তাহারই কথা বলিতেছি।

তারিণী। বল।

হেম। সে জমিটুকু আমার শ্বশুর মহাশয় আজীবন দখল করিতেন ও চাষ করাইতেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা আজীবন চাষ করাইতেন তাহা অবশ্যই আপনি জানেন।

তারিণী। জানি বৈকি। এবং হরিদাসের পিতার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা সেই জমি চাষ করাইতেন, তিনি আমরাও

পিতামহ হরিদাসেরও পিতামহ। তখন আমরা বালক ছিলাম, কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে। পিতামহের কাল হইলে আমার পিতাই সমস্ত জমি চাষ করাইতেন, হরিদাসের পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তাঁহার বিষয় বুদ্ধি বড় ছিল না, এই জন্য আমার পিতাই সমস্ত সম্পত্তি এজমালিতে তত্ত্বাবধান করিতেন। পরে আমার জেঠা, হরিদাসের পিতা, পৃথক হইয়া গেলে তাঁহার জীবন যাপনের জন্য আমার পিতা তাঁহাকে কএক বিঘা জমি চাষ করিতে দিয়াছিলেন মাত্র। হরিদাসও আজীবন সেই জমি টুকু চাষ করিয়া আসিয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদিগের সম্পত্তি এজমালি। এ সকল কথা বোধ হয় তুমি জান না, কেমন করেই বা জানিবে, তুমি সে দিনের ছেলে, আর ছেলেবেলা ত গ্রামে বড় থাকিতে না, বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় লেখা পড়া করিতে।

হেমচন্দ্র এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সম্পত্তি এজমালি তাহা এই নূতন শুনিলেন! তারিণী বাবুর এই নূতন সুন্দর তর্কটী শুনিয়া তাঁহার একটু হাসি পাইল, কিন্তু অদ্য তিনি তর্ক খণ্ডন করিতে আইসেন নাই, আপস করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং হাসি সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন ;—পূর্ব্বের কথা আপনি আমাপেক্ষা অনেক অধিক জানেন তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই মাত্র বলিতেছিলাম যে শ্বশুর মহাশয় যে জমি আজীবন কাল পৃথক রূপ চাষ করিয়া আসিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার অনাথা কন্যা কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে কি?

তারিণী। আহা! বাছা বিন্দু এই বয়সেই পিতা মাতা

হারা হইয়া অনাথা হইয়াছে তাহা ভাবিলে বুক ফেটে যায়! আহা! আজ যদি হরিদাস থাকিত, এমন সোণার চাঁদ মেয়েকে নিয়া, এমন সচ্চরিত্র সোণার জামাইকে লইয়া ঘর করিতে পারিত, তাহা হইলে কি এত গণ্ডগোল হইত, এত খরচ করিয়া আমাকে তাহার কর্ষিত জমিটুকু রক্ষা করিতে হইত? তবে ভগবানের ইচ্ছা। হরিদাস গিয়াছেন, আমাকে একলাই সমস্ত ভার বহন করিতে হইল; এজমালি জমির যে অংশটুকু তিনি চাষ করাইতেন তাহা পুনরায় অন্যান্য জমির সহিত আমাকেই তত্ত্বাবধাণ করিতে হইতেছে। তাহাতে আমার লাভ বিশেষ নাই, সেই জমিটুকু রক্ষার জন্য তাহার মূল্য অপেক্ষা ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু কি করি পৈতৃক সম্পত্তি পরের হাতে যায়, জমিদার অন্যকে দেয় তাহা ত আর চক্ষুতে দেখা যায় না।

হেম। তবে শ্বশুর মহাশয়ের জমি হইতে কি তাঁহার কন্যা কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারে না।

তারিণী। প্রত্যাশা আবার কি বল; আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, তোমরা কালেজের ছেলে তোমাদের সব কথা একটু ভাঙ্গিয়া না বলিলে কি বুঝিয়া উঠিতে পারি? বিন্দু আমাদের ঘরের ছেলে, আমার উমা যে বিন্দু সে, যত দিন আমার ঘরে এক কুন্‌কে চাল আছে তত দিন বিন্দু ও উমা তাহার সমান ভাগ করে খাবে। তাহাতে আবার জমির অংশই কি প্রত্যাশাই কি?

হেমচন্দ্র দেখিলেন তারিণী বাবুর সঙ্গে পেরে উঠা ভার, তারিণী বাবুর সুন্দর তর্ক তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বৃথা চেষ্টা করিয়া, অনেকক্ষণ

কথাবার্ত্তা করিয়া অবশেষে কহিলেন,—মহাশয় যদি অনুমতি দেন, যদি রাগ না করেন, তবে আর একটি কথা বলি।

তারিণী। বল না বাবা এতে রাগের কথা কি আছে? তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথায় আবার রাগ?

হেম। আপনি বোধ হয় জানেন যে শ্বশুর মহাশয় যে জমি আজীবনকাল পৃথক রূপ চাষ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা যে এজমালি সম্পত্তি তাহা আমরা স্বীকার করি না।

তারিণী। তোমরা স্বীকার কর্‌বে কেন? তোমরা কালেজের ছেলে, ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়াছ, তোমরা কি আর এজমালি স্বীকার করিবে? এখন কালেজের ছেলেরা ভায়ে ভায়ে একত্র থাকিতে পারে না, শুনেছি মায়ে পোয়ে এজমালিতে থাকিতে পারে না, তোমাদের কথা কি বল? আমরা বুড়ো স্থড়ো লোক, আমরা সে সব বুঝিনা, আমরা এজমালিতে থাকিতে ভালবাসি, বাপ পিতামহ যা করে গিয়াছেন তাই করিতে ভালবাসি। আহা, থাক্‌তো আমার হরিদাস সে জানিত এ জমি মল্লিক বংশের এজমালি সম্পত্তি কি না, তোমরা সে দিনকার ছেলে তোমরা কি জান্‌বে বল?

হেম। তা যাহাই হউক, আমরা এজমালি বলিয়া স্বীকার করি না তাহা আপনি জানেন। আর এজমালিই হউক আর নাই হউক, সে সম্পত্তির একটু অংশ বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। আমার শ্বশুর মহাশয় যে জমিটুকু চাষ করিতেন এক্ষণে আমার স্ত্রীর পক্ষে আমি যদি সেই জমিটুকু পৃথক রূপ চাষ করিতে চাহি তাহাতে কি আপনি সম্মত আছেন?

তারিণী বাবু কিছু মাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—ছি বাবা, তুমি স্বভাবত বুদ্ধিমান ছেলে, লেখা পড়া শিখিয়াছ এমন নির্ব্বুদ্ধির কথা কেন? মল্লিক বংশের বংশানুগত এজমালি জমি কি পৃথক করা যায়? তাহাই যদি পারিতাম তবে সেই জমিটুকুর মূল্যের দশগুণ খরচ করিয়া আমার হাতেই রাখিলাম কেন? সঙ্গত কথা বল, তবে শুনিতে পারি; অসঙ্গত কথা শুনিব কেমন করিয়া? ওরে হরে! আর এক ছিলুম তামাক দিয়ে যা, রাত হইয়াছে, আর এক ছিলুম তামাক খেয়ে শুতে যাই, কাল রাত্রিতেও গ্রীষ্মে বড় ঘুম হয় নাই, গাটা বড় ঘুম্ ঘুম্ করচে।

উগ্রস্বভাব হেমচন্দ্রের মনে একটু রাগের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন তিনি বাস্তবিকই অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। যে জমি তারিণী বাবুর ন্যায় বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন লোক দশ বৎসর দখল করিয়া অসিয়াছেন সেটী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলা অসঙ্গত নহে ত কি? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,—

আপনার যদি শয়নের সময় হইয়া থাকে তবে আমি আর আপনাকে বসাইয়া রাখিব না, তবে আর একটী কথা আছে যদি আজ্ঞা করেন তবে নিবেদন করি।

তারিণী। না না তাড়াতাড়ি উঠিও না; অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম চক্ষু জুড়াইল, তোমাকে কি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে? তবে বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে তাই গাটা মাটি মাটি করে। তা এখনই আমি শুইতে যাইব না, বিলম্ব আছে, কি বলিতেছিলে বল।

হেম। আপনি সে জমি টুকু ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করি-বেন তাহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে সেই জমির জন্য আমরা কিছু কি প্রত্যাশা করিতে পারি? এ বিষয়ে মকদ্দমা করাতে আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা, কোনও মতে আপসে এ বিষয়টা মিমাংসা হয় তাহাই আমাদের ইচ্ছা। যদি আদা-লতে যাইতে হয় তবে জমি এজমালি বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কি না এবং হইলেও আমরা এক অংশ পাইব কি না, বিবেচনা করিয়া দেখুন, কিন্তু আপসে নিষ্পত্তি হইলে আদালতে যাইতে আমাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছা।

হেমচন্দ্র উগ্রস্বভাব লোক, সহসা আদালতে যাইতে পারেন, তিনি সেই জন্য সম্প্রতি উকিলদিগের পরামর্শ লইতেছেন, এ কথাগুলি তারিণী বাবু জানিতেন। আদালতে যদি হেমচন্দ্র মকদ্দমার ব্যয় বহন করিতে পারেন তবে শেষে কি ফল হইবে তাহাও তারিণী বাবু কতক কতক অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপসের কথায় বড় অসম্মত ছিলেন না। যৎ-কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া হরিদাসের সত্ত্ব একেবারে ক্রয় করিয়া লইবেন এরূপ মত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বড় অল্প। বলিলেন,—

দেখ বাপু, যদি আদালত করিতে ইচ্ছা কর তবে অগত্যা আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে, আদালতে বিস্তর খরচ, কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার্থ আমি বোধ হয় বহন করিতে পারিব, তুমি বহিতে পারিবে কি না, তুমিই ভাল জান। আর যদি সে কথা ছাড়িয়া দিয়া সত্যই আপসের কথা বল, তবে বিন্দুকে হাত তুলিয়া কিছু দিব তাহাতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে?

আমরা মূর্খ মানুষ, তোমাদের ন্যায় আইন কানুন দেখি নাই, কিন্তু বর্দ্ধমানে চাকরি করিয়া আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে, মকদ্দমাও বিস্তর দেখিয়াছি। মকদ্দমা করিয়া যে মল্লিক বংশের এজমালি সম্পত্তির এক অংশ ছাড়াইয়া লইতে পারিবে এমন বোধ হয় না, ইচ্ছা হয় চেষ্টা করিয়া দেখ। কিন্তু যদি সত্য সত্যই সে বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও, যদি তোমাদের কালেজের ইংরাজী শিক্ষায় আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাদ করিতে না শিখাইয়া থাকে, যদি বুড়ো স্থুড়ো লোককে একটু শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদের একটু বশ হইয়া চলিতে শিখাইয়া থাকে, তবে সঙ্গত কথা বল, তাহাতে আমার কখনই অমত হইবে না। দেখ বাপু, আমি এক কথার মানুষ, ঘোর ফের বড় বুঝিওনি ভালও বাসিনি, এক কথাই ভাল বাসি। যদি ৩০০ খানি টাকা নিয়া এই জমি টুকুর সত্ব একেবারে ছাড়িয়া দাও তবে আমি সম্মত আছি। আমরা সামান্য বেতনের চাকুরি করি, ৩০০ টাকা করিতে অনেক মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, টাকা বড় যত্নের ধন। তবে বিন্দু আমার ঘরের মেয়ে, তাকে হাতে করে মানুষ করেছি, তার বিয়ে দিয়েছি, তাকে টাকা দিব তাহাতে আর কথা কিসের? আমিই ত বিন্দুর বিয়ে দিয়েছি, না হয় আর একখানি ভাল গহনা দিলাম, তাতেও ত দুই তিন শত টাকা লাগিত। তা দেখ বাপু, বুড়োর এ কথায় যদি মত হয় ত দেখ, আর যদি মত না হয়, তোমরা ভাল লেখাপড়া শিখেছ, যেটা ভাল মনে হয় কর।

হেম। মহাশয় ৩০০ টাকা বড়ই অল্প বোধ হয়। সে জমিতে বৎসরে প্রায় ২০০ টাকার ধান হয়।

তারিণী। তাহার মধ্যে বীজ খরচ, জন খরচ, জমিদারের খাজানা, পথকর, বাজে খরচ, ইত্যাদি দিয়া সালিয়ানা কত থাকে তাহা কি হিসাব করা হইয়াছে ?

হেম। অল্পই থাকে বটে।

তারিণী। সে জমিটুকু রক্ষার্থ কত আমাকে খরচ করিতে হইয়াছে তাহা কি জানা আছে ?

হেম। আজ্ঞে না, তা জানি নি।

তারিণী। তবে আর অল্প মূল্য হইল কি অধিক হইল তাহা কিরূপে বুঝিলে ? দেখ বাপু, এ বিষয়ে আর তর্ক অনাবশ্যক, আমি এক কথার মানুষ, ইহার উর্দ্ধ দিতে পারিব না। যদি ৩০১ টাকা চাহ তাহা দিতে পারিব না। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে যদি মত না হয় অন্য পথ অবলম্বন কর।

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। এরূপ মূল্য পাইয়া জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ হইল; কিন্তু বিন্দুর সৎপরামর্শ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,

মহাশয় যাহা দিলেন তাহাই অনুগ্রহ, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম।

তারিণী বাবুর স্বাভাবিক প্রসন্ন মুখখানি সম্প্রতি কিছু রুক্ষ হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার কথা হইতেই আমরা তাহা কিছু কিছু বুঝিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে সে মুখকান্তি সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসন্নতা লাভ করিল। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন,

তা বাবা, তুমি যে সম্মত হইবে তাহা ত জানাই আছে।

তোমার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে কি আজকাল আর দেখা যায়? কত দেখে শুনে তোমার সঙ্গে আমার বিন্দুর বিবাহ দিয়াছি, আমি কি না জেনে শুনেই কাজ করেছি? আর তুমি কালেজে লেখা পড়া শিখেছ, কালেজের ছেলে ভাল হইবে না ত কি আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ভাল হইবে? আজ তোমাকে দেখে যে কত আহ্লাদিত হইলাম তা আর তোমার সাক্ষাতে কি বলিব? আর দুটা পান খাও না। ওরে হরে! বাড়ীর ভিতর থেকে দুটো পান এনে দেত।

হেম। আজ্ঞে না, আপনার ঘুমের সময় হইয়াছে আর বসিব না।

তারিণী। কোথায় ঘুমের সময়? আমি দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে ঘুমাইতে যাই না। আবার কাল রাত্রিতে খুব ঘুম হইয়াছিল, আজ একবারেই ঘুম পাইতেছে না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

তারিণী। আর তুমি এত দিনের পর এলে, তোমাকে ফেলে ঘুম! দুটা কথাই কই। আর দেখ বাবু এই টাকাটা লইয়া একটা দলীল লিখিয়া দিলেই ভাল হয়। তোমরা কালেজের ছেলে তোমাদের কথাই দলীল, তবে কি জান, একটা প্রথা আছে, সেটা অবলম্বন করিলেই ভাল হয়।

হেম। অবশ্য; যখন কোন কায করা যায়, নিয়ম অনুসারে করাই ভাল।

তারিণী। তাত বটেই, তোমরা ইংরাজি শিখিয়াছ তোমাদের কি আর এসব কথা বলিতে হয়। আর তোমরা যখন দলীল দিতেছ, বিন্দু যখন সই করিবে, আর তুমি যখন

তাহাতেই সাক্ষী হইবে, তখন রেজিষ্টরি করা বাহুল্য মাত্র। তবে একটা রীতি আছে।

হেম। অবশ্য আমি সাক্ষী হইব এবং দলীল রেজেষ্টরী হইবে; এরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই হইবে।

তারিণী। তা বৈকি, তা কি তোমার মত ছেলেকে আর বুঝাতে হয়? আর একটা কি জান দলীলের ষ্টাম্প খরচা আছে, রেজেষ্টরী আপিসে যাইতে গাড়ীভাড়া আছে, শেনাক্ত করার খরচা আছে, রেজেষ্টরী ফি আছে, এ কাযটা যে ৮।১০ টাকার কমে সম্পাদন হয় বোধ হয় না। তা বিন্দু আমার ঘরের ছেলে সে টাকা আর বিন্দুর কাছে লইতাম না, তবে কি জান, এই ৩০০৲ টাকা দিতেই আমার বড় কষ্ট হইবে, আর যে একটী পয়সা দিতে পারি আমার বোধ হয় না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, মনে মনে করিলেন "তারিণী বাবু যাত্রায় এক রাত্রিতে একশত টাকা খরচ করেন, আমার দশ টাকা হইলে মাসের খরচা চলিয়া যায়!" প্রকাশ্যে বলিলেন- "আচ্ছা আচ্ছা, তাহাও দিতে আমি সম্মত হইলাম।"

তারিণী। তা হবে বৈ কি, তোমার ন্যায় সুবোধ ছেলেকে কি আর এ সব কথা বলিতে হয়?

আরও অনেকক্ষণ কথা হইল। বিষয়ী তারিণী বাবু একটী একটী করিয়া সমস্ত নিয়মগুলি আপনার সাপক্ষে স্থির করিয়া লইলেন, বিষয়-বুদ্ধি-হীন হেমচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন না। রাত্রি দেড় প্রহরের পর তারিণী বাবু হেমচন্দ্রের অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহাকে সত্বর বর্দ্ধমানে একটী চাকুরি করিয়া

দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং তিনি কালে একজন ধনী, জ্ঞানী, মানী, দেশের বড় লোক হইবেন আশ্বাস দিয়া হেমচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। হেমচন্দ্রও শ্বশুর মহাশয়ের ভদ্রাচরণের অনেক স্তুতিবাদ করিয়া বাড়ী আসিলেন।

আমাদিগের লিখিতে লজ্জা হয় তারিণী বাবু ও হেমচন্দ্রের এই পরস্পরের প্রচুর মিষ্টালাপ ও স্তুতিবাদ তাঁহাদের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করে নাই। হেমচন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "শাইলক্‌কে পণের অল্প অংশ পরিত্যাগ করান যায়, কিন্তু ধনী মানী বিষয়ী বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী তারিণী বাবুর পণ বিচলিত হয় না।" তারিণী বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া গৃহিণীকে বলিতেছিলেন "আজকাল কালেজের ছেলেগুল কি হারামজাদা; আর এই হেমই বা কি গোঁয়ার; বলে কিনা জ্যাঠশ্বশুরের সঙ্গে মকদ্দমা করিবে! বলিতেও লজ্জা বোধ হয় না। শীঘ্র অধঃপাতে যাবে।" গৃহিণী এ কথাগুলি বড় শুনিলেন না, তিনি ধনবান্ কুটুম্বের কথা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকালের বন্ধু।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিয়া দেখিলেন বিন্দু তাঁহার জন্য উৎসুক হইয়া পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হেমকে দেখিবা মাত্র সে শান্ত মুখখানি স্ফূর্ত্তিপূর্ণ

হইল, নয়ন দুটীতে একটু হাসি দেখা দিল, হেমের মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া বিন্দু বলিলেন,

কি ভাগ্গি তুমি এতক্ষণে এলে; আমি মনে করিলাম বুঝি বাড়ীর পথ ভুলিয়াই গিয়াছ। কিম্বা বুঝি উমাতারার কথা ঠেলিতে পারিলে না, আজ জেঠা মহাশয়ের বাড়ী থেকে বুঝি আস্‌তে পারিলে না।

হেম। কেন বল দেখি, এত ঠাট্টা কেন? অধিক রাত্রি হইয়াছে নাকি?

বিন্দু আবার হাসিয়া বলিলেন,—না এই কেবল দুপুর রাত্রি! আর সন্ধ্যা থেকে তোমার একজন বন্ধু অপেক্ষা করিতেছেন।

হেম। কে? কে? কে?

"এই দেখ্‌বে এস না" এই বলিয়া বিন্দু আগে আগে গেলেন, হেম পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

বাড়ীর ভিতর যাইবা মাত্র একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; হেমচন্দ্র ক্ষণেক তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, বিন্দু তাঁহা দেখিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর হেম বলিলেন,—এ কি শরৎ! তুমি কলিকাতা হইতে কবে আসিলে? উঃ তুমি কি বদলাইয়া গিয়াছ; আমি তোমাকে তোমার দিদি কালীতারার বিবাহের সময় দেখিয়াছিলাম, তখন তুমি বর্দ্ধমানে পড়িতে, একবার বাড়ী আসিয়াছিলে; তখন তুমি সাত আট বৎসরের বালক ছিলে মাত্র। এখন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় যুবক হইয়াছ; তোমার দাড়ী গোঁপ হইয়াছে; তোমাকে কি সহসা চেনা যায়।

শরৎ। নয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয় তাহার সন্দেহ কি ? দিদির বিবাহের পরেই বাবার মৃত্যু হইল, তাহার পর মাও গ্রাম হইতে বর্দ্ধমানে গিয়া রহিলেন, সেই জন্য আর বাড়ী আসা হয় নাই। আমি এণ্ট্রেন্স পাস করিলে পর বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় যাইলাম, মাও বর্দ্ধমানের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় গ্রামে আসিয়া রহিয়াছেন, তাই আমাদের গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিলাম। নয় বৎসরের পর আপনি আমাতে পরিবর্ত্তন দেখিবেন তাহাতে বিস্ময় কি ? আমিই তখন কি দেখিয়াছি, আর এখন কি দেখিতেছি! বিন্দুদিদি আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড়, সুতরাং আমরা ছেলে বেলায় সর্ব্বদা একত্রে খেলা করিতাম, আমি মল্লিকদের বাড়ী যাইতাম, অথবা বিন্দু দিদি সুধাকে কোলে করিয়া আমাদের বাড়ী দেখিতে আসিতেন, পেয়ারা তলায় সুধাকে রাখিয়া আঁকসি দিয়া পেয়ারা পাড়িয়া খাইতেন; আজ কিনা বিন্দুদিদি সংসারে গৃহিনী, দুই ছেলের মা!

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আর তুমি আর বলিও না, তোমার দৌরাত্ম্যে তালপুখুরের আঁববাগানে আঁব থাকিত না, এখন কলিকাতায় গিয়ে লেখা পড়া শিখিয়া তুমি কালেজের ছেলেদের মধ্যে নাকি একজন প্রধান ছাত্র হয়েছে, তখন গেছোদের মধ্যে একজন প্রধান গেছো ছিলে!

শরৎ। বিন্দুদিদি সেও তোমাদের জন্য! তোমার জেঠাই মা কাঁচা আঁবগুলো খেতে বারণ করিতেন, আমি সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়া গলিয়ে রান্নাঘরে আঁব দিয়া আসিতাম কি না বলিও!

হেম উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর পরস্পরের গুণ

ব্যাথার আবশ্যক কি, অনেক গুণ বেরিয়ে পড়েছে! আমিও তোমাদের বাড়ী যাইতাম, এবং সুধাকে তথায় কখন কখন দেখিতে পাইতাম, তখন সুধা ৪। ৫ বৎসরের ছোট মেয়েটী। সুধা! ঘোষেদের বাড়ী যেতে মনে পড়ে? সেখানে তোমার দিদি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতেন মনে পড়ে, শরৎকে মনে পড়ে?

সুধা। শরৎ বাবুকে একটু একটু মনে পড়ে, দিদি আপনি পেয়ারা পাড়িয়া খাইত, আমি পাড়িতে পারিতাম না, শরৎ বাবু আমাকে কোলে করিয়া পেয়ারা পাড়িয়া খাওয়াইতেন।

হেমচন্দ্র তখন বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়াছে? শরৎ খেয়েছে?

শরৎ। হাঁ, বিন্দুদিদি আমাকে যেরূপ কচি আঁবের অম্বল খাইয়েছেন, সেরূপ কচি আঁব কখনও খাই নাই!

বিন্দু। কেন নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন গাছে গাছে বেড়াইতে, তখন!

শরৎ। হাঁ তখন খাইয়াছি বটে, কিন্তু তখন ত এরূপে রাঁধিয়া দিবার কেহ ছিল না।

বিন্দু। থাক্‌বে না কেন? রেঁদে দিবার তর্ সইত না তাই বল।

হেম। সুধার খাওয়া হইয়াছে? তোমার খাওয়া হইয়াছে?

বিন্দু। সুধা খেয়েছে, আমি এই যাই খাইগে। তুমি আর কিছু খাবে না?

হেম। না; তোমার জেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে যেরূপ

খাইয়া আসিয়াছি। আর কি খাইতে পারি? যাও তুমি যাও খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে, অনেক রাত্রি হইয়াছে।

বিন্দু রান্না ঘরে গেলেন। সুধা হেমচন্দ্রের জন্য এতক্ষণ জাগিয়াছিল, এখন রকের উপর একটী মাদুর পাতিয়া শুইল, চিন্তাশূন্য বালিকা শুইবামাত্র সেই শীতল নৈশ বায়ুতে ও শুভ্র বর্ণ চন্দ্রালোকে তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সমস্ত তালপুখুর গ্রাম এখন নিস্তব্ধ এবং সেই সুন্দর চন্দ্রকরে নিদ্রিত।

হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র সেই রকে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। তালপুখুরের ঘোষ বংশ ও বসু বংশের মধ্যে বিবাহ সূত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন, ও প্রীতি করিতেন। এক্ষণে ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র, উন্নত-হৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীরপ্রকৃতি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ শরচ্চন্দ্রের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিলেন; শরচ্চন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত, তেজঃপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে পারিলেন। এ জগতে আমাদিগের অনেক আলাপী লোক আছে, মনের ঐক্য অতি অল্প লোকের সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অনুরূপ লোক দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র যতই কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদিগের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হইতে হইতে বিন্দু আহারাদি সমাপন করিয়া সুধার আসিয়া বসিলেন; সুধার মাথায় বালিশ ছিল না, সুপ্ত

ভগ্নীর মস্তকটী আপন ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ কেশগুলি লইয়া সস্নেহে খেলা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

শরৎ তুমি এবার "এল এর" জন্য পড়িতেছ। ছয় সাত মাস পরই তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষায় তুমি যে প্রথম শ্রেণীতে হইবে এবং জলপানি পাইবে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার পর কি করিবে স্থির করিয়াছ কি ?

শরৎ। কিছুই স্থির নাই। আমার ইচ্ছা "বিএ" পর্য্যন্ত পড়িতে। কিন্তু মা গ্রামে থাকেন এবং আমাকে এই পরীক্ষা দিয়া গ্রামে আসিয়া বিষয়টী দেখিতে ও এখানে থাকিতে বলেন। তা দেখা যাউক কি হয়। আমাদের বিষয়ও অতি সামান্য বৎসরে সাত, আট শত টাকার অধিক লাভ নাই, কোনও উপ-যুক্ত চাকুরি পাইলে করিতে ইচ্ছা আছে। মাও চাকুরি স্থানে আমার সহিত থাকিবেন ; এখানে লোক জন বিষয় দেখিবে।

হেম। তাহা যাহা হউক তোমার পরীক্ষার পর হইবে। এই কয়েকমাস কলিকাতায় থাকিয়া মনোযোগ করিয়া পড়া শুনা কর, "এণ্ট্রেন্স্" পরীক্ষা যেরূপ সম্মানের সহিত দিয়াছ এই পরীক্ষাটা সেইরূপ দাও।

শরৎ। সেইরূপ ইচ্ছা আছে। শীঘ্র কলিকাতা যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিব। আমি মনে মনে এক একবার ভাবি আপনারাও কেন একবার কলিকাতায় আসুন না ; আপনারা কি চিরকালই এই গ্রামে বাস করিবেন ? আপনি নয় বৎসর পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় কএকমাস ছিলেন, বিন্দুদিদি কখনও কলিকাতা দেখেন নাই ; একবার উভয়েই চলুন না

কেন? এই চাষ দেওয়া, ধান বুনা হইয়া গেলে আসুন, আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, আবার ইচ্ছা হইলে পুনরায় ভাদ্রমাসে ধান কাটিবার সময় আসিবেন।

হেম। শরৎ তুমি আমাদের স্নেহ কর তাই এ কথা বলিতেছ। কিন্তু আমি কলিকাতায় গিয়া কি করিব বল? তুমি লেখা পড়া করিবে, পরীক্ষা দিবে, সম্ভবতঃ চাকুরি পাইবে; আমি গিয়া কি করিব বল?

শরৎ। কেন, আপনি কি কোনও প্রকার চেষ্টা দেখিতে পারেন না। আপনি এরূপ লেখা পড়া শিখিয়া কি চিরজীবন এইখানে কাটাইবেন? শুনিয়াছি আপনি কলেজ ছাড়িয়া বিস্তর বই পড়িয়াছেন, যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, "বি এ" দিগের মধ্যে অল্প লোকেরই আপনার ন্যায় সেটী আছে? আপনার শিক্ষায়, আপনার অধ্যবসায়ে আপনার উন্নত সততায় কি কোনও এক প্রকার উপায় হইবে না?

হেম। শরৎ আমার শিক্ষা অধিক নহে, সামান্য; পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হয়, অন্য কায নাই, সেই জন্য দুই একখানা করিয়া দেখি। আর কলিকাতার ন্যায় মহৎ স্থানে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উপযুক্ত লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইতেছে, কিছু হয় না, আমি যখন কলেজে ছিলাম তাহা দেখিয়াছি। গুণ থাকিলেও এত লোকের মধ্যে গুণের পরিচয় দেওয়া কঠিন, আমার ন্যায় নির্গুণ লোক তিন চারি মাসে কিছুই করিতে পারিবে না, ব্যর্থযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে।

শরৎ। যদি তাহাই হয় তাহাতে ক্ষতি কি? আপনারা

অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে থাকিলে আপনাদিগের কিছুমাত্র ব্যয় হইবে না, একবার সকলের কলিকাতা দেখা হইবে, একবার উন্নতির চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে; আমার স্থির বিশ্বাস যে বিশাল মনুষ্য-সমুদ্রেও আপনার ন্যায় শিক্ষা, গুণ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও অসাধারণ সততা অচিরেই পরিচিত ও পুরস্কৃত হইবে। আর যদি তাহা না হয়, পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসিবেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন "শরৎ তুমি আমাদিগকে নিজ গৃহে স্থান দিতে চাহিলে এটী তোমার অতিশয় দয়া। কিন্তু আমরা যদি সত্য সত্যই কলিকাতায় যাই তাহা হইলে নিজেরাই একটী বাসা করিয়া থাকিব, তোমার পড়ার অসুবিধা করিব না। সে যাহা হউক, এ কথা অদ্য রাত্রিতে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নহে; তারিণী বাবু বর্দ্ধমানে যাইতে বলিতেছেন, তুমি কলিকাতায় যাইতে বলিতেছ, আমারও ইচ্ছা কোথাও যাইয়া একবার উন্নতির চেষ্টা করিয়া দেখি। বিবেচনা করিয়া, তোমার পরামর্শ লইয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিষ্পত্তি করিব।

শরৎ। বিন্দুদিদি! তোমার কি ইচ্ছা, একবার কলিকাতা দেখিতে ইচ্ছা হয় না?

বিন্দু। ইচ্ছা ত হয় কিন্তু হইয়া উঠে কৈ? আর শুনিয়াছি সেখানে অতিশয় খরচ হয়, আমরা গরিব লোক, এত টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?

শরৎ। আপনারা ইচ্ছা করিয়া টাকা খরচ করিলেই খরচ হয় নচেৎ খরচ নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আপনারা

যদি আমাদের বাড়ীতে থাকেন, তাহা হইলে আমার লেখা পড়ার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না; অনেক সময় যখন পড়িতে পড়িতে মনটা অস্থির হয়, তখন আপনাদিগের লোকের সহিত কথা কহিলে মন স্থির হয়।

বিন্দু। আবার অনেক সময় যখন পড়া শুনা করা উচিত, তখন বাড়ীর ভিতর আসিয়া ছেলে বেলার পেয়ারা পাড়ার গল্প করা হবে; তাহাতে খুব লেখা পড়া হবে!

শরৎ। আর অনেক সময় যখন ভাত খাইতে অরুচি হইবে তখন কচি কচি আঁবের অম্বল খাওয়া হইবে; আমি দেখিতে পাইতেছি লাভের ভাগটাই অধিক।

বিন্দু। হাঁ তোমার এখন লাভেরই কপাল? ঐ যে শুন্‌ছিলাম, অম্বল রাঁদ্রুনী একটা শীঘ্র আসিবে?

শরৎ। কে?

বিন্দু। কেন কিছু জান না নাকি? ঐ তোমার মা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করছেন না?

শরৎ একটু লজ্জিত হইলেন, বলিলেন,—সে কোন কাযের কথা নয়।

হেম। তোমার মাতা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে-ছেন না কি?

শরৎ। মা তত জেদ্ করেন না, কিন্তু দিদির বড় ইচ্ছা যে, আমার এখনই বিবাহ হয়, দিদিই নাকি বর্দ্ধমানে সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন এবং পরশু গ্রামে আসিয়া অবধি মাকে লওয়াই-তেছেন। কিন্তু আমি মাকেও বলিয়াছি, দিদিকেও বলিয়াছি, এই পরীক্ষা না দিয়া এবং কোনও প্রকার চাকুরি বা অন্য অবলম্বন না পাইয়া আমি বিবাহ করিব না।

বিন্দু। আহা কালীতারার সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হয় নাই। ছেলে বেলা আমি আর কালীতারা আর উমাতারা একত্রে খেলা করিতাম, কালী আমার চেয়ে ছয় মাসের ছোট, আর উমা আবার কালীর চেয়ে ছয় মাসের ছোট, আমরা তিনজন সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতাম। কিন্তু এখন ছয়মাসে নয় মাসে একবারও দেখা হয় না! কাল একবার তোমাদের বাড়ী যাইব, আবার উমাতারার সঙ্গেও দেখা করিতে যাইব।

শরৎ। দিদি কাল উমার বাড়ী যাইবে, বিন্দুদিদি তুমিও সেইখানে গেলেই সকলের সহিত দেখা হইবে।

বিন্দু। তবে সেই ভাল। আহা কালীকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে। আমার বিয়ে হইবার আগে কালীর বিয়ে হইয়াছে, আহা সেই অবধি সে যে কত কষ্ট পাইয়াছে কে বলিতে পারে। আচ্ছা, শরৎ বাবু তোমার মা দেখিয়া শুনিয়া এমন ঘরে বিবাহ দিলেন কেন? বের সময় বরকে দেখিয়াছিলাম, লোকে বলে তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ছিল!

শরৎ। বিন্দুদিদি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। মার ওসম্বন্ধে অধিক মত ছিল না, কিন্তু বরেদের কুল বড় ভাল, লোকে বলিল বর্দ্ধমান জেলায় এরূপ কুল পাওয়া দুষ্কর, পাড়ার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলেই জেদ করিতে লাগিল, বাবা তাহাতে মত দিলেন, সুতরাং মা কি করিবেন? বিবাহ দিয়া অবধি মা সেই বিষয়ে দুঃখ করেন, বলেন মেয়েটীকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। আমার ভগিনীপতির বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, তিনি রোগাক্রান্ত ও জীর্ণ, তাঁহার সংসারের অনেক দাস দাসীর মধ্যে দিদি একজন দাসী মাত্র। প্রাতঃকাল

হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কায কর্ম্ম করেন, দুবেলা দুপেট খাইতে পান, দিদি তাহাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার সরল চিত্তে অন্য কোনও আশা নাই। আমাদের সংসারে গৃহে গৃহে যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা তাপসী আছে, পূর্ব্বকালে মুনিঋষিদিগের মধ্যেও সেরূপ ছিল কি না জানি না।

কালীতারার অবস্থা চিন্তা করিয়া বিন্দু ধীরে ধীরে এক বিন্দু অশ্রুজল মোচন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শরৎ বলিলেন, বিন্দুদিদি, তবে আজ আমি আসি, অনেক রাত্রি হইয়াছে। আবার কাল দেখা হবে। যত দিন আমি গ্রামে আছি তোমার কচি আঁবের অম্বল এক এক বার আস্বাদন করিতে আসিব। আর যদি অনুগ্রহ করিয়া তোমরা কলিকাতায় যাও, তবেত আর আমার সুখের সীমা নাই।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন,—তা আচ্ছা এস। কলিকাতায় যাওয়া না যাওয়া কাল স্থির করিব, কিন্তু যাওয়া হউক আর নাই হউক, কচি আঁবের অম্বল রাঁধিতে পারে এমন একজন রাঁধুনীর বিষয় কাল তোমার দিদির সঙ্গে বিশেষ করিয়া পরামর্শ ঠিক করিব, সে বিষয় আর ভাবিতে হইবে না।

হাসিতে হাসিতে শরৎচন্দ্র, হেম ও বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুধা তখনও নিদ্রিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্ম্মল চন্দ্রালোক সুধার সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ওষ্ঠদ্বয়ে, সুচিক্কণ কেশপাশে ও সুগোল বাহুতে বিরাজ করিতেছিল। বালিকা খেলার কথা বা বিড়াল বৎসের কথা বা বাল্যকালে পেয়ারা খাইবার কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল!

বাটী হইতে নির্গত হইয়া শরৎচন্দ্র সেই নির্ম্মল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—আমি বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনাঢ্যের পরিবার দেখিয়াছি, কিন্তু অদ্য এই পল্লিগ্রামের সামান্য গৃহে যেরূপ সরলতা, অমায়িকতা, অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম্ম দেখিলাম সেরূপ কুত্রাপি দেখি নাই। জগদীশ্বর! হেমচন্দ্রের পরিবার যেন সর্ব্বদা নিরাপদে থাকে, সর্ব্বদা সুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকে। বাল্যকাল হইতে একাকী থাকিয়া ও কেবল পাঠে রত থাকিয়া আমার এ জীবন শুষ্কপ্রায় হইয়াছে, আমার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি শুখাইয়া গিয়াছে। হেম চন্দ্রের প্রণয় ও বিন্দুদিদির স্নেহে অদ্য আমার হৃদয় যেন পুনরায় প্লাবিত হইল; জগদীশ্বর করুন যেন এই পবিত্র স্নেহপূর্ণ পরিবারের নিকট থাকিয়া আমি পুনরায় মনুষ্যোচিত স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিতে পারি। এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে শরৎ বাড়ী গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিন্দুর বন্ধুগণ।

পরদিন প্রত্যূষে বিন্দু গাত্রোত্থান করিয়া ঘর দ্বার প্রাঙ্গন ঝাঁট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাতের পুখুরে বাসন মাজিতেছিলেন, এমন সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল। হেমচন্দ্র ও সুধা তখনও উঠেন নাই অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র

আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন সনাতনের স্ত্রী। বিন্দু বাল্যাবস্থায় তাহাকে কৈবর্ত্ত দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন নাই। বলিলেন,

কি কৈবর্ত্ত দিদি, এত সকালে কি মনে করে? তোর হাতে ও কি ও?

সনাতনের পত্নী। না কিছু নয় দিদি, মনে করনু আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই, আর সুধাদিদি চিনি পাতা দৈ বড় ভাল বাসে, তাই কাল রেতে দৈ পেতে রেখেছিনু, সুধাদিদির জন্য এনেছি। সুধাদিদি উঠেছে?

বিন্দু। না এখনও উঠে নাই। তা তোরা বোন্ গরিব লোক রোজ রোজ দুদ দৈ দিস কেন বল দেখি? তোরা এত পাবি কোথা থেকে ব'ন?

স-প। না এ আর কি দিদি, বাড়ীর গরুর দুদ বৈত নয়, তা দু এক দিন আনুনুই বা। গরুও তোমাদের, আমাদের ঘর দোরও তোমাদের, তোমাদের দুটো খেয়েই আমরা আছি, তা তোমাদের জিনিস তোমরা খাবে না ত কে খাবে।

বিন্দু। তা দে ব'ন এখন শিকেয় তুলে রেখে দি, ভাত খাবার সময় ভাতের সঙ্গে খাব এখন। কৈবর্ত্ত দিদি তুই বেস দৈ পাতিস, সুধা তোর দৈ বড় ভাল বাসে। ও কি লো? তোর চোকে জল কেন? তুই কাঁদ্‌ছিস্ নাকি?

সত্য সত্যই সনাতনের পত্নী ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া উঁহুঁহুঁ করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছিল। সনাতন অনেক কষ্ট করিয়া আপন প্রেয়সী গৃহিণীর শরীরের অনুরূপ কাপড়

যোগাইতেন, কিন্তু সেই কাপড়ে অতন্বঙ্গী রূপসীর বিশাল অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া তাহার আঁচলে আবার চক্ষুর জল মুছিতে কুলায় না! যাহা হউক কষ্টে চক্ষের জল অপনীত হইল, কিন্তু সে ফোয়ারা একবার ছুটিলে থামে না, কৈবর্ত্ত রমণী আবার উচ্চতর স্বরে উঁহুঁহুঁ করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

বিন্দু। বলি ও কি লো? কাঁদ্‌ছিস্ কেন্ লো? সনাতন ভাল আছে ত?

স-প। আছে বৈকি, সে মিন্‌ষের আবার কবে কি হয়? উঁহুঁহুঁ।

বিন্দু। তোর ছেলেটি ভাল আছে ত?

স-প। তা তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাছা ভাল আছে।

বিন্দু। তবে স্থধু স্থধু সকাল বেলা চখের জল ফেল্‌ছিস কেন? কি হয়েছে কি?

স-প। এই সকালে ঘোষেদের বাড়ী গিয়েছিনু গো তা সেখানে—উঁহুঁহুঁ।

বিন্দু। সেখানে কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে, কেউ গাল দিয়েছে?

স-প। না গাল দেবে কে গা দিদি? কারই কিছু খাই না কারই কিছু ধারি যে গাল দেবে। তেমন ঘর করিনি গো দিদি যে কেউ গাল দেবে। মিন্‌ষে পোড়ামুখো হোক্, হতভাগা হোক্, গতর খেটে খায়, আমাকে খেতে পরতে দিতে পারে, আমরা গরিব গুরবো নোক কিন্তু আপনাদের মানে আছি। গাল আবার কে দেবে গা দিদি?

বিন্দু কৃষকপত্নীর এই স্বামী ভক্তিসূচক এবং দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কে হাসিলেন, বলিলেন—

তা তাইত ব'ন জিজ্ঞাসা করছি, তবে তুই কাঁদ্‌ছিস কেন? সনাতন কিছু বলেছে নাকি?

রমণীর বিশাল কৃষ্ণ কলেবর একবার কম্পিত হইল, নয়ন দুইটী ঘূর্ণিত হইল, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে যে কথা গুলি উচ্চারিত হইল তাহার মধ্যে এই মাত্র বোধগম্য হইল—

ডেক্‌রা, পোড়ারমুখো, হতভাগা, সে আবার বল্‌বে! তার প্রাণের ভয় নেই? কোন্ মুখে বল্‌বে? তার ঘর করছে কে? সংসার চালিয়ে নিচ্ছে কে? আমি না থাক্‌লে সে কোন্ চুলোয় যেত? বলবে! প্রাণে ভয় নেই—ইত্যাদি।

বিন্দু আর একবার হাস্য সম্বরণ করিয়া একটু তীব্র স্বরে বলিলেন,—

তবে তুই সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেল্‌ছিস কেন বলতো? তোর হয়েছে কি?

স-প। দিদি কিছু নয়, কিছু হয় নি, তবে ঘোষেদের বাড়ী আজ সকালে শুনমু, উঁহুঁহুঁ।

বিন্দু। নে, তোর নেকাম করতে হয় কর ব'ন, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি, আমার বাসন কোসন সব মাজতে পড়ে রয়েছে, উনুন ধরাতে হবে, এখনই ছেলে দুটী উঠলেই দুদ চাইবে!

এইরূপ কথা হইতে হইতে সুধা প্রাতঃকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ঈষৎ রঞ্জিত বদনে, চক্ষু দুটী মুছিতে মুছিতে শয়ন ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু বলিলেন—

এই যে সুধা উঠেছে, এত সকালে যে?

সুধা। দিদি আজ খুব সকালেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখিলাম, সেজন্য ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বিন্দু। কি স্বপ্ন?

সুধা। বোধ হইল যেন আমরা ছেলেবেলার মত আবার শরৎ বাবুর বাড়ী পেয়ারা খেতে গিয়াছি। যেন তুমি পেড়ে পেড়ে খাচ্ছ, আর শরৎ বাবু আমাকে কোলে করিয়া পেয়ারা পাড়িয়া দিতেছেন, এমন সময় হটাৎ পা ফস্‌কে পড়ে গেলেন, আমিও পড়ে গেলাম। উঃ এমনি লেগেছে।

বিন্দু। সে কি লো! স্বপ্নে পড়িয়া গেলে কি লাগে?

সুধা। হ্যাঁ দিদি বোধ হল যেন বড় লেগেছে, শরৎ বাবু যেন গাছতলায় সেই গর্ত্তটাতে পড়ে গেলেন।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন,—আহা! এমন দুরবস্থা। আজ শরৎ বাবু এলে তাঁর পায়ে বেথা হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করিব এখন! পা টা ভেঙ্গে যায়নি ত?

সুধা। না দিদি ভেঙ্গে যায় নি।

বিন্দু। তুমি কেমন করে জানলে?

সুধা। আবার যে তখনই উঠিয়া আবার আমাকে নিয়া পেয়ারা পাড়িতে লাগিলেন।

বিন্দু উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, সাবাস ছেলে বাবু! আজ তাঁহাকে তাঁহার গুণের কথা বলিব এখন।

হাস্য সম্বরণ করিয়া পরে বলিলেন,—সুধা, কৈবর্ত্তদিদি তোমার জন্য আজ চিনিপাতা দৈ এনেছে, ভাতের সঙ্গে খাবে

এখন। দৈখানা শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে এসত ব'ন। আমি উনুন ধরাইগে, এখনই ছেলেরা উঠিবে।

বালিকা মাথার কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে দৈ লইয়া গেল, দৈ শিকের উপর তুলিয়া রাখিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে হাস্য বদনে ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। বিন্দুও রান্নাঘরের দিকে যাবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় কৈবর্ত্তপত্নী আর একবার চক্ষুর জল অপনয়ন করিয়া একবার গলা ঝাড়া দিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

বলি দিদিঠাকুরুণ কথাটা কি সত্তি ?

বিন্দু। কি কথা লো ?

স-প। ঐ যা শুনন্নু ?

বিন্দু। কি শুন্‌লি রে ?

স-প। তবে বুঝি সত্তি। আহা এত দিন পরে এই কি কপালে ছিল! আহা সুধাদিদির কচি মুখখানি একদিন না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়!—এবার অবারিত ক্রন্দনের রোল উঠিল, কৈবর্ত্ত সুন্দরী সেই বিশাল কৃষ্ণ শরীরখানি—যাহা সনাতন সভয়ে দৃষ্টি করিতেন ও সশঙ্কচিত্তে পূজা করিতেন,—সেই শরীরখানি ক্রন্দনের বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে হেমচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, ঈষৎ ভূমিকম্প তিনি বোধ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু কৈবর্ত্ত সুন্দরীর তারস্বর যখন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখন নিদ্রা আর অসম্ভব। তিনি শিঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, বাড়ীতে কাঁদছে কে গা ?

এই বলিয়া হেমচন্দ্র ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন।

বিন্দুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সকাল বেলা বাড়ীতে কাঁদছে কে গা?

বিন্দু। ও কেউ নয়, কৈবর্ত্তদিদি কি অমঙ্গলের কথা শুনে এসেছে তাই মনের দুঃখে কাঁদছে?

হেমচন্দ্র বলিলেন, কেও সনাতনের স্ত্রী, কেন কি হয়েছে গা, বাড়ীতে কোন অমঙ্গল হয় নি ত, কোন ব্যারাম স্যারাম হয়নি ত?

সনাতনের গৃহিণী বাবুকে দেখিয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া কাপড়খানি টানিয়া কষ্টে স্বষ্টে কোন রকমে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া টিপ্ করিয়া, প্রণাম করিয়া আবার গায়ে কাপড়টা ভাল করিয়া দিয়া আবার ঘোমটা একটু টানিয়া গলার সাড়া দিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া, আবার চক্ষুর জল মুছিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন,

না গো কিছু অমঙ্গল নয়, তবে একটা কথা শুনুনু তাহা দিদি ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করিতে এসেছি।

বিন্দু। আর সেই কথাটা কি আমি একদণ্ড থেকে বার করতে পারলুম না! তুমি পার ত কর।

হেম। মেয়ে মানুষদের কথা মেয়ে মানুষেই বুঝে, আমরা তত বুঝি না। আমি শরতের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসি। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হেম বাড়ীর বাহিরে গেলেন।

স-প। ঐ গো ঐ! তবে ত আমি যা শুনিয়াছি তাই ঠিক!

বিন্দু। বলি তোকে আজ কিছু পেয়েছে নাকি, তুই অমন কর্‌ছিস্ কেন, কি শুনেছিস বল না।

স-প। ঐ যে শরৎ বাবুদের বাড়ীতে আমি সকালে যা শুনমু!

বিন্দু। কি শুনলি।

স-প। তবে বলি দিদি ঠাক্রুণ, গরিবের কথায় রাগ করো না। সত্যি মিথ্যে জানি না, ঐ ঘোষেদের বাড়ী চাকর মিন্‌ষে আমাকে বল্লে, মিন্‌ষের মুখে আগুন, সেই অবধি আমার বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস করছে, দিদিঠাক্রুণ একবার হাত দিয়ে দেখ।

বিন্দু। আমার দেখবার সময় নেই আমি কাজে যাই, বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে ফিরিলেন।

তখন কৈবর্ত্তবধু বিন্দুর আঁচল ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল,

না দিদি রাগ করিও না, তোমাদের জন্য মনটা কেমন করে তাই এমু, না হলে কি অন্নের জন্যে আসতুম, তা নয়, আহা সুধাদিদিকে একদিন না দেখলে আমার মনটা কেমন—(বিন্দুর পুনরায় রান্নাঘরের দিকে পদক্ষেপ)—না না বলছিমু কি, বলি ঐ ঘোষেদের বাড়ীর হতভাগা চাকর মিন্‌ষে বল্লে কি,— তার মুখে আগুন, তার বেটার মুখে আগুন, তার বৌয়ের মুখে আগুন, তার বাড়ীতে ঘুঘু চরুক—(বিন্দুর রান্নাঘরের দিকে এক পদ অগ্রসর হওন)—না না বলছিমু কি, সেই মিন্‌ষে বল্লে কিঁ, উঃ এমন কথা কি মুখে আনে গা, এও কি হয় গা, তোমাদের শরীরে মায়া দয়াও ত আছে—(বিন্দুর রান্নাঘরের ভিতর গমন, সনাতন পত্নীর পশ্চাদ্গমন ও দ্বারদেশে উপবেশন)—না না বলছিমু কি, সেই হতভাগা চাকর মিন্‌ষে

বল্লে কি না, দিদিঠাকুরুণ তোমরা নাকি সকলে আমাদের ছেড়ে কলকেতায় চলে যাচ্ছ? আহা দিদিঠাকুরুণ তোমাকে ছেলে বেলায় মানুষ করেছি, তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না? সুধাদিদি আমাকে এত ভালবাসে, সে সুধাদিদিকে কোথায় নিয়ে যাবে গা?— রোদন।

বিন্দু একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—হেঁলা কৈবর্ত্তদিদি এই কথা বল্‌তে এই এতক্ষণ থেকে এমন করছিলি? তা কাঁদিস কেন ধ'ন, আমাদের যাওয়া কিছুই ঠিক হয় নাই, কেবল শরৎ বাবু কথায় কথায় কাল বলেছিলেন মাত্র। তা আমাদের কি যাওয়া হবে? সেখানে বিস্তর খরচ।

স-প। ছি! দিদি সেখানেও যায়। শুনেছি কলকেতায় গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত বিচার নেই, হিঁদু মুচুনমানে বিচার নেই,—সে দেশেও যায়। তোমাদের সোণার সংসারে এখানে বসে রাজ্জি কর। শরৎ বাবুর কি বল না, ওঁর মাগ নেই ছেলে নেই, উনি কালেজে পড়েন। দিদিঠাকুরুণ! কালেজের ছেলে সব করতে পারে। শুনেছি নাকি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেত যায়। ওমা! তারা ত জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দিতে পারে! হেঁ দিদি বিলেত কোথায়, সেই যে গঙ্গা সাগরের গল্প শুনি, তারও নাকি পার যেতে হয়। শুনেছি নাকি লঙ্কায় যেতে হয়।

বিন্দু। হেঁলো! কত সাগর পার হয়ে তবে বিলেত যায়। শুনেছি লঙ্কা পেরিয়েও অনেকদূর যায়।

স-প। ও বাবা, সে গঙ্গাসাগরের যে ঢেউ শুনেছি তাতে কি

আর মানুষ বাঁচে? তা নক্কা থেকে কি আর মানুষ ফিরে আসে তারা রাক্কস হয়ে আসে, শুনেছি তারা জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়। না বাবু, তোমাদের বিলেত গিয়েও কাজ নেই, কলকেতা গিয়েও কাজ নেই,—তোমরা ঘরের নক্ষী ঘরে থাক। তবে এখন আমি আসি দিদি।

বিন্দু দুদ জ্বাল দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন এস ব'ন।

স-প। আর দৈথানি কেমন হয়েছে খেয়ে বলিও। আর সুধাদিদি কি বলে বলিও।

বিন্দু। বলিব দিদি, বলিব।

সনাতন-গৃহিণী কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

আর দেখ দিদি, গরিবের কথাটা যেন মনে থাকে। কোথায় কলকেতায় যাবে? ঘরের নক্ষী ঘর আলো করে থেক।

বিন্দু। তা দেখা যাবে। আমাদের যাবার এখন কিছুই ঠিক নাই, যদি যাওয়া হয় তবে কয়েক মাসের জন্য, আবার ধান কাটার সময় আসিব। আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া, কোথায় থাকিব?

কৈবর্ত্ত-বধূ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেলেন। সনাতন অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া বিস্তীর্ণ শয্যায় পার্শ্বশায়িনী নাই দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল কি অদ্য প্রাতঃকালেই মুখনাড়া খাইতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছিল তাহা আমরা ঠিক জানি না।

কিন্তু সেই দুঃখ বা সুখ জগতের অধিকাংশ সুখ দুঃখের ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র, প্রথম সূর্য্যালোকে গৃহিণীর বিশাল ছায়া প্রাঙ্গনে পতিত হইল, গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সনাতন শিহরিয়া উঠিল।

সেই দিন দ্বিপ্রহর বেলার সময় বিন্দুর প্রতিবাসিনী হরিমতি নামে একটী বৃদ্ধা গোয়ালিনী ও তাহার বিধবা পুত্র-বধূ বিন্দুকে দেখিতে আসিল। হরিমতির পুত্র জীবিত থাকিতে তাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, কিছু জমা জমি ছিল, বাড়িতে অনেকগুলি গাভী ছিল, তাহার দুগ্ধ বেচিয়া সচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ হইত। পুত্রের মৃত্যুর পর হরিমতি শিশু পুত্রবধূকে লইয়া সে জমা জমি দেখিতে পারিল না, অন্য কাহাকে কোরফা জমা দিল, যাহা খাজনা পাইল সে অতি সামান্য। গরুগুলি একে একে বিক্রয় হইল; এক্ষণে দুই একটী আছে মাত্র, তাহার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া উদরপূর্ত্তি হয় না। শাশুড়ী ও পুত্রবধূ সর্ব্বদাই বিন্দুর বাড়ীতে আসিত ও বিন্দুর ছেলেদের ব্যারামের সময় যথা সাধ্য সংসারের কার্য্য করিয়া দিত। বিন্দুর এরূপ অবস্থা নহে যে তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, তথাপি বৎসরের ফসল পাইলে দরিদ্র প্রতিবাসিনীকে কিছু ধান্য পাঠাইয়া দিতেন, শীতের সময় দুই একখানি কাপড় কিনিয়া দিতেন, বৃদ্ধার অসুখ করিলে কখন সাবু, কখন মিশ্রি, কখন দুই একটী সামান্য ঔষধি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বৃদ্ধার তত্ত্ব লইতেন। দরিদ্রা এই সামান্য উপকারে এবং সকল বিপদ আপদেই বিন্দুর স্নেহের আশ্বাস বাক্যতে অতিশয় আপ্যায়িত হইত এবং বিন্দুকে বড়ই ভাল বাসিত। বিন্দু গ্রাম ছাড়িয়া কলি-

কাতায় যাইবে শুনিয়া আজ আসিয়া অনেক কান্না কাটি করিল। বিন্দু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া এবং তাহার পুত্রবধূকে একখানি পুরাতন সাড়ী দিয়া ঘরে পাঠাইলেন।

হরিমতি প্রস্থান করিলে তাঁতিদের একটী বৌ বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁতি বৌ দেখিতে কাল, তাহার স্বামী তাকে ভাল বাসিত না, এবং অতিশয় কাহিল, কায কর্ম্ম করিতে পারিত না, সেজন্য শাশুড়ীর নিকট সর্ব্বদাই গালি খাইত। গত শীতকালে তাহার পিঠে বেদনা হইয়াছিল, ঘাট থেকে জল আনিতে পারিত না, তজ্জন্য তাহার শাশুড়ী প্রহার করিয়াছিল। তাঁতি বৌ কাহার কাছে যাবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর কাছে আসিয়াছিল। বিন্দুর এমন অর্থ নাই যে তাঁতি বৌকে ঔষধি কিনিয়া দেন, তবে বাড়াতে কেরোসিনের তেল ছিল, প্রত্যহ তাঁতি বৌকে রোদে বসাইয়া নিজে মালিস করিয়া দিতেন। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বেদনা আরাম হইয়া গেল, সেই অবধি তাঁতি বৌ গৃহকার্য্যে অবসর পাইলেই বিন্দু মাকে দেখিতে আসিতে বড় ভাল বাসিত।

আমাদের লিখিতে লজ্জা করিতেছে, তাঁতি বৌ না যাইতে যাইতে বাউরী পাড়া হইতে হীরা বাউরিনী বিন্দুর নিকট আসিল। হীরার স্বামী পালকী বয়, বেশ রোজকার করে, কিন্তু যথাসর্ব্বস্ব মদ খাইয়া উড়াইয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ স্ত্রীকে প্রহার করিত। বিন্দু একদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়া হীরার স্বামীকে ডাকাইয়া বিশেষ তিরস্কার করিয়া দিলেন, সেই অবধি হেম বাবুর ভয়ে এবং বিন্দুর জেঠামহাশয়ের ভয়ে বাউরীর অত্যাচার কিছু কমিল, হীরাও প্রাণে বাঁচিল। আজ

হীরা আপন শিশুটীকে নূতন একখানি কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া বিন্দুর কাছে আনিয়া বলিল মাঠাকরুণ, এবার তোমার আশীর্ব্বাদে হাতে ২।৫ টাকা জমেছে, অনেক কাল ঘরের চালে খড় পড়েনি এবার চাল নূতন করে ছাওয়াইয়াছি, আর বাছার জন্যে কাটওয়া থেকে এই নূতন কাপড় কিনেছি। বিন্দু শিশুকে আশার্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন।

তাহার পর গ্রামের শশিঠাকুরুণ, বামা সদ্‌গোপনী, শ্যামা আগুরিনী, মহামায়া ধোপানী প্রভৃতি অনেকেই বিন্দুর কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে আসিল। আমরা তাহাদের বিন্দুর নিকট রাখিয়া এক্ষণে বিদায় লই। আমাদের অনেকেরই বিন্দু অপেক্ষা দুপয়সা অধিক আয় আছে; ভরসা করি আমরা যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব, আমাদের জন্যেও কেহ কেহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু শোক অনুভব করিবে। ভরসা করি যখন আমরা এ সংসার হইতে প্রস্থান করিব তখন যেন দুই একটী পরোপকারের পরিচয় দিয়া যাইতে পারিব, কেবল ঈর্ষা, পরনিন্দা, এবং পরের সর্ব্বনাশ দ্বারা "বড় লোক হইয়াছি" এই আখ্যানটি রাখিয়া যাইব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাল্যসহচরীগণ।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু জেঠাইমার বাড়ীতে গেলেন, এবং অনেক দিনের পর বাল্যসহচরী কালীতারা ও উমাতারাকে

দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিন জন বাল্যসহচরী এখন তিন সংসারের গৃহিণী হইয়াছেন, কিন্তু এখনও বাল্য-কালের সৌহৃদ্য একেবারে ভুলেন নাই, অনেক দিন পর তাঁহাদিগের পরস্পরে দেখা হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকালের কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা, সংসারের কথা, নিজ নিজ সুখ দুঃখের অনন্ত কথা কহিয়া সন্ধ্যাকাল যাপন করিলেন।

কালীতারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বিন্দু অপেক্ষাও কালো ছিলেন, কিন্তু তথাপি এককালে তাঁহার মুখে লাবণ্য ছিল, এখনও সেই শান্ত শুষ্ক বদনে ও নয়ন-দ্বয়ে একটু কমনীয়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে মুখখানি বড় শুষ্ক, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, কণ্ঠার হাড় দেখা যাইতেছে, শীর্ণ হস্তে দুইগাছি ফাঁপা বালা আছে, কণ্ঠে একটী মাদুলি। তাঁহার বস্ত্র খানি সামান্য, সম্মুখের চুল অনেক উঠিয়া গিয়াছে, মাথায় ছোট একটী খোঁপা। কালীতারা বাল্যকালে একটু হাবা মেয়ে ছিল, এখনও অতিশয় সরলা, শ্বশুর বাড়ীর কায কর্ম্ম করেন, দুইবেলা দুইপেট খান, কেহ কিছু বলিলে চুপ করিয়া থাকেন।

বিন্দু বলিলেন, কালী, আজ কত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হইল, তোমাকে কি আর হটাৎ চেনা যায়?

কালী। বিন্দুদিদি, আমাদের দেখা হবে কেথা থেকে, বিয়ে হয়ে অবধি প্রায় আমি বর্দ্ধমানে থাকি, বাপের বাড়ী কি আর আসতে পাই?

উমা। কেন কালীদিদি, তুমি মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী আস না কেন? এই আমি ত প্রতিবার পূজার সময় আসি।

কালী। তা তোমাদের কি বল বন, তোমাদের ঢের লোকজন আছে, কায কর্ম্মের ঝনঝট নেই, পাল্কী করে চলে এলেই হল। আমাদের ত তা নয়, বৃহৎ সংসার, অনেক কায কর্ম্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর তাতে চাকর দাসী রাখা প্রথা নেই। সুতরাং আমরা কেউ আসিলে কায চল্‌বে কেমন করে বল? এই এবার এসেছি, আমার এক বড় ননদ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাযগুলি করিতে বলে এসেছি। তা দু পাঁচ দিন সে করবে, বরাবর কি আর করে?

বিন্দু। তোমাদের জমিদারীর শুনেছি অনেক আয়, তোমার স্বামীর অনেক গাড়ী ঘোড়া আছে, তা বাড়ীতে চাকর দাসী রাখেন না কেন?

কালী। না দিদি আয় জেয়দা নাই, খরচ শুনেছি বিস্তর হয়, ধারও কিছু হয়েছে শুনেছি,—তা আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, ওসব কথা ঠিক জানিনা। আমাদের একখানা বাগান বাড়ী আছে, বাবু সেইখানে থাকেন, তাঁর শরীরও অসুস্থ, বাড়ীতে প্রায় আসেন না, তা কায কর্ম্মের কি জান্‌বেন? আমার শাশুড়ীরাই কায কর্ম্ম দেখেন শুনেন। ঝি রাখবেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকেদের কি ছুঁতে আছে? সুতরাং বৌদের সব করিতে হয়

বিন্দু। তা তোমাদের ধার টার হয়েছে বন্, তা খরচ একটু কমাও না কেন? শুনেছি তোমার স্বামী অনেক খরচ করে সাহেবদের খানা টানা দেন, অনেক গাড়ী ঘোড়া রাখেন,—তা এসব গুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আয় তেমনি ব্যয় করতে বলতে পার না?

কালী। ওমা! তাঁকে কি আমি সে কথা বলিতে পারি? তিনি বিষয় কর্ম্ম বুঝেন, আমি বৌ মানুষ হয়ে কোন্ লজ্জায় তাঁকে এ কথা বলবো গা? তবে কখন কখন যখন আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন, আমার খুড়শাশুড়ীরা তাঁকে ঐ রকম কথা দুই একবার বলেছিলেন শুনেছি।

বিন্দু। তা তিনি কি বলেন?

কালী। বলেন, আমাদের ভারি বংশ, দেশে কুলের যেমন মর্য্যাদা, সাহেবদের কাছে বনিয়াদি বড়মানুষ বংশ বলিয়া তেমনি মর্য্যাদা, তা সাহেবদের খানা টানা না দিলে কি হয়? শুনেছি সাহেবরাও তাঁকে বড় ভাল বাসেন, এই যে কত "কমিটী" বলে না কি বলে, বর্দ্ধমানে যত আছে, বাবু সবেতেই আছেন। আর এই রোগা শরীর তবু গাড়ী করে প্রত্যহ সাহেবদের বাড়ী দুবেলা যাওয়া আসা আছে, সাহেব মহলে নাকি তাঁর ভারি মান।

সরলস্বভাব কালীতারার এই স্বামী-গৌরব বর্ণনা শুনিয়া বিন্দু একটু হাসিলেন, অভিমানিনী উমা একটু ঈর্ষায় ভ্রূকুটী করিলেন।

বিন্দু। আচ্ছা কালী, তোমাদের বাড়ীর মধ্যে এখন গিন্নী কে?

কালী। আমার শাশুড়ী ত নাই, সুতরাং আমার তিনজন খুড়শাশুড়ীরাই গিন্নী। বড় যে সে ভাল মানুষ, প্রায় কোনও কথায় থাকে না, মেজই কিছু রাগী, সকলেই তাকে ভয় করে, বৌরা ত দেখ্‌লে কাঁপে। আহা সে দিন আমার খুড়তুতো ছোট জা রান্নাঘর থেকে কড়া করে দুদ আনতে পড়ে

গিয়েছিল, গরম দুধে তার গায়ের ছাল চামড়া পুড়ে গিয়েছে। তাতে তার যত কষ্ট না হয়েছিল, শাশুড়ীর ভয়ে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার মেজ খুড়শাশুড়ী ঘাট থেকে নেয়ে এসে যেই শুনলে যে দুধ অপচয় হয়েছে, অমনি মুড়ো খেঙরা নিয়ে তেড়ে এসেছিল, আহা এমনি বকুনি বক্‌লে বাপ মা তুলে এমনি গাল দিলে, আমার ছোট জা চোকের জলে নাকের জলে হল। আহা কচি মেয়ে, দশ বছর মাত্র বয়স, ভয়ে তিন দিন ভাল করে ভাত খেতে পারে নি।

উমা। তা তোমাকেও অমনি করে বকে?

কালী। তা বক্‌বে না, দোষ করলেই বক্‌বে, তা না হলে কি সংসার চলে?

উমা। তোমাকে যখন বকে তুমি কি কর?

কালী। চুপ করে কাঁদি, আর কি করিব বল?

অভিমানিনী উমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত তা পারিনি বাবু, কথা আমার গায়ে সহ্য হয় না।"

কালী। তা হ্যাঁ বিন্দুদিদি শ্বশুর বাড়ীতে কেউ গাল দিলে আর কি করবে বল? একটা কথার জবাব দিলে, আর পাঁচটা কথা শুন্‌তে হয়। তা কায কি বাবু, শাশুড়ীই হউক আর ননদই হউক, কেউ দুট কথা বলিলে চুপ করে থাকি, আবার তখনই ভুলে যাই। কথা ত আর গায়ে ফোটে না, কি বল বিন্দুদিদি?

বিন্দু। তা বেস কর বন্, কথা বরদাস্ত করিতে পারলেই ভাল, তবে সকলের কি আর বরদাস্ত হয়, তা নয়। আচ্ছা তোমার ছোট খুড়শাশুড়ীও শুনিছি নাকি রাগী।

কালী। হ্যাঁ রাগী বটে, তা মেজোর সঙ্গে ত আর পারে না, রাগ করে দু একটা কথা বলে আপনার ঘরের ভিতর খিল দিয়া থাকে, মেজো এক কথায় পঁচিশ কথা শুনিয়ে দেয়। আবার মেজোর কিছু টাকা আছে কি না, সে ছেলেদের ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়, ছেলেদের শিখিয়ে দেয় ছোটর ঘরে বোসে খেগে যা। তারা ছোটর ঘরে বসে খায়, ছোটর ছেলেরা খেতে পায় না, ফেল ফেল করে চেয়ে থাকে। আবার ছোটর খাবার ঘরের পাশেই এবার একটা নর্দ্দমা তয়ের করেছে। ছোট কত ঝগড়া করলে, আমার ছোট দেওর আপনি বাবুর কাছে নালিশ করতে গেলেন, বাবুও নিজে এক দিন বাড়ী আসিয়া তাঁর মেজ খুড়ীকে বুঝাইতে গেলেন, তা সে কথা কি সে শুনে? মেজোর বকুনি শুনে বাবু ফের গাড়ী করে বাগানে পালিয়া গেলেন, মেজো আপনি দাঁড়িয়ে মজুরদের দিয়ে সেই নর্দ্দামাটী করালেন তবে সেদিন রাত্রিতে জল গ্রহণ করলেন।

উমা। সাবাস মেয়ে যা হউক।

কালী। বলবো কি উমা, বাড়ীতে যে ঝগড়া কোঁদল হয়, তাতে ভূত ছেড়ে পালায়। তবে আমাদের সয়ে গিয়েছে, গায়ে লাগে না। আর আমি কারো কথায় নেই, যে যা বলে চুপ করে থাকি, আবার ভুলে যাই, আমার কি বল?

বিন্দু। কালী, তোমার খুড়শাশুড়ীরা ত সব বিধবা। তাদের বয়স কত হয়েছে?

কালী। বয়স বড় যেয়াদা নয়, বাবুর বয়সে আর আমার বড় খুড়শাশুড়ীর বয়স এক, মেজ আর ছোট বাবুর চেয়ে

বয়সে ৫।৭ বছরের ছোট। আমার শ্বশুর বাপের বড় ছেলে ছিলেন, তিনি আজ যদি থাকতেন তার ৭০ বৎসর বয়স হত। তা তিনি হবার পর প্রায় ১৫।১৬ বৎসর আর কেউ হয় নাই, তার পর তাঁর তিনটী ভাই হয়। তাই আমার শাশুড়ীর যখন প্রায় ৩০ বৎসর বয়স, তখন আমার খুড়শাশুড়ীরা ছোট ছোট বৌ ছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে। তারই দুই এক বছর পর বাবুর প্রথম বিয়ে হয়।

উমা। আর কালীদিদি, তোমার পিশ্শাশুড়ীও ঐ বাড়ীতেই থাকে না?

কালী। হ্যাঁ থাকে বৈকি; দুই পিশ্শাশুড়ী, আর একজন মাশ্শাশুড়ী আছেন; তাঁরা তিনজনই বিধবা, তাঁদের ছেলে, মেয়ে, বৌ, নাতি সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকে। আর একজন মামীশাশুড়ীও আছেন, তিনি সধবা কিন্তু তাঁর স্বামী পূর্ব দেশে পদ্মাপারে চাকরী করিতে গিয়েছিল, সেখানে নাকি আর একটা বিয়ে করেছে না কি করেছে, তের বছর বাড়ী আসে নি, বাড়ীতে টাকাও পাঠায় না, সুতরাং মামী দুই ছেলেকে নিয়ে ঐখানেই আছেন, এই বাড়ীতেই সে ছেলেদের বিয়ে হয়, আজ তিন চার বছর হল।

উমা। সে ছেলে দুটী কেমন, লেখাপড়া শিখেছে?

কালী। ছোট ছেলেটী ভাল, ইস্কুলে লেখাপড়া করে, বড়টা লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে গিয়েছে। বাবু সাহেবদের বোলে তাকে কি কায করে দিয়াছিলেন, তা সে আবার কতকগুলা টাকা নিয়ে পালায়। সবাই বলিল ছেলেটাকে সাহেবেরা জেলে দেবে, কিন্তু বাবু সাহেবদের অনেক বলে কয়ে ঘর থেকে

লোকসান পুরণ করিয়া ছেলেটাকে রক্ষা করেন। ছেলেটা বাড়ী থাকে না, রোজ মদ খায়, যখন বাড়ী আসে পয়সার জন্য বৌকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেয়, বৌয়ের কান্না শুনে আমাদেরও কান্না পায়। তা বৌ পয়সা কোথা থেকে পাবে, দুই একখানা গয়না টয়না বাঁধা রেখে দেয়, তা না হলে কি তার প্রাণ থাকিত।

উমা। উঃ তবে তোমাদের মস্ত সংসার।

কালী। তাইত বল্‌ছিলাম উমা, তোমরা বড় মানুষের ঘরের বৌ, তিনটী জাঁ তিনটী ঘরে থাক, শাশুড়ী রান্না বান্না দেখেন, তোমরা কাযের ঝন্‌ঝট কি বুঝ্‌বে বল? তোমার দেওর দুজন ত গ্রামেই আছেন, তোমার স্বামী না কলকেতায় গিয়েছেন?

উমা। হাঁ তিনি এক বৎসর হইতে কলকেতায় আছেন, আমাকেও কলকেতায় নিতে যাবার জন্য তাঁর মার কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও বলেছেন এই জৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে পাঠিয়ে দিবেন।

কালী। হেঁ শরৎ বল্‌ছিল তোমার স্বামী নাকি কোন্ বড় রাস্তার উপর মস্ত বাড়ী নিয়েছেন, অনেক টাকা খরচ করিয়া সাজাইয়াছেন; তাঁর নাকি সুন্দর সাদা ঘোড়ার এক জুড়ি আর কালা ঘোড়ার এক জুড়ি আছে, তেমন গাড়ী ঘোড়া রাজা রাজড়াদেরও নাই। আবার নাকি কলকেতার বাহিরে বড় বাগান কিনিবার কথা চলিতেছে, সেই বাগানও নাকি ইন্দ্রপুরী, তেমন ফল, তেমন ফুল, তেমন পুকুর, তেমন মার্ব্বেলের মেজেওয়ালা ঘর কলকেতায়ও কম আছে। উমা তুমি বড় সুখে থাকিবে।

উমার বিশ্ববিনিন্দিত সুন্দর সূক্ষ্ম ওষ্ঠে একটু হাস্য কণা দেখা গেল, উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে যেন একটু ম্লান ছায়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, কালীদিদি, যদি সাদা জুড়ি কাল জুড়ি আর মার্ব্বেলের ঘর হইলে সুখ হয় তাহা হইলে আমি সুখী হইব, কিন্তু কপালের কথা কে বলিতে পারে? সূক্ষ্মদর্শী বিন্দু দেখিলেন উমা ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ক্ষণেক সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পর উমা আবার বলিলেন, বিন্দুদিদি! আমাদের ছেলে বেলা এই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল মনে পড়ে, সে আমাদের হাত দেখিয়াছিল মনে পড়ে?

বিন্দু। কৈ মনে পড়ে না।

উমা। সে কি দিদি, তুমি আমার চেয়ে বড় তোমার মনে পড়ে না? কালীদিদির বোধ হয় মনে পড়ে!

কালী। কৈ না, আমারও মনে নাই।

উমা। তবে বুঝি সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল তাই আমার মনে আছে। ঠিক বারি বৎসর হইল, এই বৈশাখ মাসে একদিন এমনি সন্ধ্যার সময় এই খানে খেলা করছিলাম, একটু একটু অন্ধকার হয়েছে, আর একটু একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন জটাধারী সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলটার ভিতর হইতে বাহির হয়ে এল। আমরা ভয়ে কাঁপতে লাগলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীটী কাছে আসিয়া বলিল, ভয় নেই তোমরা পয়সা নিয়ে এস, আমি তোমাদের হাত দেখ্‌ব। আমি মার কাছে সেই দিন ৪টা পয়সা পেয়েছিলাম ভয়ে তা সন্ন্যাসীকে

দিলাম। তখন সন্ন্যাসী খুসি হয়ে হাত দেখিয়া বলিল মা তুমি বড় ধনবানের পত্নী হবে গো, তুমি কিছু ভেবোনা। তখন কালীও হাত দেখাইবার জন্য বাড়ী থেকে একটা পয়সা এনে দিলে, সন্ন্যাসী সেটী নিয়ে বলিল তোমার ধন টন হবে না, ভাল বংশের বউ হবে।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, আর জটাধারী মহাশয় আমার কি ব্যবস্থা করিলেন।

উমা। তাই বলছি। তোমার মা ঘাটে গিয়াছিলেন, এবং তাঁর কাছে পয়সা টয়সা বড় থাকিত না, সুতরাং তুমি সুধু হাতে হাত দেখাতে এলে। সন্ন্যাসী বলিল মা তোমার ধনও নেই বংশও নেই, গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়ে গরিবের ভাত খাবে। এই বলিয়া সব পয়সাগুলি তোমার হাতে দিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, তা বেশ ব্যবস্থা করেছিল ত। এখন আমার মনে পড়েছে,—গ্রামের লোকে সন্ন্যাসীটাকে রমাপ্রসাদ সরস্বতী বলিত।

উমা। হাঁ, হাঁ, সেই সরস্বতী ঠাকুর। তোমার মা পুখুর হইতে জল আনিয়া জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। তখন আঁচল দিয়ে তোমার চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন তা হোক্ বাছা বেঁচে থাক্ যে থা হউক, চির এইস্ত্রী হয়ে থাকিস, যেন গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়েই সুখে থাকিস। বাছা ধন কুলে সুখ হয় না, ধন কুলে তোর কায নেই। বিন্দুদিদি, সেই কথাটা আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হইলেই যদি সুখ হইত তবে পৃথিবীতে আর অভাব থাকিত না।"

বিন্দু। ও কি ও উমা, তুমি ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে করে চখের জল ফেল্‌ছ কেন? তোমার আবার সুখের অভাব কিসে উমা? তুমি যদি ভাবিবে, তবে আমরা কি করিব।

উমা। না দিদি আমার কষ্ট কিছুই নাই, আমার কষ্ট আছে বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি না। কিন্তু জানিনা কেন এই কলিকাতায় যাইব বলিয়া কয়েক দিন হইতে মনে অনেক সময় অনেকরূপ ভাবনা উদয় হয়। ভবিষ্যতের কথা ভগবান্‌ই জানেন। তা বিন্দুদিদি, তুমিও কলিকাতায় যাইতেছ, আর কালীদিদি বর্দ্ধমানে আছেন সেও কলিকাতা হইতে শুনিয়াছি ৩।৪ ঘণ্টার পথ; আমরা ছেলেবেলা যেমন তিন বনের মত ছিলাম যেন চিরকাল সেইরূপ থাকি, আপদ বিপদের সময় যেন পরস্পরকে ভগ্নীর মত জ্ঞান করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করি।

উমার সহসা মনের বিকার দেখিয়া বিন্দু ও কালীর মনও একটু বিচলিত হইল, তাঁহারা অাঁচল দিয়া উমার চক্ষের জল মোচন করিলেন, এবং অনেক সান্ত্বনা করিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আগমন।

ইহার কয়েক দিন পর হেমচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন বিন্দু আপন পরিচিত গ্রামের সকল আত্মীয়া কুটুম্বিনী ও বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

বিদায় লইয়া আসিলেন। তালপুখুরে সেদিন অনেক অশ্রুজল বহিল।

যাইবার দিন অতি প্রত্যূষে বিন্দু আর একবার জেঠাইমার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। বিন্দুর জেঠাইমা বিন্দুকে সত্যই স্নেহ করিতেন, বিন্দুর গমনে প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনেক কান্নাকাটি করিলেন, বলিলেন,—

বাছা তোরা আমার পেটের ছেলের মত, আমার উমাও যে বিন্দু সুধাও সে, আহা তোদের হাতে করে মানুষ করেছি, তোদের ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠে। তা যা বাছা যা, ভগবান্ করুন, হেমের কলিকাতায় একটী চাকরী হউক, তোরা বেঁচেবর্ত্তে সুখে থাক শুনেও প্রাণটা জুড়বে। বাছা উমা শ্বশুরবাড়ী গেছে তাকেও নাকি কলিকাতায় নিয়ে যাবে, এই জৈষ্ঠমাসে নিয়ে যাবে বলে আমার জামাই পিড়াপিড়ি করছে। সে নাকি শুন্‌লাম কলিকাতায় নতুন বাড়ী কিনেছে, বাগান কিনেছে, গাড়ী ঘোড়া কিনেছে, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শরৎ সে দিন বল্‌ছিল তেমন গাড়ী ঘোড়া সহরে নাই। তা ধনপুরের জমিদারের ঝাড়, হবে না কেন বল? অমন টাকা, অমন বড়মানুষী চালচোল ত আর কোথাও নেই। ঐ ওমাসে আমি একবার বেনের বাড়ী গিয়েছিলাম, বুঝলে কিনা, তা এই নীচে থেকে আর তেতলা পর্য্যন্ত সব বেলওয়ারীর ঝাড় টাঙ্গিয়েছে। আর লোক জন, জিনিষ পত্র, সে আর কি বল্‌ব। সে দিন প্রায় পঞ্চাশজন মেয়ে খাইয়াছিল, বুঝলে কি না, তা সবাইকে রূপার থাল, রূপার রেকাবী, রূপার গেলাস, রূপার বাটী দিয়াছিল! আর আমার বেনের কুথাবাত্রাই বা কেমন। তারা

ভারি বড় মানুষ, তাদের রীতিই আলাদা। এই আমার জামাইও শুনেছি নতুন বাড়ী করে খুব সাজিয়েছে, ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়াল-গিরি, গাল্‌চে, মকমলের চাদর, বুঝলে কিনা, আর কত সোণা, রূপা, সাদা পাথরের সামগ্রী, তার গোণাগুন্তি করা যায় না। তা তোমরা চোখে দেখ্‌বে বাছা, আমি চোখে দেখিনি, তবে কলিকাতা থেকে একজন লোক এসেছিল সেই বল্লে যে * * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক, আমার উমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, দুটি বোনের মত থেক। আহা বাছা তোদের নিয়েই আমার ঘরকন্না, তোদের না দেখে কেমন করে থাক্‌ব। (রোদন) তা যা বাছা, বাছা উমাও শীঘ্র যাবে, তার সঙ্গে দেখা করিস, না হয় তাদের বাড়ীতে গিয়েই দিন কত রইলি। তাদের ত এমন বাড়ী নয়, শুনেছি সে মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর দরজা, বুঝলে কি না * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া জেঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া বিন্দু একবার শরতের মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। শরৎ কলিকাতায় যাইয়া অবধি তাঁহার মাতা প্রায় একাকী বাড়ীতে থাকিতেন, শরৎ অনেক বলিয়া কহিয়া একটী ঝি রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বামনী রাখিবার কথায় শরতের মাতা কোনও প্রকারে সম্মত হইলেন না। বাড়ীটী প্রশস্ত বাহির বাটিতে একটী পাকা ঘর ছিল, শরৎ কলিকাতা হইতে আসিলে সেই খানেই আপনার পুস্তকাদি রাখিতেন ও পড়াশুনা করিতেন। বাড়ীর ভিতরও দুই তিনটী পাকা ঘর

ছিল আর একটী খোড়ো রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে একটী মধ্যমাকৃতি পুখুর, শরৎ তাহা প্রতিবৎসর পরিষ্কার করাইতেন।

শরতের মাতা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণ ছিলেন, বিশেষ স্বামীর মৃত্যুর পর আর শরীরের যত্ন লইতেন না, সুতরাং আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। কি শীতে কি গ্রীষ্মে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিতেন, এবং একখানি নামাবলি ভিন্ন অন্য উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন না। স্নান সমাপনান্তর প্রত্যহ প্রায় এক প্রহর ধরিয়া আহ্নিক করিতেন, তাহার পর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। স্বামীর মৃত্যুতে, ও কালীতারার কষ্টের চিন্তায় বিধবার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল এবং মাথার চুল অনেকগুলি শুক্ল হইয়াছিল, এবং অকালে বার্দ্ধক্যের দুর্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্ত দিন দেব আরাধনায় ও পারমার্থিক চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন, এবং কালে বাছা শরৎ একজন বিদ্বান্ ও মাননীয় লোক হইবেন, কেবল সেই আশায় জীবনের গ্রন্থি এখনও শিথিল হয় নাই।

হেমচন্দ্র ও বিন্দু ও সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, যাও বাছা, ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমরা মানুষ হও, বাছা শরৎ মানুষ হউক, এইটী চক্ষে দেখিয়া যাই, আমার এ বয়সে আর কোনও বাঞ্ছা নাই। দেখিস বাছা শরৎ, এদের খাওয়া দাওয়ার কোনও কষ্ট না হয়, বিন্দুর দুটী ছেলের যেন কোনও কষ্ট না হয়, বাছা সুধা কচি মেয়ে, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।

সুধার কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর

করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধা বৈধব্য যন্ত্রণা জানিতেন, এই জ্ঞানশূন্য অল্পবয়স্কা বালিকাকে ভগবান্ কেন সে যন্ত্রণা দিলেন ?

অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর শরতের মাতা বিন্দু ও সুধাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, হেমকে কলিকাতায় যাইয়া অতি সাবধানে থাকিতে বলিলেন, শরৎকে মনোযোগ পূর্ব্বক লেখা পড়া করিতে বলিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা সকলকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলে বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় লইলেন। শরৎও মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মা, তোমার কথা গুলি আমি মনে রাখিব, যত্নে পালন করিব, যে দিন তোমার কথার অবাধ্য হইব সে দিন যেন আমার জীবন শেষ হয়।

সকলে চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা সজলনয়নে অনেকক্ষণ অবধি সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, শেষে শূন্যহৃদয়ে সে পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেম বাটী আসিয়া দেখিলেন সনাতন কৈবর্ত্ত আসিয়াছে। বিন্দু গ্রাম হইতে যাইবার পূর্ব্বে আপন জমিখানি তাহাকে ভাগে দিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ সনাতন সজল নয়নে বাবুকে আর একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সনাতনের সঙ্গে সনাতনের পত্নীও আসিয়াছিল, সে আর একখানি চিনিপাতা দৈ আনিয়াছিল। বিন্দু অনেক বারণ করিল, কিন্তু কৈবর্ত্ত-পত্নী তাহা শুনিল না, বলিল, গাড়ীতে যদি জায়গা না হয় আমি হাতে করে বর্দ্ধমান ষ্টেশন পর্য্যন্ত দিয়া আসিব। সুতরাং সুধা গাড়ীতে চাপিয়া সেই দৈ কোলে করিয়া লইল। গাড়ীর ভিতর বিন্দু ও সুধা দুই

ছেলেকে নিয়া উঠিলেন, শরৎ ও হেম হাঁটিয়া যাইতেই পছন্দ করিলেন। গরুর গাড়ী বড় আস্তে আস্তে যায়, প্রাতঃকালে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও বেলা দুই প্রহরের সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছিল।

ষ্টেশনের নিকট একটী দোকানে গিয়া সকলে উঠিলেন, এবং তথায় রাঁধা বাড়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাওয়া দাওয়া করিয়া লইলেন। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনের কাছে বড় সুন্দর খাজা ও সীতাভোগ পাওয়া যায়, শরৎ বাবু তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহা দিয়া সুধা শেষবার তালপুখুরের চিনিপাতা দৈ খাইয়া লইলেন।

বেলা দুইটার পর গাড়ী ছাড়ে, দুইটা না বাজিতে বাজিতে ষ্টেশন লোকে পূর্ণ হইল। হেম অনেক দিন রেলওয়ে ষ্টেশনে আসেন নাই, অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত সেই লোকের সমাগম দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রকার লোক ষ্টেশনে জড় হইতেছে, দেখিয়া হেমের মনে একটী অচিন্তনীয় ভাব উদয় হইল। দূর মাড়ওয়ার ও বিকানীর প্রদেশ হইতে বড় বড় গাঁঠরি লইয়া বণিকগণ কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে আসিতেছে; ইহারাই ভারতবর্ষের প্রকৃত বণিক্‌সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই অল্প-ব্যয়ী, বহুকষ্টসহ, বহুপথগামী, কঠোরজীবী জাতির সমাগম ও বাণিজ্য আছে। আরা প্রভৃতি জেলা হইতে সবলশরীর বহুশ্রমী কিন্তু দরিদ্র বিহারীগণ চাকুরীর জন্য কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছে। কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ হইতে বাঙ্গালী যাত্রী পুত্র বন্ধুদিগের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন;

বাঙ্গালী নারী সহজে দুর্ব্বলা ও গৃহপ্রিয়, তীর্থ করাই তাঁহাদিগের দেশ ভ্রমণের একমাত্র উপায়, তীর্থ করিবার জন্য তাঁহারা কষ্ট তুচ্ছ করিয়া মথুরা বৃন্দাবন ও পুষ্কর তীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। বালকগণ ছুটীর পর পুনরায় কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে, যুবকগণ নানা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য বা উচ্চাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহানগরীর দিকে আসিতেছেন। আশা তাহাদিগের সম্মুখে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, যুবকগণ সেহ কুহুকে ভুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ বিদেশ হইতে চাকরী করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, অনেকদিন পর পুত্রকলত্রের মুখ দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। কেহবা প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কেহ বা মুমূর্ষু আত্মীয় বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্য, কেহ ধন, মান, পদ বা যশোলিপ্সায়, কেহ বা জীবনের সায়হ্নে কেবল গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য, সকলেই নানা উদ্দেশ্যে এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই রাজধানী কর্ম্মদেবীর একটী প্রধান মন্দির, হেমচন্দ্র সেই মন্দির আগমন পথে অসংখ্য যাত্রী দেখিতে লাগিলেন।

দুইটার পর গাড়ী ছাড়িল, পাঁচটার পর গাড়ী কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিল। শরৎ একখানি গাড়ী করিলেন, এবং সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া ভবানীপুর শরতের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হুগলীর পোলের উপর হইতে বিন্দু বিশাল গঙ্গাবক্ষে গৃহতুল্য অসংখ্য অর্ণবপোত ও তাহার মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া,

বিস্মিত হইলেন, এবং অপর পার্শ্বে কলিকাতার ঘাট ও হর্ম্ম্যাদি দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গাড়ী বড়বাজার ও চিনাবাজারের ভিতর দিয়া চলিল, তথায় শরতের কিছু কাপড় চোপড় কিনিতে ছিল, তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল। বিন্দু ও সুধা কখনও তাল পুখুর হইতে বাহিরে যান নাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রধান জনাকীর্ণ স্থান দেখিয়া তাঁহারা অধিকতর বিস্মিত হইলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান, কোন কোন স্থানে সরু সরু গলীর উভয় পার্শ্বে দ্বিতল বা তিনতল দোকানে পথ প্রায় অন্ধকার করিয়াছে। কতদেশের কত প্রকার বস্ত্রাদি রাশি রাশি হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, বিলাতি থান, দেশী কাপড়, বারাণসী সাটী, ঢাকার কাপড়, মসলীপত্তনের ছিট, ফ্রান্সের সাটীন বস্ত্রাদি, ইউ-রোপের নানা স্থানের গালিচা, চাদর, ছিট, পরদা ও সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাপড়। মণিমুক্তার দোকানে মণিমুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে, খেলানার দোকানে রাশি রাশি খেলানা, সারি সারি খাবারের দোকানে এখনও মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে, পুস্তকের দোকানে পুস্তকশ্রেণী। শিল্, যাহা এক খানি কিনিলে গৃহস্থের তিনপুরুষ যায়, তাহাই বিন্দু রাশি রাশি দেখিলেন, লোহার কড়া, বেড়ী, ঝাঁঝরি প্রভৃতি দ্রব্যতে দোকান পরিপূর্ণ, পিত্তল ও কাঁসার দ্রব্যে কোথাও চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাই-তেছে। কাঁচের দোকানে ঝাড়, লণ্ঠন, পাত্র, গেলাস, খেলানা, লেম্প প্রভৃতি সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে, কাষ্ঠদ্রব্যের দোকানে ছুতারগণ দ্রব্যাদি পালিস করিতেছে, ছবির দোকানে কড়িকাট ও দেয়াল ছবিপূর্ণ, বাক্সের দোকানে কাঠের বাক্স, টিনের বাক্স, চামড়ার বাক্স, লোহার বাক্স, কত প্রকার দোকানে

বিন্দু ও সুধা কত প্রকার দ্রব্য দেখিলেন তাহা সংখ্যা করিতে পারিলেন না। লোক জনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ি চলিতে পারে না, মনুষ্যের ভিড়ে মনুষ্য অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পায় না, চারি দিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ, খরিদ্দারদিগের কথা, বিক্রেতাদিগের চিৎকার ধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একি বিশাল মনুষ্য সমুদ্র! এত লোক কি করে, কোথা হইতে আইসে, এত দ্রব্য কে ক্রয় করে, কোথায় চলিয়া যায়। অদ্য তালপুখুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মনুষ্য সমুদ্রে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহানগরীর কোনও নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান পাইবেন?

সন্ধ্যার সময় বিন্দুর গাড়ী চিনাবাজার হইতে বাহির হইয়া লালদিঘির নিকট গিয়া পড়িল, তথায় যাইবার সময় তিনি প্রাসাদতুল্য ইংরাজি দোকান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই সকল দোকান কাপড়ওয়ালার দোকান বা জুতাওয়ালার দোকান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা এক্ষণে ভারত-সমাজের নিম্নস্তর, জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাই ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ, ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের প্রধান হেতু!

বিস্মিত নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ী দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, ইন্দ্রপুরী তুল্য চৌরঙ্গিতে দীপালোক প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, এখন মর্ত্ত্যে যাঁহারা দেবত্ব করিতেছেন, তাঁহারা বেরুশ, ফেটন বা লেণ্ডলেট করিয়া ইডেন গার্ডেনে সমাগত হইতেছেন। ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে, এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞান-

ক্ষমতার অধীন হইয়া নর নারীর রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে! ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তালপুখুরনিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দিনের পরিশ্রম বশতঃ সুধা হেমের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, ছোট সুপ্ত শিশুটাকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। শরৎ বড় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সুধার মস্তকটা ধারণ করিয়া নিস্তব্ধে পথ ও হর্ম্ম্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমের অন্তঃকরণে চিন্তা আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? ভবিষ্যতে কি আছে? শান্ত নিস্তব্ধ তালপুখুর ত্যাগ করিয়া তিনি অদ্য এই মহানগরীতে আসিলেন, এই সদাচঞ্চল মনুষ্য সমুদ্রের কোনও নিভৃত কন্দরে কি তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান আছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বড় বাজার।

বিন্দু। ও সুধা, একবার এদিকে এসত বন।

সুধা। কি দিদি, আমাকে ডাক্‌ছ?

বিন্দু। হেঁ বন, ঐ কাপড় কখানা কেচে রেখেছি, ছাদের উপর শুখাতে দাও ত। আমি কুয়ো থেকে দু কলসী জল তুলে

শীঘ্র নেয়ে নি ; রোদ উঠেছে, এখনি গয়লানী দুদ আনিবে উনুন ধরাতে হবে। কলিকাতায় কুয়োর জলে নাইতে সুখ হয় না, এর চেয়ে আমাদের পাড়াগেঁয়ে পুখুর ভাল, বেশ নেবে স্নান করা যায়। আর কুয়োর জলে কেমন একটা গন্ধ।

সুধা হাসিয়া বলিল, তোমার বুঝি কলিকাতার সবই খারাব লাগে? কেন কলিকাতার কলের জল কেমন সুন্দর। ঝি খাবার জন্যে এক কলসী করে আনে, সে যেন কাগের চক্ষু, আর কেমন মিষ্টি।

বিন্দু। নে বোন, তোর [illegible] সুখ্যাতি আর শুনিতে পারি না।

সুধা। কেন দিদি, তুমি [illegible] কি দেখ্‌লে বল। কত বড় সহর, কত বাজার, দোকান, ঘর, গাড়ী, ঘোড়া, লোক জন, এমন কি আমাদের তালপুখুরে আছে? এমন দোতালা বাড়ী কি আমাদের তালপুখুরে আছে?

বিন্দু। তা না থাকুক বন, আমাদের তালপুখুরের সোণার বাড়ী। চারিদিকে নড়বার চড়বার জায়গা আছে, একটু বাতাস আসে, একটু রোদ আসে, দুটা লাউ গাছ আছে, দুটা আঁব গাছ আছে, এখানে কি আছে বল তো? গাড়ী ঘোড়া যাদের আছে তাদের আছে, আর দোতালা পাকা বাড়ী নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ঘরে বাতাস আসে না, ছোট অন্ধকার উঠানে রোদ আসে না, পাড়ায় লোকের বাড়ী দেখা করতে যাবার যো নেই, পাল্কী না হলে বাড়ীর বাইরে যাবার যো নেই,—ও মা এ কি গো? যেন পিঁজরের ভিতর পাখী রেখেছে!

সুধা। কেন দিদি, সে দিন আমরা গাড়ী করে কত বেড়িয়ে

এলাম, চিড়িয়াখানায় বাগ সিংহ দেখে এলাম, গাড়ী করে বেরুলেই কত কি দেখিতে পাই।

বিন্দু। না বাবু আমার গাড়ী করে বেড়াতে ভাল লাগে না। আমাদের তালপুখুর সোণার তালপুখুর, সকালবেলা পুখুরের ঘাটে নেয়ে আসিতাম, সেই ভাল। আর সব লোককে চিনিতাম, সবার বাড়ী যাইতাম, সবাই কত আমাদের ভাল বাসিত। এখানে কে কাকে চেনে বল ?

সুধা। তা দিদি একদিনেই কি চিনিবে, থাকৃতে থাকৃতে সকলকে চিনিবে। ঐ সেদিন দেবীপ্রসন্ন বাবুদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল, আমাদের যেতে বলেছে। আর চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের কাল কত খাবার দাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিন্দু। তা আলাপ হবে বৈকি বন; যতদিন থাকৃব, লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হবে। তবে কি জান সুধা, তাঁরা হলেন বড় লোক, আমরা গরিব মানুষ, তাঁদের সঙ্গে কি ততটা মেশা যায়, তা নয়; তাঁরা আমাদের সঙ্গে দুটা কথা কন, এই তাঁদের অনুগ্রহ। তা কলিকাতায় যখন এসেছি তখন দুজন চার জনের সঙ্গে কি চেনা শুনা হবে না, তা হবে বৈকি।

সুধা। আর শরৎ বাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন, কত লোকের কত কথা কন, কত বইয়ের কথা বলেন,—দিদি, সে গল্প শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে।

বিন্দু। আহা শরতের মত কি ছেলে আজ কাল আর দেখা যায়? তার একজামিনের জন্যে সমস্ত দিন পড়া শুনা করিতে হয়, তবু প্রত্যহ আমরা কেমন আছি জিজ্ঞাসা করতে

আসেন, পাছে কলিকাতায় এসে আমাদের মন কেমন করে তাই রোজ সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম তত দিন ত তাঁর পড়া শুনা ঘুরে গিয়েছিল, কিসে আমরা ভাল থাকি সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। তাঁর টাকায় জাঁক নাই, লেখাপড়ার জাঁক নাই, আর শরীরে কত মায়া দয়া। তাঁর মত ছেলে কি আর আছে?

সুধা। দিদি, ঐ বুঝি গয়্লানী আস্‌ছে!

বিন্দু। কি লো, আজ একটু ভাল দুধ এনেছিস্, না কাল্‌কের মত জল দেওয়া দুধ এনেছিস্? তোদের কলিকাতায় বাছা কলের জলের ত অভাব নাই, তোদের দুধেরও অভাব নাই, রংটা রাখ্‌তে পারলেই হইল! *

গোয়ালিনী। না মা, তোমাদের বাড়ীতে কি সে রকম দুধ দিলে চলে, এই দেখ না কেন? তোমরা ত খেলেই ভাল মন্দ বুঝ্‌তে পার্‌বে।

বিন্দু। দেখিছি বাছা দেখিছি; আহা তালপুখুরে আমরা তিন পো, একসের করে দুধ পাইতাম, তাই ছেলেরা খেয়ে উঠ্‌তে পারিত না। তুই বাছা পাঁচ পো করে দুধ দিস, তা খেয়ে ছেলেদের পেট ভরে না। আর কড়ায় যখন দুধ ঢালি, সে দুধ ত নয় যেন জল ঢালছি।

গো। তা পাড়াগাঁয়ে যেমন দুধ পেতে মা, এখানে কি তেমন পাবে। সেখানে গরু চরে খায়, থাকে ভাল, দুধ দেয় ভাল। আমাদের বাঁধা গরু কি তেমন দুধ দেয়।

বিন্দু। আর কাল যে একটু দৈ আন্‌তে বলেছিলাম, তা এনেছিস্?

গো। হাঁ এই যে এনেছি।

বিন্দু। ও মা! ঐ চার পয়সার দৈ?

গো। তা, হাঁ গা, চার পয়সার দৈ আর কত হবে গা। ঐ তোমার ঝিকে বল না বাজার থেকে একখানা কিনে আন্‌তে, যদি এর চেয়ে বড় আনে তবে দাম দিও না। হাঁ মা, তোমাদের পিত্তেশে আমরা আছি, তোমাদের কি আমি ঠকাব গা?

বিন্দু। ওলো সুধা, এই দেখ লো, তোর সোণার কলিকাতার চার পয়সার দৈ দেখ! একটু জল মেখে খাস বন, তা না হলে ভাতে মাখ্‌তে কুলাইবে না! কে ও ঝি এসেছিস!

ঝি। কেন গা?

বিন্দু। বাছা, আজ একটু সকাল সকাল বাজার যাস ত। আজ বাবু দশটার সময় বেরবেন বলেছেন, সকাল সকাল বাজার করে আসিস ত। তুই কি মাছ নিয়ে আসিস তার ঠিক নাই। হাঁ লা, বড় বড় কৈ মাছ বাজারে পাওয়া যায় না?

ঝি। তা পাওয়া যাবে না কেন মা, তবে যে দর, সে কি ছোঁয়া যায়? বড় বড় কৈ এক একটা দুপয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা চায়।

বিন্দু। বলিস কি রে? কলিকাতায় লোক কি খায় দায় না, কেবল গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়ায়?

ঝি। তা খাবে না কেন মা, যে যেমন খরচ করে সে তেমনি খায়। আমাদের দিন চার পয়সার মাছ আসে তাতে দুবেলা হয়, তাতে কি ভাল মাছ পাওয়া যায়?

বিন্দু। আচ্ছা মাগুর মাছ?

ঝি। ওমা মাগুর মাছের কথাটা কইও না, একটা বড়

মাগুর মাছের দাম চার পয়সা, ছ পয়সা, আট পয়সা। বলবো কি মা, কল্‌কেতার বাজার যেন আগুন। আমরাও মা পাড়াগাঁয়ে ঘর করেছি, হাটে মাছ কিনে খেয়েছি, তা কল্‌কেতায় কি তেমন পাই? কল্‌কেতায় কি আমাদের মত গরিব লোকের থাক্‌বার জো আছে মা,—এই তোমরা ছবেলা ছপেট খেতে দিচ্ছ তাই তোমাদের হিল্লতে আছি, নৈলে কল্‌কেতায় কি আমরা থাক্‌তে পারি?

বিন্দু। তা নে বাছা, যা ভাল পাস নিয়াসিস, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দেখে শুনে ভাল দেখে আনিস। আর এক পয়সার ছোট ছোট মৌরলা মাছ আনিস, একটু অম্বল রেঁধে দিব। বাবুকে যে কি দিয়ে ভাত দি তাই ভেবে ঠিক পাইনি। আর দেখ্, শাক যদি ভাল পাওয়া যায় ত এক পয়সার আনিস ত, নটে শাগ হয়, কি পালম শাগ হয়, না হয় নাউ শাগ হয়ত আরও ভাল। আহা তালপুখুরে আমাদের নাউ শাগের ভাবনা ছিল না, বাড়ীতে যে নাউ শাগ হত তা খেয়ে উঠ্‌তে পার্‌তাম না। আলুগুন বড় মাগ্‌গি, আলু জেয়দা আনিস নি, বেগুন হয়, উচ্ছে কি ঝিঙ্গে হয়, কি আর কিছু ভাল তরকারি যা দেখ্‌বি নিয়ে আসিস। আর থোড় পাস ত নিয়ে আসিস ত, একটু ছেঁচ্‌কি করে দিব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস, একটু ঘণ্ট রেঁধে দিব। হা কপাল! থোড়, মোচা আবার পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয়!

স্নান সমাপন করিয়া গয়লানীকে বিদায় করিয়া ঝিকে পয়সা দিয়া বিন্দু রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং উনান জ্বালাইয়া দুধ জ্বাল দিয়া উপরে লইয়া গেলেন। ছেলে ছটী

উঠিয়াছে, তাহাদের দুধ খাওয়াইয়া বিছানা মাদুর তুলিলেন এবং ঘর পরিষ্কার করিলেন। একটু বেলা হইলে দাসী বাজার হইতে মাছ তরকারি আনিল, তখন বিন্দু ঝির নিকট ছেলে দুটীকে রাখিয়া পুনরায় রন্ধনঘরে প্রবেশ করিলেন। বাটীতে একটী দাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না, রন্ধন কার্য্য দুই ভগিনীই নির্ব্বাহ করিতেন। সুধা নূতন বাড়ীতে আসিয়া ভাঁড়ারী হইয়াছেন, বড় আহ্লাদের সহিত ভাঁড়ার হইতে নুন, তেল, মস্‌লা বাহির করিলেন, চাল ধুয়ে দিলেন, তরকারি কুটিলেন, মাছ কুটিলেন, এবং আবশ্যকীয় বাটনা বাটিয়া দিলেন। বিন্দু শীঘ্র রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে হেমচন্দ্র কয়েক দিন শরতের বাটীতে থাকিয়া ভবানীপুরে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন! শরৎ এ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক করিলেন আপন বাটীতে হেমকে রাখিবার জন্য অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে শরতের পড়ার হানি হইবে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় কোনও প্রকারে রহিলেন না। শরৎ অগত্যা অনুসন্ধান করিয়া মাসে ১১টাকা ভাড়ার একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

ভবানীপুরে শরৎ বাবু অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ ছিল, হেমচন্দ্রও তাঁহাদিগের পরিচিত হইলেন। কেহ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, কেহ বড় হৌসের বড় বাবু, কাহারও বনিয়াদি বিষয় আছে, কাহারও বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ, কিন্তু গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর আছে। কেহ নবাগত শিষ্টাচারী সদ্বংশজাত হেমচন্দ্রের সহিত প্রকৃত

সদ্ব্যবহার করিলেন, কেহ বা, ঝাড় লাণ্ঠান-পরিশোভিত জনাকীর্ণ বৈঠক্খানায় দরিদ্রকে আসিতে দিয়া এবং দুই একটী সগর্ব্ব কথা কহিয়া ভদ্রাচরণ বজায় রাখিলেন, এবং নিজ বড়মানুষি প্রকটিত করিলেন। কেহ হেমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা ও সদাচারে তুষ্ট হইয়া শরতের সহিত হেমকে দুই একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেহ বা নব্য সভ্যতার সুন্দর নিয়মানুসারে হেমচন্দ্রের “একোয়েণ্টান্‌স ফরম” করিতে “ভেরি হ্যাপি” হইলেন। কোন বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত বড়লোকের কার্পেট-মণ্ডিত ঘরে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সাক্ষাতামৃত লাভ করিতে পারিলেন না, অন্য কোন বড় লোক, তিনিও বিষয় কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত, জুড়ী করিয়া বাহির হইবার সময় ব্রুহমের জালানার ভিতর হইতে সহাস্য মুখচন্দ্র বাহির করিয়া সানুগ্রহ বচনে জানাইলেন যে হেমবাবু কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে আছেন শুনিয়া, তিনি (উপরিউক্ত বড় লোক) বড় সুখী হইয়াছেন, অদ্য তিনি (উপরিউক্ত বড় লোক) বড় “বিজি,” কিন্তু তিনি “হোপ” করেন শীঘ্র এক দিন বিশেষ আলাপ সালাপ হইবে। আর যদি হেম বাবু তাঁহার (উপরি উক্ত বড় লোকের) বাগান দেখিতে মানস করেন তবে শনিবার অপরাহ্নে আসিতে পারেন সেখানে বড় “পার্টি” হইবে, তিনি (উপরি উক্ত বড় লোক) হেম বাবুকে “রিসিভ” করিতে বড় “হ্যাপি” হই-বেন! ঘর ঘর শব্দে ব্রুহম বাহির হইয়া গেল, অশ্বক্ষুরোদ্গত কর্দ্দম হেমচন্দ্রের বস্ত্রে দুই এক ফোঁটা লাগিল, হেমবাবু সেই অমৃত হাস্য ও অমৃতবচনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী গেলেন।

ভবানীপুরের ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি মনে করিতেন কলিকাতার বড় বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন বড় বাজার হইতেও বড় একটী কলিকাতার বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল গুদমজাৎ আছে, সেই অপূর্ব্ব মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বাল্যকালে তিনি শিশু শিক্ষায় পড়িয়াছিলেন যে, গুণ থাকিলে বা বিদ্যা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যোচিত ভ্রম তাঁহার শীঘ্রই তিরোহিত হইল, তিনি এখন দেখিলেন সম্মানামৃত সের করা, মণ করা, বাজারে বিক্রয় হইতেছে, কেহ ভারি খানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেন পার্টি দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহবা পরের ধনে হস্তপ্রসারণ করিয়া, সেই অমৃত ক্রয় করিতেছেন, ও বড় সুখে, নিমীলিতাক্ষে সেই সুধা সেবন করিতেছেন। সুন্দর সুশোভিত বৈঠকখানার ঝাড় লণ্ঠন হইতে সে অমৃতের স্বচ্ছবিন্দু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্ম্মল অমৃত প্রতিফলিত হইতেছে, সুবর্ণ বর্ণ সুধার সহিত সে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্ত্তকীর সুললিত কণ্ঠস্বরে সে অমৃত প্রস্রবণের ঝঙ্কার শব্দিত হইতেছে! মনুষ্য মক্ষিকাগণ ঝাঁকে ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে! কখন কুকের বাড়ী হইতে ঘর্ঘর শব্দে সেই অমৃত নিঃসৃত হইতেছে; কখন অসলারের দোকান হইতে সে সুধা প্রতিফলিত হইতেছে, জগৎ তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে! আর কখনও বা অবারিত বেগে

কর্ত্তৃপক্ষদিগের মহল হইতে সে অমৃতস্রোত প্রবাহিত হই-তেছে, যাবতীয় বড়লোকগণ, সমাজের সমাজপতিগণ, ভারি ভারি দেশের মহামান্যগণ, পরম সুখে তাহাতে অবগাহন করিতেছেন, হাবুডুবু খাইতেছেন, আপনাদিগের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন! আবার কখনও বা বিলাত হইতে "পেক" করা, "হর্মেটিকিলীসীল" করা বাক্‌সে বাক্‌সে সে মাল আম-দানি করা হইতেছে, দুই এক খানি ফাঁপা বা গিল্‌টী করা দ্রব্যের সহিত রাশি রাশি চাটুকারিতা বিমিশ্রিত করিয়া বিলাতী মহাজনের মন ভুলাইয়া দেশীয় বিজ্ঞগণ সে মাল আমদানি করিতেছেন! এ বাজারে সে মালের দর কত! "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পত্র!" "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পদবী!" এই গৌরব ধ্বনিতে বাজার গুলজার হইতেছে!

বিস্তীর্ণ বাজারের অন্য কোথায় "দেশহিতৈষিতা," "সমাজ সংস্কার" প্রভৃতি বিলাতী মাল বিলাতীদরে বিক্রয় হইতেছে, সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল, তাহাতে কলিকাতার টাউনহল, কৌনসিল হল, মিউনিসিপাল হল প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র দেখিলেন রাজমিস্তিরি অনবরত মেরামত করিয়াও সে সব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে না, দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়া সে কোলাহল গগনে উত্থিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার সে হাটের ঠিক সম্মুখে অন্য-রূপ মাল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেতাগণ বড় বড় জয় ঢাক বাজাইয়া চিৎকার করিতেছে,—আমাদের এ খাটী দেশী মাল

ইহার নাম "সমাজ সংরক্ষণ!" ইহাতে বিলাতী মালের ভেজাল নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখ। হেমচন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন মালটা যোল আনা বিলাতী, বিলাতী পাত্রে বিক্রিত, বিলাতী মালমসলায় প্রস্তুত, কেবল একটু দেশী ঘিয়ে ভেজে নেওয়া মাত্র। হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু সৌখিন, তাঁহার বোধ হইল ঘিটাও ভাল খাঁটি দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা, ও দুর্গন্ধ! সেই ঘিয়ে ভাজা গরম গরম এই "প্রকৃত দেশী" মাল বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি খরিদ্দার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে। সের দরে, মন দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালায় করিয়া, সেই মাল বিক্রয় হইতেছে। মুটেরা রাশি রাশি মাল বহিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আমোদিত হইতেছে!

তাহার পর সাধুত্বের বাজার, বিজ্ঞতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার,—হেমচন্দ্র কত দেখিবেন? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; এক শাস্ত্রে নহে, সর্ব্ব শাস্ত্রে; এক ভাষায় নহে, সকল ভাষায়; এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়ে; কম বেশি নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে, জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে। সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটা জালা ফাসিয়া গেল, পথ ঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দ্দমময় হইল, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পালাইলেন।

তাহার পর ধর্ম্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতার

বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কলিকাতার কি মাহাত্ম্য,—এমন জিনিসই নাই যাহা খরিদ বিক্রয় হয় না। যাহাতে দুই পয়সা লাভ আছে তাহারই একখানা দোকান খোলা হইয়াছে, মাল গুদমজাত হইয়াছে, মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একখানি জমকাল "সাইন বোর্ড" সম্মুখে দর্শকদিগের নয়ন ঝলসিত করিতেছে! বাল্যকালে তিনি বড় বাজারের বণিকদিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অদ্য এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতায় জিনিসের কাটতি, চতুরতায় বিশেষ মুনফা, চতুরতায় জগৎ সংসার ধাঁদা লাগিয়া রহিয়াছে!

কলিকাতায় অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁটি মালও দেখিতে পাইলেন। কখন কোন ক্ষুদ্র দোকানে বা অন্ধকার কুটীরে একটু খাঁটি দেশহিতৈষিতা, একটু খাটি পরোপকারিতা, বা একটু খাঁটি পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে? কলিকাতার গৌরবান্বিত বড় বাজারের সে মালের আমদানি রপতানি বড় অল্প, সুসভ্য মহাসম্ভ্রান্ত ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ছেলে মুখে বুড়ো কথা।

আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় কোনও কার্য্যের জন্য বিশেষ লালায়িত নহেন, কিছু না হয়, ছয় মাস পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন ; তথাপি যখন কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায় আসিয়াছেন তখন কর্ম্ম পাইবার জন্য যত্নের ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোন উপায় করিতে পারেন নাই। তাঁহার চারিদিকে কলিকাতার অনন্ত লোক-স্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে এই অনন্ত জনসমুদ্রের মধ্যে হেমচন্দ্র একাকী !

সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত হইয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিতেন। শান্ত, সহিষ্ণু বিন্দু স্বামীর জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, দুখানি আক্, দুটী পানফল, চারটী মুগের ডাল, এক গেলাস মিস্রির পানা সযত্নে আনিয়া দিতেন, প্রফুল্ল চিত্তে মিষ্ট বাক্য দ্বারা হেমচন্দ্রের শ্রান্তি দূর করিতেন। পল্লীগ্রামেও যেরূপ ভবানীপুরেও সেইরূপ, স্বামী-সেবাই বিন্দুর একমাত্র ধর্ম্ম, ছেলে দুটীকে মানুষ করাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ। সেই কার্য্যে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় শিশু দুইটীকে লইয়া ছাদে গিয়া বসিতেন, কখন কখন দেশের চিন্তা করিতেন, কখন কখন ছাদের প্রাচীরের গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথের জনস্রোত দেখিতেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ক্ষীণ, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক ম্লান।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শরৎ হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিন্দু শয়ন ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া একটি মাদুর পাতিয়া দিতেন, সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অনেক

রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন। হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন তাহাই বলিতেন ; শরৎ কলেজের কথা, পুস্তকের কথা, শিক্ষক বা ছাত্রদিগের কথা, কলিকাতার নানা গল্প, নানা কথা, সংসারের সুখ দুঃখের কথা, জগতে ধন ও দারিদ্রের কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কহিতেন। তাহার নবীন বয়সের উৎসাহ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেই কথায় দেদীপ্যমান হইত, জগতের প্রকৃত মহৎ লোকের উৎসাহ, মহত্ব ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞার গল্প করিতে করিতে শরৎচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইত, জগতের প্রতারণা মিথ্যাচরণ ও অত্যাচারের কথা কহিতে কহিতে সেই যুবকের নয়নদ্বয় প্রজ্বলিত হইত।

হেমচন্দ্র জেষ্ঠ্য ভ্রাতার স্নেহের সহিত সেই উন্নতহৃদয় যুবকের কথা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট ও প্রীত হইতেন, বিন্দু বাল্যসুহৃদের হৃদয়ের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা ও ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন এবং মনে মনে শরতের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন ; বালিকা সুধা নিদ্রা ভুলিয়া যাইত, একাগ্রচিত্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃত ভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন সে কথা সর্ব্বদাই সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেন। এক দিন কলিকাতার "বড় বাজারের" মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, শরৎ! দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্

গুণগুলি মনুষ্য হৃদয়ের প্রধান গুণ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সদ্গুণ গুলির ন্যায় তোমাদের কলিকাতায় যে রাশি রাশি প্রতারণা কার্য্য হয় তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের পল্লীগ্রামে প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা বিরল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতার আড়ম্বরও বিরল!

শরৎ। আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য, বড় বড় সহরেই বড় বড় প্রতারণা, কিন্তু আপনি কি প্রকৃত সদ্গুণ কলিকাতায় পান নাই; প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, সত্যাচরণ, বিদ্যানুরাগ, যশোলিপ্সা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ মনুষ্য হৃদয়কে উন্নত করে, সে গুলি কি আপনি দেখেন নাই?

হেম। শরৎ, তাহা আমি বলি নাই, বরং কলিকাতায় সেরূপ অনেক সদ্গুণ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশানুরাগ দেখিয়াছি, স্বদেশীয়দিগের হিতসাধন জন্য যেরূপ অনন্ত চেষ্টা, অনন্ত উদ্যম, জীবনব্যাপী উৎসাহ দেখিলাম, এরূপ পল্লীগ্রামে কখনও দেখি নাই; পুস্তকে ভিন্ন অন্য স্থানে লক্ষিত করি নাই। বিদ্যানুরাগও সেই রূপ। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে আমি প্রকৃত বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে জানিতাম না, কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য, স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ জন্য, যৌবন হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত, মধ্য বয়স হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অনন্ত অবারিত পরিশ্রম, তাহা কলিকাতায় দেখিলাম। আর প্রকৃত যশে অভিরুচি, জীবন পণ করিয়া সৎকার্য্যের দ্বারা মহত্বলাভ করিতে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়, ইহা পল্লীগ্রামে কোথায় দেখিব? ইহাও কলিকাতায় দেখিলাম। শরৎ আমি কলিকাতায় শত

শত সদ্‌গুণ দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে একটী সদ্‌গুণ আছে সেইখানে তাহার দশ প্রকার মিথ্যা অনুকরণ আছে, যদি দশজন প্রকৃত দেশহিতৈষী থাকেন, একশতজন দেশ হিতৈষীর নাম লইয়া চিৎকার ও ভণ্ডামি করিতেছেন, দশজন প্রকৃত সমাজ সংরক্ষণে যত্নশীল, শতজন সেই সদ্‌গুণের নামে শত প্রকার প্রতারণার দ্বারা পয়সা রোজগার করিতেছে। এইটী প্রকৃত দোষের কথা।

শরৎ। সে দোষ তাহাদের না আমাদের? বিন্দুদিদি, তোমার এ মাদুরে ছারপোকা আছে।

বিন্দু। সে কি শরৎ বাবু কামড়াচ্ছে নাকি?

শরৎ। না কামড়ায় নি, জিজ্ঞাসা করিতেছি আছে কি না?

বিন্দু। না শরৎ বাবু আমার বাড়ীতে অমন জিনিসটী নাই। আমি নিজের হাতে প্রত্যহ বিছানা মাদুর রোদে দি, জিনিস পত্র ঝাড় ঝোড় করি। নোংরা আমি দু চক্ষে দেখিতে পারি না।

শরৎ। সে দিন হেমবাবু আর আমি দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলাম, বাড়ীর ভিতর আমাদের খাইতে নিয়ে গিয়াছিল; তা তাদের মাদুরে এমন ছারপোকা যে বসা যায় না। তার কারণ কি বিন্দুদিদি?

বিন্দু। কারণ আর কি, নোংরা, অপরিষ্কার। জিনিস পত্র নোংরা রাখিলেই ঐগুল জন্মে।

শরৎ। বিন্দুদিদি আমরাও সেইরূপ সমাজ অপরিষ্কার রাখিলেই তাহাতে প্রতারণার কীটগুলা জন্মায়। আমরা যদি

পরনিন্দা ইচ্ছা করি, পরনিন্দা বাজারে বিক্রয় হইবে। আমরা যদি পণ্ডিত্যাভিমানীর মূর্খতায় মুগ্ধ হইয়া হাঁ করিয়া থাকি, সেই মূর্খতাই বিদ্যারূপে বিক্রয় হইবে। ওষ্ঠে বিদ্যমান দেশহিতৈষিতায় যদি আমরা পুলকিত হই, সেইরূপ দেশহিতৈষিতার ছড়া ছড়ি হইবে। চিনাবাজারে যেরূপ কাপড় যখন লোকের পছন্দ হয় সেইরূপ কাপড়ের সেই সময়ে অধিক মূল্য হয়, অধিক আমদানি হয়। আমাদের ও যেরূপ সদ্‌গুণে পছন্দ ও রুচি, সেইরূপ ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইতেছে। এটী তাহাদের দোষ না আমাদের দোষ?

বিন্দু। আচ্ছা সে কথা বুঝিলাম। কিন্তু মাদুরে ছারপোকা হইলে মাদুর রোদে দিতে পারি, মশারি বা বিছানায় কীট থাকিলে তাহা ধোপার বাড়ী দিতে পারি। সমাজে এরূপ কীট উৎপন্ন হইলে তাহার কি উপায়? সমাজ কি ধোপার বাড়ী পাঠান যায়, না রোদে দেওয়া যায়?

শরৎ। বিন্দুদিদি, সমাজ পরিষ্কার করিবারও উপায় আছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ মাদুরের ছারপোকাগুলি সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর সামগ্রীগুলিও একে একে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয়। যদি শিক্ষায় সে ফল না ফলে, তাহা হইলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ওষ্ঠস্থ দেশহিতৈষিতায় যদি আমরা মুগ্ধ না হই, তবে সেরূপ দ্রব্য কত দিন উৎপন্ন হয়? পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খতা দেখিলে যদি আমরা সহাস্যে তথা হইতে প্রস্থান করি, তবে সে সামগ্রী কত দিন

বিরাজ করে? এ সমস্ত মেকি সামগ্রী যে এখন এত পরিমাণে উৎপন্ন হয় সে আমাদের শিক্ষার দোষে, তাহাদের দোষে নহে।

হেম। শরৎ, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তথাপি শিক্ষা গুণে সমাজ হইতে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা একেবারে লোপ হইবে এরূপ আমার আশা নাই। শিক্ষিত দেশে যতদূর প্রতারণা আছে, আমাদের দেশে তত নাই, মনুষ্য হৃদয়ে যতদিন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই থাকিবে, জগতে তত দিন ধর্ম্মাচরণ ও প্রতারণা উভয়ই থাকিবে। তথাপি প্রকৃত শিক্ষাগুণে সমাজে কর্ত্তব্য-সাধন বাসনা ক্রমে বিস্তৃত হয় তাহা আমাদেরও বোধ হয়।

বিন্দু। তা আজ কাল তোমাদের কালেজে যে লেখা পড়া হয় তাহাতে কি এ শিক্ষা দেয় না?

শরৎ। বিন্দুদিদি, কলেজের শিক্ষাকে অনেকে অতিশয় নিন্দা করে, আমি তাহা করি না। যে শিক্ষায় আমরা মহৎ জাতিদিগের, মহৎ লোকদিগের জীবনচরিত ও কার্য্য-কলাপ অবগত হইতেছি, ও প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মাবলী শিখিতেছি তাহা কি মন্দ শিক্ষা? যাঁহারা ইহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারেন না, সে তাঁহাদের হৃদয়ের দোষ, শিক্ষার দোষ নহে। হেমবাবু কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, প্রকৃত উন্নতি ইচ্ছার কথা বলিলেন, তাহা পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল অদ্য তাহা হইতে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা কেবল এই কলেজের শিক্ষাগুণে। আবার এই শিক্ষাগুণে এই সদ্‌গুণগুলি পঞ্চাশৎ বৎসর পর আরও অধিক লক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু শতাব্দিতেও আমরা বোধ হয় ইউরোপীয়

জাতিদিগের ঠিক সমকক্ষ হইতে পারিব কি না সন্দেহ ; কিন্তু তথাপি আমার ভরসা যে জগদীশ্বরের কৃপায় দিন দিন আমরা অগ্রসর হইতেছি। আত্মবিসর্জ্জন ও কর্ত্তব্যসাধনে অনন্ত উৎসাহ, ও অনন্ত চেষ্টা, এই উন্নতির একমাত্র পথ, সেই আত্মবিসর্জ্জন, সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমরা এখনও কত টুকু শিখিয়াছি, চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয় !

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল, শরৎ যাইবার জন্য উঠিলেন। হেম তাঁহার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাইলেন, দেখিলেন পথে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের শীতল নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি এক পা দুই পা করিয়া শরতের সঙ্গে অনেক দূর গেলেন। পথেও এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেবীপ্রসন্ন বাবুও আজ সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি শরৎ ও হেমকে দেখিয়া শরতের বাটী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত গেলেন।

হেমচন্দ্র দেবীবাবুর সহিত ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন আমি কলেজের অনেক ছেলে দেখিয়াছি, অনেকের সহিত কথা কহিয়াছি, কিন্তু শরতের ন্যায় প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছে, শরতের ন্যায় উন্নত হৃদয়, উন্নত চিত্ত, আনন্দনীয় উদ্যম ও উৎসাহ আছে, এরূপ অল্পই দেখিয়াছি।

দেবীবাবু বলিলেন, হেঁ ছেলেটী ভাল, গুণবান বটে, বেঁচে থাকুক, বাপের নাম রাখ্‌বে। আর লেখাপড়াও শিখ্‌বে বটে, কিন্তু ছেলেমানুষ হয়ে বুড়োর মত কথা কয় কেন? ছোঁড়াটা শেষে ফাজিল না হয়ে যায় তাই ভাবি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেবীপ্রসন্ন বাবু।

ভবানীপুরের কায়স্থদিগের মধ্যে দেবীপ্রসন্ন বাবুর জাঁকি নাম। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহার শরীর-খানি এখনও বলিষ্ঠ, স্থূল ও গৌর বর্ণ। তাঁহার প্রসন্ন মুখে হাস্য সর্ব্বদাই বিরাজমান এবং তাঁহার মিষ্ট কথায় সকলেই আপ্যায়িত হইত। তাঁহাদের অবস্থা এককালে বড় মন্দ ছিল, দেবীপ্রসন্ন বাবু বাল্যকালে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, এবং অল্প বয়সেই লেখা পড়া ছাড়িয়া সামান্য বেতনে একটী "হৌসে" কর্ম্ম লইয়াছিলেন। তথায় অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, অবশেষে হৌসের সাহেবকে অনেক ধরিয়া পড়ায় সাহেব বিলাত যাইবার সময় হৌসের পুরাতন ভৃত্যের পদ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সৌভাগ্য যখন একবার উদয় হয় তখন ক্রমেই তাহার জ্যোতি বিস্তার হয়। সেই সময় তিন চারি বৎসর হৌসের অনেক লাভ হওয়ায় সাহেবগণ বড়ই তুষ্ট হইয়া শেষে দেবী বাবুকে হৌসের বড় বাবু করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তখন দেবী বাবুর বিলক্ষণ দু পয়সা আয় হইল, এবং তিনি ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীর অনেক উন্নতি করিয়া সম্মুখে একটী সুন্দর বৈঠকখানা প্রস্তুত করাইলেন, এবং সুন্দররূপে সাজাইলেন। বৈঠকখানায় দেবী বাবু প্রত্যহ ৮ টার সময় বসিতেন, প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

ক্রমেই দেবীবাবুর নাম বিস্তার হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাঁহার বাটীতে বহু সমারোহে পূজা হইত, এবং যাত্রা ও নাচ দেখিতে ভবানীপুরের যাবতীয় লোক আসিত। তদ্ভিন্ন বাড়ীতে একটী বিগ্রহ ছিল, প্রত্যহ তাহার সেবা হইত, এবং বাড়ীর মেয়েরা নানারূপ ব্রত উপলক্ষে অনেক দান ধর্ম্ম করিত। দুই একজন করিয়া দেবীবাবুর দরিদ্রা জ্ঞাতি কুটুম্বিনীগণ সেই বিস্তীর্ণ বাটীতে আশ্রয় পাইল, পাড়ার মেয়েরাও সর্ব্বদা তথায় আসিত, সুতরাং বাহির বাটী ও ভিতরবাটী সমান লোকসমাকীর্ণ।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিবার পর অল্প দিনের মধ্যেই দেবীপ্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ করিলেন, এবং দেবীবাবুও সেই নবাগত ভদ্রলোককে যথোচিত সম্মান করিয়া আপন বৈঠকখানায় লইয়া যাইতেন। বৈঠকখানায় সুন্দর পরিষ্কার বিছানা পাতা আছে, দুই তিনটী মোটা মোটা গিদ্দে, এবং একটী কুলুঙ্গিতে দুইটী শামাদান। ঘরের দেয়াল হইতে জোড়া জোড়া দেয়ালগিরি বস্ত্রে ঢাকা রহিয়াছে এবং নানারূপ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ছবি ঝুলিতেছে। কোথায় হিন্দু দেবদেবীদিগের ছবি রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে জর্ম্মনি দেশস্থ অতি অল্প মূল্যের অপকৃষ্ট ছবিগুলি বিরাজ করিতেছে। সে ছবিতে কোন রমণী চুল বাঁধিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শুইয়া রহিয়াছে; কাহারও শরীর আবৃত, কাহারও অর্দ্ধেক আবৃত, কাহারও অনাবৃত। আবার তাহাদের মধ্যে করেজীওর একখানি "মেগ্‌ডেলীন," টিসীয়নের "ভিনস্" ও লেণ্ডসিয়রের এক জোড়া হরিণও বিকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে ছাপা এত নিকৃষ্ট

যে ছবিগুলি চেনা ভার। বহুবাজারে বা নিলামে যাহা শস্তা পাওয়া গিয়াছে এবং দেবী বাবু বা দেবী বাবুর সরকারের রুচি সম্মত হইয়াছে, তাহাই ছাপা হউক, ওলিওগ্রাফ হউক, সংগ্রহ পূর্ব্বক বৈঠকখানার দেয়াল সাজান হইয়াছে।

হেমচন্দ্র সর্ব্বদাই দেবী বাবুর সহিত আলাপ করিতে যাই-তেন এবং কখন কখন সময় পাইলে আপনার কলিকাতা আসার উদ্দেশ্যটী প্রকাশ করিয়াও বলিতেন। দেবীবাবু অনেক আশ্বাস দিতেন, বলিতেন হেমবাবুর মত লোকের অবশ্যই একটী চাকুরি হইবে, তিনি স্বয়ং সাহেবদের নিকট হেমবাবুকে লইয়া যাইবেন, হেমবাবুর ন্যায় লোকের জন্য তিনি এই টুকু করিবেন না তবে কাহার জন্য করিবেন?—ইত্যাদি। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া হেমচন্দ্র একটু আশ্বস্ত হইলেন; দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রধান গুণ এইটী যে তাঁহার নিকট শত শত প্রার্থী আসিত, তিনি কাহাকেও আশ্বাস বাক্য দিতে ক্রটী করিতেন না।

কিন্তু কার্য্য সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, ভদ্রাচরণে দেবী বাবু ক্রটী করিলেন না। তিনি দুই তিন দিন হেম ও শরৎকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, এবং তাঁহার গৃহিণী হেম বাবুর স্ত্রীকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পাঠাইলেন। বিন্দু কায কর্ম্ম করিয়া প্রায় অবসর পাইতেন না, কিন্তু দেবী বাবুর স্ত্রীর আজ্ঞা ঠেলিতে পারিলেন না, সুতরাং একদিন সকাল সকাল ভাত খাইয়া সুধাকে ও দুইটী ছেলেকে লইয়া পাল্কী করিয়া দেবীবাবুর বাড়ী গেলেন। দেবী বাবু তখন আপিসে গিয়াছেন, সুতরাং বহির্বাটী নিস্তব্ধ; কিন্তু বিন্দু বাড়ীর ভিতর

যাইয়া দেখিলেন যে অন্দর মহল লোকাকীর্ণ। উঠানে দাসীরা কেহ ঝাঁট দিতেছে কেহ ঘর নিকাইতেছে, কেহ কাপড় শুখাইতে দিতেছে, কেহ এখন মাছ কুটিতেছে, কেহ সকল কার্য্যের বড় কার্য্য—কলহ করিতেছে। কলিকাতার দাসীগণের বড় পায়া, মা ঠাক্‌রুণের কথাই গায়ে সয় না,—কোন আশ্রিতা আত্মীয়া কিছু বলিয়াছে তাহা সহিবে কেন,—দশ গুণ শুনাইয়া দিতেছে, ভদ্র রমণী সে বাক্যলহরী রোধ করার উপায়ান্তর না দেখিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া স্থানান্তর হইলেন। পাতকোতলায় ঝি বৌয়ের হাট, সকলে একেবারে নাইতে গিয়াছে, সুতরাং রূপের ছটা, গল্পের ছটা, হাস্যের ছটার শেষ নাই। আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরীগণ তথায় অবর্ত্তমানা প্রিয় বন্ধুদিগের চরিত্রের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। কেহ গুল দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, "হ্যাঁলা ও বাড়ীর ন বৌয়ের জাঁক দেখিছিস্, সে দিন যগ্‌গিতে এসেছিল তা গয়নার জাঁকে আর ভুঁয়ে পা পড়ে না. হ্যাঁ গা তা তার স্বামীর বড় চাকরি হয়েছে হই-ইচে, তা এত জাঁক কিসের লা।" কেহ চুল খুলিতে খুলিতে কহিলেন "তা হোক 'বন, তার জাঁক আছে জাঁকেই আছে, তার শাশুড়ী কি হারামজাদী। মা গো মা, অমন বৌ-কাঁটকি শাশুড়ী ত দেখিনি, বৌকে স্বামী ভালবাসে বলে সে বুড়ী যেন দু চক্ষে দেখতে পারে না। ঢের ঢের দেখেছি অমনটী আর দেখিনি।" অন্য সুন্দরী গায়ে জল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন "ও সব সোমান গো, সব সোমান—শাশুড়ী আবার কোন্ কালে মায়ের মত হয়, দু বেলা বকুনি খেতে খেতে আমাদের প্রাণ যায়।" "ওলো চুপ কর লো চুপ কর,

এখনি নাইতে আস্‌বে, তোর কথা শুনতে পেলে গায়ের চামড়া রাখ্‌বে না। তবু বন আমাদের বাড়ী হাজার গুণে ভাল, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শাশুড়ী মাগীর কথা শুনেছিস্‌, সে দিন বউকে কাঠের চেলার বাড়ী ঠেঙ্গিয়েছিল।" "তা সে শাশুড়ীও যেমন বৌও তেমন, সে নাকি শাশুড়ীর উপর রাগ করে হাতের নো খুলে ফেলেছিল, তাইতেই ত শাশুড়ী মেরেছিল।" "তা রাগ কর্‌বে না, গায়ের জ্বালায় করে, স্বামীটাও হয়েছে লক্ষ্মীছাড়া, মদ খায়, ঘরে থাকে না আর তার মাও তেমনি, তা বৌয়ের দোষ কি ?" ইত্যাদি।

রান্নাঘরে কোন কোন বৃদ্ধা আত্মীয়াগণ বসিয়াছিলেন, কেহ বা গিন্নীর জন্য ভাত নামাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কেহ দুটো কথা কহিতে আসিয়াছিলেন, কেহ ছেলে কোলে করে কেবল একটু ঝিমোতে ছিলেন। বামীর মা ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিলেন "হাঁা লা ও পাল্কা করে কারা আজ এলো ? ঐ যে হন্‌ হন্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিন্নার কাছে গেল।" শ্যামার মা, "তা জানিস নি ওরা যে এক ঘর কায়েত কোন্‌ পাড়া গাঁ থেকে এসেছে. এই ভবানীপুরে আছে, তা ঐ বড় যেটা দেখ্‌লি, তার স্বামী বুঝি বাবুর আপিশে চাক্‌রি করবে. ওর ছোট বনটা বিধবা হয়েছে। গিন্নী ওদের ডেকে পাঠিয়েছিল।' "না জানি কেমন তর কায়েত, গায়ে দুখানা গয়না নেই, লোকের বাড়ী আস্‌বে তা পায়ে মল নেই, খালি গায়ে ভদ্র লোকের বাড়ী আস্‌তে লজ্জা করে না ?" "তা বন, ওরা পাড়া গাঁ থেকে এসেছে, আমাদের কল্‌কেতার চাল চোল এখন শেখেনি ?" "তা শিখ্‌বে কবে ? দু ছেলের মা হয়েও শিখ্‌লে না ত শিখ্‌বে

করে?" "তা গরিবের ঘরে সকলেরই কি গয়না থাকে?" "তবে এমন গরিবকে ডাকা কেন? আমাদের গিন্নীরও যেমন আক্কেল, তিনি যদি ভদ্র ইতর চিন্‌বেন, তবে আমাদেরই এমন কষ্ট কেন বল? এই ছিলাম আমার মাসতুত বনের বাড়ী তা সে আমায় কত যত্ন করিত, দুবেলা দুধ বরাদ্দ ছিল। তারা লোক চিন্‌ত। গিন্নী যদি লোক চিন্‌বে তবে আমার এমন দুরাবস্থা? তা গিন্নারই দোষ কি বল? যেমন বাপ মায়ের মেয়ে তেমনি স্বভাব চরিত্র,—টাকা হলে জাত ত আর ঘোচে না।" এইরূপে বৃদ্ধা আপন গোরব নাশের আক্ষেপ ও আশ্রয়-দাত্রী ও তাঁহার পিতা মাতার অনেক সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে লাগিলেন।

বিন্দু ও সুধা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া রেল দেওয়া বারাণ্ডা দিয়া গিন্নীর শোবার ঘরে গেলেন। গিন্নী তেল মাখিতেছিলেন;—একজন আশ্রিতা আত্মীয়া তাঁহার চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, আর একজন বুকে বেশ করিয়া তেল মালিস্ করিয়া দিতে-ছিলেন। তাঁহার বুকে কেমন এক রকম ব্যথা আছে (বড় মানুষ গিন্নীদের একটা কিছু থাকেই) তা কবিরাজ বলিয়াছে, রোজ স্নানের আগে এক ঘণ্টা করিয়া বেশ করে তেল মালিস্ করিতে। গিন্নী দেবী বাবুর ন্যায় বলিষ্ঠ নহেন, তাঁহার শরীর শীর্ণ, চেহারা খানা একটু রুক্ষ, মেজাজ্‌টা একটু খিট্ খিটে; সেই বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়া, দাসী, বৌ, ঝি, সকলেই সে মেজাজের গুণ প্রত্যহই সকাল সন্ধ্যা অনুভব করিত। শুনি-য়াছি দেবী বাবু স্বয়ং রজনীকালে তাহার কিছু কিছু আস্বাদন পাইতেন। দেবী বাবু স্বয়ং বিবর করিয়াছেন, তাঁহার আচ-

রণটী পূর্ব্ববৎ নম্র ছিল, কিন্তু নূতন বড় মানুষের মহিষীর ততটা নম্রতা অসম্ভব, নবাগত ধনদর্প দেবীবাবুর গৃহিণীতেই একমাত্র আধার পাইয়া দ্বিগুণ ভাবে উথলিয়া উঠিয়াছিল।

গিন্নী। কে গা তোমরা ?

বিন্দু। আমরা তালপুখুরের বোসেদের বাড়ীর গো, এই কল্‌কেতায় এসেছি। আপনি আস্‌তে বলেছিলেন, কাযের গতিকে এত দিন আস্‌তে পারিনি, তা আজ মনে কর্‌লাম দেখা করে আসি।

গিন্নী হাঁ হাঁ বুঝেছি, তা বস বস। তখনকার কালে নূতন লোক এলেই পাড়ার লোকদের সঙ্গে দেখা করার রীতি ছিল, তা এখন সে রীতি উঠে গিয়েছে, এখন লোকের কোথাও যাবার বার হয় না। তা তবু ভাল, তোমরা এসেছ। তালপুখুর কোথায় গা? সেখানে ভদ্র লোকের বাস আছে ?

বিন্দু। আছে বৈকি, সেখানে তিরিশ চল্লিশ ঘর ভদ্রলোক আছে, আর অনেক ইতর লোকের ঘর আছে। ঐ বর্দ্ধমান জেলার নাম শুনেছেন, সেই জেলায় কাটওয়া থেকে ৮।১০ ক্রোশ পশ্চিমে তালপুখুর গ্রাম।

গিন্নী। হাঁ হাঁ কাটওয়া শুনেছি বৈ কি—ঐ আমাদের ঝিয়েরা সব সেইখান থেকে আসে। অল্প হাস্য সেই ধনাঢ্যের গৃহিণীর ওষ্ঠে দেখা দিল। বিন্দু চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর গৃহিণী বলিলেন,—ঐটী বুঝি তোমার বন ? আহা এই কচি বয়সে বিধবা হয়েছে! তা ভগবানের ইচ্ছা, সকলের কপালে কি সুখ থাকে তা নয়, সকলের টাকা হয় তা নয়, বিধাতা কাউকে বড় করেন, কাউকে ছোট করেন।

প্রথম সংখ্যক আশ্রিতা, যিনি চুল খুলিয়া দিতেছিলেন, তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন,—তা নয় ত কি, এই ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের বাবুর যেমন টাকা কড়ি, ঘর সংসার, তেমন কি সকলের কপালে ঘটে? তা নয়, ও যার যেমন কপালের লিখন।

দ্বিতীয় সংখ্যক আশ্রিতা অনেকক্ষণ ক্রমাগত তেল মালিস্ করিতে করিতে হাঁপাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারও একটী কথা এই সময়ে বলিলে আশু মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। বলিলেন,—কেবল টাকা কড়ি কেন বল বন, যেমন মান, তেমনি যশ, তেমনি লেখা পড়া, সাহেব মহলে কত সম্মান। লক্ষ্মী যেন ঐ খাটের খুরোয় বাধা আছে।

ঈষৎ হাস্যের আলোক গিন্নার রুক্ষ বদনে লক্ষিত হইল, কথাটী তাঁহার মনের মত হইয়াছিল। একটু সদয় হইয়া সেই আশ্রিতাকে বলিলেন,—আহা তুমি কতক্ষণ মালিস করবে গা? তুমি হাঁপাচ্ছ যে। আর সব গেল কোথা, কাযের সময় যদি একজন লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সব রান্নাঘরের দিকে মন পড়ে আছে, তা কায করবে কেমন করে?

তীব্র স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল; দাসীতে দাসীতে এই কথা কানাকানি হইতে হইতে তারের খবরের ন্যায় পাতকোতলায় পঁহুছিল। সাহসা তথায় যুবতীদিগের হাস্য-ধ্বনি থামিয়া গেল, বৌয়ে বৌয়ে ঝিয়ে ঝিয়ে কানা কানি হইতে হইতে সেই খবর রান্নাঘরে গিয়া পঁহুছিল। তথায় যে উনানে কাটি দিতেছিল সে স্তম্ভিত হইল, যে ঝিমাইতেছিল সে সহসা জাগরিত হইল, ও শ্যামীর মা ও বামীর মা গিন্নীর

সুখ্যাতি প্রকটিত করিতে করিতে সহসা হৃদ্‌কম্প বোধ করিল। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে রান্নাঘর হইতে উপরে আসিয়া সভয়ে গৃহিণীর ঘরে প্রবেশ করিল।

বামীর মা। হেঁ গা আজ বুকটা কেমন আছে গা? আমি এই রান্নাঘরে উনুনে কাট দিচ্ছিলাম তাই আস্‌তে পারি নি, তা একবার দি না বুকটা মালিস করে।

গৃহিণী। এই যে এসেছ, তবু ভাল। তোমাদের আর বার হয় না, লোকটা মরে গেল কি বেঁচে আছে একবার খোঁজ খবরও কি নিতে নেই। উঃ যে ব্যথা, একি আর কমে, পোড়া-মুখো কব্‌রেজ এই এক মাস ধরে দেখ্‌ছে, তা ও ত কিছু করিতে পারিল না। তা কব্‌রেজেরই বা দোষ কি, বাড়ীর লোক একটু সেবা টেবা করে, একটু দেখে শুনে, তবে ত ভাল হয়। তা কি কেউ করবে? বলে কার দায়ে কে ঠেকে।

বামীর মা ও শ্যামীর মা আর প্রত্যুত্তর না করিয়া দুই জনে দুই পাশে বসিয়া মালিস আরম্ভ করিল, গৃহিণী পা দুটী ছড়াইয়া মুখে তেল মাখিতে মাখিতে আবার বিন্দুর সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণী। তোমার ছেলে দুটী ভাল আছে, অমন কাহিল কেন গা?

বিন্দু। ওরা হয়ে অবধি কাহিল, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, আর ছোটটীর আবার একটু পেটের অসুখ করেছিল, এখন সেরেছে।

গৃ। তাইত হাড় গুলো যেন জির জির করছে! তা বাছা

একটু জেয়দা করে দুদ খাওয়াতে পার না, তা হলে ছেলে দুটী একটু মোটা হয়। এই আমার ছেলেদের দিন একসের করে দুধ বরাদ্দ, সকালে আধ সের বিকেলে আধ সের। তা না হলে কি ছেলে মানুষ হয়?

বিন্দু। দুধ খায়, গয়লানীর যে দুধ, অর্দ্ধেক জল, তাতে আর কি হবে বল?

গৃ। ও মা ছি! তোমরা গয়লানীর দুধ খাওয়াও, আমাদের বাড়ীতে গয়লানী পা দেবার যো নাই। আমাদের বাড়ীতে গরু আছে, ঐ সে দিন ৮০ টাকা দিয়ে বাবু আপিশের কোন্ সাহেবের গরু কিনে এনেছেন, ৫ সের করে দুধ দেয়। তা ছাড়া দুটা দিশি গরু আছে, তারও ৩। ৪ সের দুধ হয়। বাড়ীর গরুর দুধ না খেয়ে কি ছেলে মানুষ হয়, গয়লানীর আবার দুধ, সে পচা পুখুরের জল বৈত নয়।

বিন্দু একটু ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—তা সকলের ত সমান অবস্থা নয়, ভগবান্ আপনার মত ঐশ্বর্য্য কয় জনকে দিয়াছেন? আমরা গরু কোথা পাব বল? যা পাই তাইতে ছেলে মানুষ করিতে হয়।

একটু হৃষ্ট হইয়া গৃহিণী বলিলেন,—

তা ত বটেই। তা কি করিবে বাছা, যেমন করে পার ছেলে দুটিকে মানুষ কর। তা যখন যা দরকার হবে আমার কাছে এস, আমার বাড়ীতে দুধের অভাব নেই, যখন চাইবে তখনই পাবে।

বামীর মা। তা বই কি, এ সংসারে কি কিছুর অভাব আছে? দুধ দৈয়ের ছড়াছড়ি, আমরা খেয়ে উঠ্তে পারি নি,

দাসী চাকর খেয়ে উঠ্‌তে পারে না। তোমার যখন যা দরকার হবে, বাছা গিন্নীর কাছে এসে বলিও। গিন্নীর দয়ার শরীর।

শ্যামীর মা। হাঁ তা ভগবানের ইচ্ছায় যেমন ঐশ্বর্য্য তেমনি দান ধর্ম্ম। গিন্নীর হিল্লতে পাড়ার পাঁচজন খেয়ে বত্তাচ্ছে।

গৃ। তোমার স্বামীর একটা চাকরি টাকৃরি হল? বাবুর কাছে এসেছিল না।

বিন্দ্। হ্যাঁ এসেছিলেন, তা এখনও কিছু হয় নাই, বাবু বলেছেন একটা কিছু করে দিবেন। তা আপনারা মনোযোগ করিলে চাকরি পেতে কতক্ষণ?

গৃ। হাঁ তা বাবুর সাহেব মহলে ভারি মান, তাঁর কথা কি সাহেবরা কাট্‌তে পারে? ঐ সে দিন বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ীর ছোঁড়াটাকে একটা সরকারী করে দিয়েছেন, বামুণের ছেলেটা হেঁটে হেঁটে মরিত, খেতে পাইত না, তাই বলিলাম ছেলেটার কিছু একটা করে দাও। বাবু তখনই সাহেবদের বলে একটা চাকুরি করে দিলেন। আর ঐ মিত্রদের বাড়ীর ছোকরাটা সেইখানে থাকে, বাজার টাজার করে; তার মা তিন মাস ধরে আমার দোরে হাঁটাহাঁটি করিল; তার বৌ একদিন আমার কাছে কেঁদে পড়ল, যে সংসারে চাল ডাল নেই, খেতে পায় না। তা কি করি, তারও একটা চাকৃরি করে দিলাম। তবে কি জান বাছা, এখন সব ঐ রকম হয়েছে, পয়সাত কারও নাই, সবাই কাঙ্গাল, সবাই খাবার জন্যে লালায়িত, সবাই আমাকে এসে ধরে, আমি আর ব্যারাম শরীর নিয়ে পেরে উঠিনি। এ যেন কালীঘাটের কাঙ্গাল, হাড় জ্বালিয়ে তুলেছে।

তা বলিও তোমার স্বামীকে বাবুর কাছে আসতে, দেখা যাবে কি হয়।

দেড় ঘণ্টার পর গৃহিণীর তৈলমার্জ্জন কার্য্য সমাপ্ত হইল, তিনি স্নানের জন্য উঠিলেন।

বিন্দু সর্ব্বদাই ধীরস্বভাব, সংসারের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বড় মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে এখনও শিখেন নাই, এই প্রথম শিক্ষাটা তাঁহার একটু তিক্ত বোধ হইল। ধীরে ধীরে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া ভগিনী ও সন্তান দুটীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবীন বাবু।

কলিকাতায় আসিবার পর কয়েক সপ্তাহ সুধা বড় আহ্লাদে ছিল। যাহা দেখিত সমস্তই নূতন, যেখানে যাইত নূতন নূতন দৃশ্য দেখিত, বাড়ীতে যে কাজ করিতে হইত তাহাও অনেকটা নূতন প্রণালীতে, সুতরাং সুধার সকলই বড় ভাল লাগিত। কিন্তু কলিকাতার প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল পল্লীগ্রামের গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, বিন্দুদের ক্ষুদ্র বাটীতে বড় বাতাস আসিত না, কোঠা ঘরগুলি অতিশয় উত্তপ্ত হইত। সে কষ্টতেও সুধা কষ্ট বোধ করিত না, কিন্তু তাহার শরীর একটু অবসন্ন ও ক্ষীণ হইল, প্রফুল্ল চক্ষু দুটী একটু ম্লান হইল, বালিকার সুগোল বাহু দুটী একটু দুর্ব্বল হইল। তথাপি

বালিকা সমস্ত দিন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত অথবা বাল্যোচিত চাপল্যের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, সুতরাং হেম ও বিন্দু সুধার শরীরের পরিবর্ত্তন বড় লক্ষ্য করিলেন না।

বর্ষার প্রারম্ভে, কলিকাতার বর্ষার বায়ুতে সুধার জ্বর হইল। একদিন শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইল, বৈকালে বালিকা কোনও কায কর্ম্ম করিতে পারিল না, শয়ন ঘরে একটী মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু সে ঘরে আসিয়া দেখিলেন বালিকা তখনও শুইয়া রহিয়াছে। বলিলেন,—

এ কি সুধা, এ অবেলায় শুইয়া কেন ? অবেলায় ঘুমাইলে অসুখ করিবে, এস ছাতে যাই।

সুধা। না দিদি, আমি আজ ছাতে যাব না।

বিন্দু। কেন আজ অসুখ কর্‌ছে নাকি ? তোমার মুখ খানি একেবারে শুখিয়ে গিয়াছে যে।

সুধা। দিদি আমার গা কেমন কর্‌ছে, আর একটু মাথা ধরেছে।

বিন্দু সুধার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন গা অতিশয় উত্তপ্ত, কপাল গরম হইয়াছে। বলিলেন সুধা তোমার জ্বরের মত হইয়াছে যে। তা মেজেয় শুইয়া কেন, উঠে বিছানায় শোও, আমি বিছানা করিয়া দিতেছি।

সুধা। না দিদি এ অসুখ কিছু নয়, এখনই ভাল হয়ে যাবে, আমি এখানে বেশ আছি, আর উঠতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।

বিন্দু। না ব'ন্ উঠে শোও, তোমার জ্বরের মতন করেছে, মাথা ধরেছে, মাটীতে কি শোয় ?

বিন্দু বিছানা করিয়া দিলেন, ভগিনীকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইলেন, এবং আপনি পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে হেম ও শরৎ আসিলেন, অনেকক্ষণ উভয়ে বিছানার কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা হইয়া গেল, তখন বিন্দু হেমের জন্য ভাত বাড়ীতে গেলেন। শরৎকেও ভাত খাইতে বলিলেন, শরৎ বলিলেন বাড়ীতে গিয়া খাইবেন।

ভাত বাড়া হইল, হেম ভাত খাইতে গেলেন, শরৎ একাকী সেই ক্লান্ত বালিকার পার্শ্বে বসিয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বালিকার শরীর তখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, চক্ষু দুটী রক্ত বর্ণ হইয়াছে, বালিকা যাতনায় এপাশ ওপাশ করিতেছে, কেবল জল চাহিতেছে, আর অতিশয় শিরোবেদনার জন্য এক একবার কাঁদিতেছে। শরৎ সযত্নে চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন, মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, রোগীর শুষ্ক ওষ্ঠে এক এক বিন্দু জল দিয়া আপন বস্ত্র দিয়া ওষ্ঠ দুটী মুছাইয়া দিলেন।

হেম শীঘ্র খাইয়া আসিলেন, অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া শরৎকে বাটী যাইতে বলিলেন। শরৎ দেখিলেন সুধার রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তিনি সে দিন রাত্রি তথায় থাকিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন।

বিন্দুও খাইয়া আসিলেন, শরৎ বলিলেন,—

বিন্দুদিদি, আজ আমি এখানে থাকিব, তোমাদের হাঁড়ীতে যদি চারটী ভাত থাকে, আমার জন্য রাখিয়া দাও।

বিন্দু। ভাত আছে, আজ সুধার জন্য চাল দিয়াছিলাম, তা সুধা ত খেলে না, ভাত আছে। 'কিন্তু তুমি কেন রাত জাগিবে, আমরা দুই জনে আছি, সুধাকে দেখিব এখন, তুমি বাড়ী যাও, রাত দুপুর হয়েছে।

শরৎ। না বিন্দুদিদি, তোমার ছোট ছেলেটির অসুখ করেছে তাকেও তোমাকে দেখিতে হবে, আর হেম বাবু আজ অনেক হেঁটেছেন, রাত্রিতে একটু না ঘুমালে অসুখ করিবে। তা আমরা দুই জনে থাকিলে পালা করিয়া জাগিতে পারিব।

বিন্দু। তবে তুমি ভাত খেয়ে এস, তোমার জন্য ভাত বেড়ে দি।

শরৎ। ভাত বেড়ে এই ঘরের এক কোনে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও আমি একটু পরে খাব।

বিন্দু। সে কি? ভাত কড়কড়ে হয়ে যাবে যে। অনেক রাত হয়েছে, কখন খাবে?

শরৎ। খাব এখন বিন্দুদিদি, আমি ঠাণ্ডা ভাতই ভাল বাসি, তুমি ভাত রেখে দাও।

বিন্দু রান্নাঘরে গেলেন, ভাত ব্যঞ্জনাদি থালা করিয়া সাজাইয়া আনিয়া সেই ঘরের কোনে রাখিয়া ঢাকা দিলেন। তাঁহার ছেলে দুইটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের শোয়াইলেন। অন্য দিন সুধা বিন্দুর সঙ্গেও শিশু দুটীর সঙ্গে এক খাটে শুইতেন, আজ তাহা হইল না। আজ হেম বাবুর নিকট শিশু দুইটীকে শোয়াইয়া বিন্দু ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, সুধার মাথার কাছে তখনও শরৎ বসিয়া নিঃশব্দে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

শরৎ। হেম বাবু আপনি এখন একটু ঘুমান, আবার ও রাত্রিতে আমি আপনাকে উঠাইয়া দিয়া আমি একটু শুইব। সুধার গা অতিশয় তপ্ত হইয়াছে বড় ছট্ ফট্ করিতেছে, এক-জন বসিয়া থাকা ভাল। বিন্দুদিদি একা পারিবেন না।

হেমচন্দ্র শয়ন করিলেন। বিন্দু ও শরৎ রোগীর শয্যায় একবার বসিয়া একবার বালিসে একটু ঠেসান দিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। রোগীর আজ নিদ্রা নাই, অতিশয় ছট্‌ফট্ করিতেছে, শিরোবেদনায় অধীর হইয়া দিদির গলায় হাত জড়াইয়া এক একবার কাঁদিতেছে, তৃষ্ণায় অধীর হইয়া বার বার জল চাহিতেছে। শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই শুষ্ক ওষ্ঠে জল দিতে লাগিলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় বিন্দু অতিশয় জেদ করাতে শরৎ উঠিয়া গিয়া ভাত খাইলেন। তখন সুধার রোগের একটু উপশম হইয়াছে, শরীরের উত্তাপ ঈষৎ কমিয়াছে, যাতনার একটু লাঘব হওয়ায় বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিন্দু বলিলেন শরৎ বাবু, তুমি এখন বাড়ী যাও, সুধা একটু ঘুমাইয়াছে, তুমি শোওগে সমস্ত রাত্রি জাগিও না, অসুখ করিবে

শরৎ। বিন্দুদিদি, তোমার কি সমস্ত রাত্রি জাগা ভাল, তুমি সমস্ত দিন সংসারের কায করিয়াছ, আবার কাল সমস্ত দিন কায করিতে হবে। আমার কি, আমি না হয় কাল কলেজে নাই গেলাম।

বিন্দু। না শরৎ বাবু, আমাদের রাত্রি জাগা অভ্যাস আছে, ছেলের ব্যারাম হয়, কিছু হয়, সর্ব্বদাই আমরা রাত্রি

জাগিতে পারি, আমাদের কিছু হয় না। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের সমস্ত রাত্রি জাগা সয় না, আমার কথা রাখ, বাড়ী যাও। আবার কাল সকালে না হয় এসে দেখে যেও।

সুধা তখন নিদ্রা যাইতেছে, নিদ্রার নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসে বালিকার হৃদয় স্ফীত হইতেছে। শরৎ একটু নিরুদ্বেগ হইলেন; বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন, নিঃশব্দে নৈশ পথ দিয়া আপন বাটীতে যাইয়া প্রাতে ৪ ঘটীকার সময় শয্যায় শয়ন করিলেন।

ছয়টার সময় উঠিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার পরিচিত নবীনচন্দ্র নামক একজন ডাক্তারের নিকট গেলেন। তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে সম্প্রতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং ভবানীপুরেই তাঁহার বাটী, ভবানীপুর অঞ্চলে একটু পসার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী, মনোযোগী, বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য, কিন্তু ডাক্তারির পসার এক দিনে হয় না, কেবল গুণেও হয় না, সুতরাং নবীন বাবুর এখনও কিছু পসার হয় নাই। তাঁহার জেষ্ঠ্য ভ্রাতা চন্দ্রনাথ বাবু ভবানীপুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ উকিল, এবং চন্দ্র বাবুর সহায়তায় নবীন একটী ঔষধালয় খুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও লাভ অল্প, লোকসানের সম্ভাবনাই অধিক। এ জগতে সকলেই আপন আপন চেষ্টা করিতেছে, তাহার মধ্যে একজন যুবকের অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য, চারি দিকেই পথ অবরুদ্ধ, সকল পথই জনাকীর্ণ। তথাপি নবীন বাবু পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, পরিশ্রম ও যত্ন ও গুণ দ্বারা ক্রমে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবেন স্থিরসঙ্কল্প করিয়া ধীরচিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন। দুই একটী

বাড়ীতে তাঁহার বড় যশ হইয়াছিল, যাহাদিগের বাড়ীতে তাঁহাকে দুই চারিবার ডাকা হইয়াছিল, তাহারা অন্য চিকিৎসক আনাইত না।

সাতটার সময় শরৎ নবীন বাবুকে লইয়া হেম বাবুর বাড়ী পঁহুছিলেন। নবীন বাবু অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া সুধাকে দেখিলেন। জ্বর তখন কমিয়াছে কিন্তু তাপযন্ত্রে তখনও ১০১ দাগ দেখা গেল; নাড়ী তখন ১২০। অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর।

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিলেন? রাত্রি অপেক্ষা অনেক জ্বর কমিয়াছে, আজ উপবাস করিলে জ্বর ছাড়িয়া যাইবে বোধ হয়?

নবীন। বোধ হয় না। আমি রিমিটাণ্ট জ্বরের সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি। এখন একটু কমিয়াছে কিন্তু এখনও বেশ জ্বর আছে, দিনের বেলা আবার বাড়াই সম্ভব।

হেম একটু ভীত হইলেন। সেই সময়ে ভবানীপুরে অনেক রিমিটাণ্ট জ্বর হইতেছিল, অনেকের সেই জ্বরে মৃত্যু হইতেছিল। বলিলেন তবে কি কয়েক দিন ভুগিবে?

নবীন। এখনও ঠিক বলিতে পারি না, আর একবার আসিয়া দেখিলে বলিব। বোধ হইতেছে রিমিটাণ্ট জ্বর, তাহা হইলে ভুগিতে হইবে বৈকি। কিন্তু আপনারা কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।

এই বলিয়া একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন এই ঔষধটী দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন, বৈকাল পর্য্যন্ত খাওয়াইবেন, বৈকালে আমি আবার আসিব। আর রোগীর

মাথা বড় গরম হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, সমস্ত দিন মাথায় বরফ দিবেন, তৃষ্ণা পাইলে বরফ খাইতে দিবেন, কিম্বা দুই একখানি আকের কুচি দিবেন। আর এরারুট কিম্বা নেস্‌লের দুগ্ধ খুব খাওয়াইবেন, দিনে তিন চারি বার খাওয়াইবেন। এ পীড়ায় খাদ্যই ঔষধ।

শরতের সহিত বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া নবীন বলিলেন,—শরৎ তোমাকে একটি কায করিতে হইবে।

শরৎ। বলুন।

নবীন। হেম বাবুকে অবকাশ অনুসারে জানাইবেন, এ চিকিৎসার জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করিব না।

শরৎ। কেন?

নবীন। তোমার সহিত আমার অনেক দিন হইতে বন্ধুত্ব, তোমাদের গ্রামের লোকের নিকট আমি অর্থ গ্রহণ করিব না। হেম বাবুর অধিক টাকা কড়ি নাই, তাঁহার নিকট আমি অর্থ লইব না।

শরৎ। হেম বাবু দরিদ্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানি,—আপনি বিনা বেতনে চিকিৎসা করা অপেক্ষা আপনি অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি সত্য সত্যই তুষ্ট হইবেন।

নবীন। না শরৎ, আমার কথাটী রাখ, আমি যাহা বলিলাম তাহা করিও। এ ব্যারাম সহসা ভাল হইবে আমি প্রত্যাশা করি না, আমাকে অনেক দিন আসিতে হইবে, সর্ব্বদা আসিতে হইবে। আমি যদি বিনা অর্থে আসিতে পারি তবে যখন আবশ্যক বোধ হইবে তখনই নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারিব।

শরৎ। নবীনবাবু, আপনি যাহা বলিলেন তাহা করিব। কিন্তু আপনার সময়ের মূল্য আছে, অর্থেরও আবশ্যক আছে, বিনা পারিতোষিকে সকল রোগীকে দেখিলে আপনার ব্যবসা চলিবে কিরূপে ?

নবীন। না শরৎ, আমার সময়ের বড় মূল্য নাই, তুমি জান আমার এখনও অধিক পসার নাই, বাড়ীতে বসিয়া থাকি। আর আমার পসার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কি হয় তাহা আমি জানি না, কিন্তু এই একটী রোগের চিকিৎসায় অর্থ গ্রহণ না করিলে তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বন্ধুর জন্য একটী বন্ধুর কায কর, আমার এই কথাটী রাখিও।

শরৎ সম্মত হইলেন, নবীন চলিয়া গেলেন। শরৎ তখন ঔষধ, পথ্য, বরফ, আক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিলেন। সে দিন রোগীর শয্যার নিকট থাকিবেন, অনেক জেদ করিলেন, কিন্তু হেম সে কথা শুনিলেন না, শরৎকে জোর করিয়া কলেজে পাঠাইলেন।

অপরাহ্নে শরৎ নবীনবাবুর সহিত আবার আসিলেন। নবীনবাবু রোগীকে দেখিয়াই বুঝিলেন তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইয়াছে, এ স্পষ্ট রিমিটাণ্ট জ্বর। রোগীর চক্ষু দুটী আরও রক্তবর্ণ হইয়াছে, রোগীর মাথায় সমস্ত দিন বরফ দেওয়াতেও উত্তাপ কমে নাই, সুধার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ মুখখানি জ্বরের আভায় রঞ্জিত, এবং সুধা সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ করিয়াছে, এপাশ ওপাশ করিয়াছে, কখনও শুইয়াছে, কখনও বায়না করিয়া দিদির গলা ধরিয়া বসিয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। নবীনবাবু

সভয়ে দেখিলেন নাড়ী প্রায় ১৫০, তাপযন্ত্র দেখিলেন তাপ ১০৫ ডিগ্রি!

ঔষধ ঘন ঘন খাওয়াইতে বারণ করিলেন, আর একটী ঔষধ লিখিয়া দিলেন ও বলিলেন যে সেটী দিনের মধ্যে তিন বার, এবং রাত্রিতে যখন আপনাআপনি ঘুম ভাঙ্গিবে তখন একবার খাওয়ালেই হইবে। খাদ্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, শরৎকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন "এ রোগে খাদ্যই ঔষধ, সর্ব্বদা খাদ্য দিবে, যথেষ্ট খাওয়াইতে ক্রটী হইলে রোগী বাঁচিবে না।"

কয়েক দিন পর্য্যন্ত সুধা সেই ভয়ঙ্কর জ্বরে যাতনা পাইতে লাগিল। শরৎ তখন হেমের কথা আর মানিলেন না, পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিবা রাত্রি হেমের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন, ঔষধ আনিয়া দিতেন, নিজ হস্তে সাবু বা দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। বিন্দু সংসারের কার্য্যবশতঃ কখন কখন রোগীর শয্যা পরিত্যাগ করিলে শরৎ তথায় নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন, হেমচন্দ্র শ্রান্তি ও চিন্তা বশতঃ নিদ্রিত হইলে শরৎ অনিদ্র হইয়া সেই রোগীর সেবা করিতেন। জ্বরের প্রচণ্ড উত্তাপে বালিকা ছটফট করিলে শরৎ আপনার শ্রান্তি ও নিদ্রা ও আহার ভুলিয়া গিয়া নানারূপ কথা কহিয়া নানারূপ গল্প করিয়া, নানা প্রবোধ বাক্য ও আশ্বাস দিয়া সুধাকে শান্ত করিতেন, জ্বরের অসহ্য যাতনায় ও সুধা সেই কথা শুনিয়া একটু শান্তি লাভ করিত। কখনও বালিকার ললাটে হাত বুলাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে নিদ্রিত করিতেন, কখন তাহার অতি ক্ষীণ দুর্ব্বল রক্তশূন্য গৌরবর্ণ বাহুলতা বা অঙ্গুলি গুলি

হস্তে ধারণ করিয়া রোগীকে তুষ্ট করিতেন ; মাথা উষ্ণ হইলে শরৎ সমস্ত দিন বরফ ধরিয়া থাকিতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অর্দ্ধস্ফুটিত শব্দগুলি শরতের কর্ণে অগ্রে প্রবেশ করিত, বালিকা শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়ে সেই শরতের হস্ত হইতে এক বিন্দু জল বা দুইখানি আকের কুচি পাইত, নিদ্রা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই শরতের হস্ত হইতে পথ্য পাইত।

১০। ১২ দিবসে সুধা অতিশয় ক্ষীণ হইয়া গেল, আর উঠিয়া বসিতে পারিত না, চক্ষুতে ভাল দেখিতে পাইত না, মুখখানি অতিশয় শীর্ণ, কিন্তু তথনও জ্বরের হ্রাস নাই। প্রাতঃকালে ১০২ দাগের বড় কম হয় না, প্রত্যহ বৈকালে ১০৫ দাগ পর্য্যন্ত উঠে। নবীন বাবু একটু চিন্তিত হইলেন, বলিলেন শরৎ, চতুর্দ্দশ দিবসে এ রোগের আরোগ্য হওয়া সম্ভব, যদি না হয় তবে সুধার জীবনের একটু সংশয় আছে। সুধা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, আর অধিক দিন এ পীড়া সহ্য করিতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না।

ত্রয়োদশ দিবসে নবীন বাবু সমস্ত দিন সেই বাটীতে থাকিয়া রোগীর রোগ লক্ষ্য করিলেন। বৈকালে জ্বর একটু কম হইল, কিন্তু সে অতি সামান্য উন্নতি, তাহা হইতে কিছু ভরসা করা যায় না। শরৎকে বলিলেন আজ রাত্রিতে তুমি রোগীকে ভাল করিয়া দেখিও, কল্য ভোরের সময় তাপমান যন্ত্রে শরীরের কত উত্তাপ লক্ষ্য করিও। যদি ৯৮ হয়, যদি ৯৯ হয়, যদি ১০০ দাগের কম হয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ গ্রেন কুইনাইন দিও, ৮টার মধ্যেই আমি আসিব। যদি কাল বা পরশ্ব এ জ্বরের উপশম না হয় সুধার জীবনের সংশয় আছে।

শরৎ এ কথা বিন্দুকে বলিলেন না, হেমকেও বলিলেন না। সন্ধ্যার সময় বাটী হইতে খাইয়া আসিলেন এবং সুধার শয্যার পার্শ্বে বসিলেন ;—সে দিন সমস্ত রাত্রি তিনি সেই স্থান হইতে উঠিলেন না ;—এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রায় চক্ষু মুদিত করিলেন না।

উষার প্রথম আলোকচ্ছটা জানালার ভিতর দয়া অিল্ল অল্প দেখা গেল। তখন সে ঘর নিঃশব্দ। হেমচন্দ্র ঘুমাইয়াছেন, বিন্দু সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ছেলে দুইটার পাশে শুইয়া পড়িয়াছেন, ছেলে দুইটী নিদ্রিত। সুধা প্রথম রাত্রিতে ছট্ ফট্ করিয়া শেষ রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছে। ঘরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপের স্তিমিত আলোক রোগীর শীর্ণ শুষ্ক মুখের উপর পড়িয়াছে।

শরৎ ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে সেই অতি শীর্ণ বাহুটী আপন হস্তে ধারণ করিলেন,—নাড়ী এত চঞ্চল, তিনি গণনা করিতে পারিলেন না। তখন তাপযন্ত্র লইলেন, ধীরে ধীরে তাপযন্ত্র বসাইলেন,—নিঃশব্দে ঘড়ির দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় জোরে আঘাত করিতেছিল।

টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া ঘড়ির শব্দ হইতে লাগিল, এক মিনিট, দুই মিনিট, চারি মিনিট, পাঁচ মিনিট হইল ; শরৎ তাপযন্ত্র তুলিয়া লইলেন। প্রদীপের নিকটে গেলেন, তাঁহার হৃদয় আরও বেগে আঘাত করিতেছে, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে প্রথমে কিছু দেখিতে পাই-লেন না। হস্ত দ্বারা ললাট হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ সরাইলেন;

ললাটের স্বেদ অপনয়ন করিলেন, নিদ্রাশূন্য চক্ষুদ্বয় একবার, দুইবার মুছিলেন, পুনরায় তাপ যন্ত্রের দিকে দেখিলেন।

শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রদীপের আলোকে ঠিক বিশ্বাস হয় না, বোধ হয় তাঁহার দেখিতে ভ্রম হইয়াছে। ভরসায় ভর করিয়া গবাক্ষের নিকটে যাইলেন,—দিবালোকে তাপযন্ত্র আবার দেখিলেন। জ্বর কল্য প্রাতঃকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তাপযন্ত্র ১০৩ ডিগ্রি দেখাইতেছে! ললাটে করাঘাত করিয়া শরৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

শব্দে বিন্দু উঠিলেন। ভগিনীর নিকট গিয়া দেখিলেন, সুধা নিদ্রা যাইতেছে; গবাক্ষের কাছে আসিয়া দেখিলেন শরৎ বাবু ভূমিতে শুইয়া আছেন। ভাবিলেন, আহা শরৎ বাবু রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, মাটীতে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; আহা আমাদের জন্য কত কষ্টই সহ্য করিতেছেন। শরৎ কথা কহিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে ভীষণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, কেন বিন্দুকে সে ব্যথা দিবেন?

আর এক সপ্তাহ জ্বর রহিল। তখন সুধা এত দুর্ব্বল হইয়া গেল যে এক পাশ হইতে অন্য পাশ ফিরিতে পারিত না, মাথা তুলিয়া জল খাইতে পারিত না, কষ্টে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কখন এক আধটী কথা কহিত, খেংরা কাঠির ন্যায় অঙ্গুলিগুলি একটু একটু নাড়িত। সুধার মুখের দিকে চাওয়া যাইত না, অথবা নৈরাশ্যে জ্ঞান হারাইয়া নিশ্চেষ্ট পুত্তলির ন্যায় বসিয়া শরৎ সেই মুখের দিকে সমস্ত রাত্রি চাহিয়া থাকিত। গরিবের ঘরের মেয়েটী শৈশবে অন্ন বস্ত্রের কষ্টেও মাতৃস্নেহে জীবন ধারণ করিয়াছিল, অকালে বিধবা হইয়াও ভগিনীর স্নেহে সেই ক্ষুদ্র পুষ্পটী

কয়েক দিন পল্লিগ্রামে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অদ্য সে পুষ্প বুঝি আবার মুদিত হইয়া নম্রশির নত করিল। দরিদ্রা বালিকার ক্ষুদ্র জীবন-ইতিহাস বুঝি সাঙ্গ হইল।

বিংশ দিবস হইতে নবীনও দিবারাত্রি হেমের বাটীতে রহিলেন। শরৎকে গোপনে বলিলেন শরৎ তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না, আর দুই এক দিনের মধ্যে যদি এই জ্বর না ছাড়ে, তবে ঐ দুর্ব্বল মৃতপ্রায় শরীরকে জীবিত রাখা মনুষ্য-সাধ্য নহে। আর দুই তিন দিন আমি দেখিব, তাহার পর আমাকে বিদায় দিও। আমার যাহা সাধ্য করিলাম, জীবন দেওয়া না দেওয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছা।

দ্বাবিংশ দিবসের সন্ধ্যার সময় জ্বর একটু হ্রাস হইল, কিন্তু তাহাতেও কিছু ভরসা করা যায় না। রাত্রিতে দুই জনই শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, সে দিন সমস্ত রাত্রি সুধা নিদ্রিতা। এ কি আরোগ্যের লক্ষণ, না দুর্ব্বলতায় মৃত্যুর পূর্ব্ব চিহ্ন?

অতি প্রত্যূষে শরৎ আবার তাপযন্ত্র বসাইলেন। তাপযন্ত্র উঠাইয়া গবাক্ষের নিকট যাইলেন। কি দেখিলেন জানি না, ললাটে করাঘাত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন!

নবীনচন্দ্র ধীরে ধীরে সেই যন্ত্র শরতের হস্ত হইতে লইলেন, বিপদ্‌কালে ধীরতাই চিকিৎসকের বীরত্ব। তাপযন্ত্র দেখিলেন,—আস্তে আস্তে শরৎকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন।

শরৎ হতাশের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে বালিকার পরমায়ু শেষ হইয়াছে?

নবীন। পরমেশ্বর বালিকাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন, এযাত্রা সে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

তাপযন্ত্র দেখিতে শরৎ ভুল করিয়াছিলেন, নবীন দেখাইলেন তাপযন্ত্রে ৯৮ ডিগ্রি লক্ষিত হইতেছে। সুধার শরীরে হাত দিয়া দেখাইলেন জ্বর নাই, জ্বর উপশম হওয়ায় ক্ষীণ বালিকা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে।

ললাট হইতে কেশ গুচ্ছ সরাইয়া প্রাতঃকালে শরৎ বাড়ী আসিলেন। এক সপ্তাহ তিনি প্রায় রাত্রিতে নিদ্রা যান নাই, তাঁহার মুখখানি শুষ্ক, নয়ন দুটী কালিমা-বেষ্টিত,—কিন্তু তাঁহার হৃদয় শান্তি-নিকেতন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ বাবু।

পীড়া আরোগ্য হইলেও সুধা কয়েক দিন শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। শয্যা হইতে উঠিয়া কয়েক দিন ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না। তাহার পর অল্প অল্প করিয়া ঘরে বারাণ্ডায় বেড়াইত, অথবা শরতের সাহায্যে ছাদে গিয়া একটু বসিত। পক্ষীর ন্যায় সেই লঘু ক্ষীণ শরীরটী শরৎ অনায়াসে আপনার দুই হস্তে উঠাইয়া ছাদে লইয়া যাইতেন, আবার ছাদ হইতে নামাইয়া আনিতেন।

এক্ষণে শরৎ পুনরায় কলেজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রতিদিন বৈকালে হেমের বাটীতে আসিতেন, সুধাকে অনেক কথা, অনেক গল্প বলিয়া প্রফুল্ল রাখিতেন, রাত্রি নয়টার সময় সুধা শয়ন করিলে বাটী আসিতেন। সুধাও প্রতিদিন শরৎকে প্রতীক্ষা করিত, শরতের আগমনের পদধ্বনি প্রথমে সুধার

কর্ণে উঠিত, শরৎ সিঁড়ি হইতে উঠিতে না উঠিতে প্রথমেই সেই ক্ষীণ কিন্তু শান্ত, কমনীয়, হাস্যরঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া হৃদয় তৃপ্ত করিতেন।

ছাদে গিয়া শরৎকে অনেক্ষণ অবধি সুধাকে অনেক গল্প শুনাইতেন। তালপুখুর গ্রামের গল্প, বাল্যকালের গল্প, সুধার দরিদ্রা মাতার গল্প, শরতের মাতার গল্প, শরতের ভগিনীর গল্প, অনেক বিষয়ের অনেক গল্প করিতেন। সুধাও একাগ্রচিত্তে সেই মধুর কথাগুলি শুনিত, শরতের প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রোগে বা শোকে যখন আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ ক্ষীণ হয়, তখনই আমরা প্রকৃত বন্ধুর দয়া ও স্নেহের সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করিতে পারি। অন্য সময়ে গর্ব্ব করিয়া যে পরামর্শ শুনি না, সে সময়ে সেই পরামর্শ হৃদয়ে স্থান পায়, অন্য সময়ে যে স্নেহ আমরা তুচ্ছ করি, সে সময়ে সেই স্নেহে আমাদিগের হৃদয় সিক্ত হয়, কেন না হৃদয় তখন দুর্ব্বল, স্নেহের বারি প্রত্যাশা করে। লতা যেরূপ সবল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সুধা শরতের অমৃত বচনে সেইরূপ শান্তিলাভ করিত। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুধা সেই অমৃতমাখা কথাগুলি শ্রবণ করিত, সেই স্নেহময় মধুর প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, অথবা ক্লান্ত হইয়া সেই মধুর হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিত। যত্নের সহিত শরতেরও স্নেহ বাড়িতে লাগিল, তিনি বালিকার ক্ষীণ বাহুলতা স্বহস্তে ধারণ করিয়া বালিকার মস্তক আপন বক্ষে স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

একদিন উভয়ে এইরূপে ছাদে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হেমচন্দ্র ছাদে আসিলেন ও শরৎকে বলিলেন,—

শরৎ, আজ চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যাবে না ?

শরৎ। হাঁ ; সে কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার কোথাও যাইতে রুচি নাই, না গেলে হয় না ?

হেম। না, সুধার পীড়ার সময় চন্দ্র বাবু ও নবীন বাবু আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন, তাঁহাদের বাড়ী না গেলেই নয়। আইস এইক্ষণই যাইতে হইবে।

শরৎ ও সুধা উঠিলেন। হেম সুধাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে সিঁড়ি নামাইলেন, তাহাকে ঘরে শয়ন করাইয়া উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে হেম বলিলেন,—

শরৎ, এই পীড়ায় তুমি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছ, সে ঋণ জীবনে আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। কিন্তু এই কারণে তোমার পড়া শুনার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় মাসাবধি কলেজে যাও নাই, এক্ষণও তোমার ভাল পড়া হইতেছে না। একটু মন দিয়া পড়, তোমার পরীক্ষার বড় বিলম্ব নাই।

শরৎ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—হাঁ আর অল্পই সময় আছে, এখন একটু মন দিয়া লেখা পড়া আবশ্যক। সুধা এখন ভাল হইয়াছে, কিন্তু বিন্দুদিদিকে বলিবেন যখন অবকাশ হইবে, ছাদে লইয়া গিয়া প্রত্যহ গল্প করিয়া সুধার মনটী প্রফুল্ল রাখেন। নবীন বাবু বলিয়াছেন, সুধার মন প্রফুল্ল থাকিলে শীঘ্র শরীরও পুষ্ট হইবে। এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে চন্দ্রনাথ বাবুর বাসায় পঁহুছিলেন।

নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রনাথ বাবু ভবানীপুরের মধ্যে

একজন সুযোগ্য সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। তাঁহার বয়স ত্রিংশৎ বৎসরের বড় অধিক হয় নাই; তিনি কৃতবিদ্য, সৎকার্য্যে উৎসাহী, এবং এই বয়সেই একজন হাইকোর্টের গণ্য উকিল হইয়াছিলেন। তিনি সবর্দ্ধন মিউনিসিপালিটীর একজন মাননীয় সভ্য ছিলেন, এবং সবর্দ্ধের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

তাঁহার বাড়ী বৃহৎ নহে, কিন্তু পরিষ্কার এবং সুন্দররূপে নির্ম্মিত ও রক্ষিত। বাহিরে দুইটী একতালা বৈঠকখানা ছিল, বড়টীতে চন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় টেবিল, চৌকি, পুস্তক পরিপূর্ণ দুইটী বুকশেল্ফ, কয়েকখানি সুরুচিসম্মত ছবি। মেজে "মেটিং" করা এবং সমস্ত ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেখিলেই বোধ হয় কোন কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ কার্য্যপ্রিয় যুবকের কার্য্যস্থান, পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খল।

টেবিলের উপর দুইটি শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে; চন্দ্র বাবু, নবীন, হেম ও শরৎ অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ গম্ভীর ও অল্পভাষী, কিন্তু অতিশয় ভদ্র, সুধার পীড়ার সময় তিনি যথাসাধ্য হেমের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই ভদ্রোচিত কথা দ্বারা হেমকে তুষ্ট করিতেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র বলিলেন, কলিকাতায় আসিয়া আপনাদিগের ন্যায় কৃতবিদ্য লোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া বড় প্রীত হইলাম। আমার চিরকালই পল্লি-গ্রামে বাস, পল্লিগ্রামে কৃতবিদ্য লোক বড় অল্প, আপনাদিগের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ তাহাও অল্প দেখিতে পাই, আপনাদিগের ন্যায় দেশহিতৈষিতাও অল্প দেখিতে পাই।

চন্দ্র। হেমবাবু, দেশহিতৈষিতা কেবল মুখে। অথবা হৃদয়েও যদি সেরূপ বাঞ্ছা থাকে তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় না। আমরা ক্ষুদ্র লোক, দেশের জন্য কি করিব? সে ক্ষমতা কৈ। তাহার উপযুক্ত স্থান, কালই বা কৈ?

হেম। যাহার যে টুকু ক্ষমতা সে সেই টুকু করিলেই অনেক হয়। শুনিয়াছি আপনি সবর্ব্বন কমিটীর সভ্য হইয়া অনেক কায কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার জন্য অনেক প্রশংসা পাইয়াছেন।

চন্দ্র। কায কি? কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহা বলেন তাহাই হয়, আমরাও তাহাই নির্ব্বাহ করি। কলিকাতার অধিবাসীগণ সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে, লর্ড রিপন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান নগরীতে সেই ক্ষমতা দিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন; আমরাও সেই ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিতেছি, পাই কি না সন্দেহ।

হেম। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষমতা আমরা অবশ্যই পাইব, এবং পাইলে আমাদের বিস্তর লাভ।

চন্দ্রনাথ। পাইলে আমাদের যথেষ্ট লাভ তাহার সন্দেহ কি? আমরা দেশশাসন কার্য্য বহুশতাব্দী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি, গ্রামশাসন প্রথাও ভুলিয়াছি, এক্ষণে দলাদলি করা ও পরস্পরকে গালি দেওয়া ভিন্ন আমাদের জাতীয়ত্বের নিদর্শন নাই! ক্রমে আমরা উন্নত শিক্ষা পাইব, ক্রমে ক্ষমতা পাইব, আমার এরূপ স্থির বিশ্বাস। নিশার পর প্রভাত যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, শিক্ষার পর আমাদিগের ক্ষমতা বিস্তারও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

শরৎ। আপনার কথাগুলি শুনিয়া আমি তৃপ্ত হইলাম, আমারও হৃদয়ে এইরূপ আশা উদয় হয়। কিন্তু আমাদিগের এই কঠোর চেষ্টাতে কে একটু সহানুভূতি করে? আমাদিগের উচ্চাভিলাষ অন্যের বিদ্রূপের বিষয়, আমাদিগের চেষ্টার বিফলতা তাঁহাদিগের আনন্দের বিষয়, আমাদিগের জাতীয় চেষ্টা, জাতীয় অভিলাষ, জাতীয় জীবন তাঁহাদিগের উপহাসের অনন্ত ভাণ্ডার। মৃতবৎ জাতি যখন পুনরায় জীবনলাভের জন্য একটু আশা করে, একটু চেষ্টা করে, তখন তাহারা কি অন্যের সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না?

চন্দ্রনাথ। শরৎ, তোমার বয়সে আমিও ঐরূপ চিন্তা করিতাম, ইংরাজী সংবাদ পত্রে একটী বিদ্রূপ দেখিলে ব্যথিত হইতাম। কিন্তু দেখ, সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ গুলি ফাঁপা মাল, দেখিতে বড় সুন্দর, তত মূল্যবান্ নহে। যদি সে গুলি দিতে অন্যের বড়ই কষ্ট হয়, তাঁহারা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখুন, আমাদের আবশ্যক নাই। যদি উপহাস করিতেই তাঁহাদিগের ভাল লাগে, তাঁহাদিগের উপহাসই আমাদিগের জাতীয় জীবনের বন্ধনীস্বরূপ হউক। শরৎ আমাদিগের ক্ষমতা নিজের যোগ্যতা ও সততার উপর নির্ভর করে, অন্য লোকের হস্তে নহে। আইস, আমরা কার্য্যদক্ষতা শিক্ষা করি, তাহা হইলে সহানুভূতি প্রতীক্ষা না করিয়া, উপহাস গ্রাহ্য না করিয়া, দিন দিন অগ্রসর হইব। আমাদিগের উন্নতির পথ অবারিত।

নবীন। আমারও বিশ্বাস আমরা ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছি, কিন্তু সে উন্নতি কত আস্তে আস্তে হইতেছে। রাজ-

নীতিরকথা ছাড়িয়া দিন, সমাজের কথা ধরুন। আমরা মুখে বা পুস্তকে কত বাদানুবাদ করি, কার্য্যে একটী সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে কত বিলম্ব হয়, পঞ্চাশৎ বৎসর আলোচনা ও বাগাড়ম্বরের পর একটী কুরীতি উঠে না, একটী সামাজিক সুরীতি স্থাপন হয় না।

চন্দ্র। নবীন, আমি এটী গুণ বলিয়া মনে করি, দোষ বলিয়া মনে করি না। যে সমাজ শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি পরিবর্ত্তন করিতে তৎপর হয়, সে সমাজ শীঘ্র বিপ্লবগ্রস্ত হয়। তুমি ফরাসীদের ইতিহাস বেশ জান, একশত বৎসর হইল ফরাসীরা একেবারে সমস্ত কুরীতি ত্যাগ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিল; তাহার ফল ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজবিপ্লব! শীঘ্র শীঘ্র সমাজের রীতি পরিবর্ত্তন করায় সমাজের লাভ নাই, বিশেষ ক্ষতি আছে।

নবীন। কিন্তু যে প্রথাগুলি এক্ষণে বিশেষ অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে, সে গুলি কি ত্যাগ করা বিধেয় নহে?

চন্দ্র। অনেক আলোচনা করিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়াই সে গুলির সংস্কার করা কর্ত্তব্য। আলোচনায়ও বিশেষ উপকার হয় বোধ হয় না; সমাজে জীবন থাকিলে লোকে আপনা আপনিই সুবিধা বুঝিয়া অনিষ্টকর নিয়মগুলি ত্যাগ করে। জীবিত সমাজের এই নিয়ম;—তাহার ক্রমশঃ সংস্কার আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

নবীন। আমিও সেই কথা বলিতেছিলাম, আমাদের সমাজেও সংস্কার হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের জীবন অতিশয় ক্ষীণ, সেই জন্য গতি অতিশয় অল্প। দেখুন, বাণিজ্য

সম্বন্ধে আমাদের কত অল্প উন্নতি হইতেছে। এবিষয়ে উন্নতিতে নূতন আইনের আবশ্যক নাই, রাজার অনুজ্ঞার আবশ্যক নাই, সমাজের রীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই, একটু চেষ্টা হইলেই হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কত বিরল। আপনাদিগের দেশের তুলা লইয়া আপনারা কাপড় নির্ম্মাণ্ করিতে পারিতেছি না, ইউরোপ হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্র আসিতেছে, তাঁতীদের দিন দিন দুরবস্থা হইতেছে।

হেম। কলে নির্ম্মিত কাপড়ের সহিত তাঁতীরা হাতে কায করিয়া কখনও যে পারিয়া উঠিবে এরূপ আমার বোধ হয় না। আমি পল্লীগ্রামে অনেক হাটে গিয়াছি, অনেক গরিব লোকের বাড়ী গিয়াছি। আমার মনে আছে পূর্ব্বে সকল ঘরেই চরকা চলিত, এক্ষণে গ্রামে একখানা চরকা দেখা যায় না। তাহার কারণ, উৎকৃষ্ট বিলাতি সূতা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। হাটে যে দেশী কাপড় ১৷৹ টাকায় বিক্রয় হয় সেইরূপ বিলাতি কাপড় ৸৵৹ আনায় বিক্রয় হয়। তাহাতে সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহারা অল্প মূল্যে ভাল কাপড় পরিতে পারে, কিন্তু তাঁতীরা হাতে কায করিয়া কখনও কলের কাযের সঙ্গে পারিবে তাহা বোধ হয় না।

নবীন। আমিও তাহাই বলিতেছি, সুসভ্য জগতে হাতের কায উঠিয়া যাইতেছে, এক্ষণে কলে কায করা ভিন্ন উপায় নাই। তবে আমরা বঙ্গদেশ এরূপ কলে আচ্ছন্ন করি না কেন? আমাদের কি সেটুকু উৎসাহ নাই, সেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি নাই?

চন্দ্র। নবীন, সে বিদ্যাবুদ্ধির অভাব নহে, সে অর্থের অভাব। বহু অর্থ না হইলে একটী কল চলে না। আর একটী আমাদের শিক্ষার অভাব আছে; আমরা পাঁচজনে মিলিয়া এখনও কায করিতে শিখি নাই, এই শিক্ষাই সভ্যতার প্রধান সহায়। দেখ বিদ্যায় আমাদের দেশে অনেকে উন্নত হইয়াছেন, ধনে অনেকে উন্নত, ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অনেকে উন্নত, রাজনীতিতে অনেকে উন্নত। বুদ্ধির অভাব নাই, কিন্তু পাঁচজনে মিলিয়া কায করা একটী স্বতন্ত্র শিক্ষা, সেটী আমরা এখনও শিখি নাই। পাঁচজন বিদ্বান একত্রে মিলিয়া একটী মহৎ চেষ্টা করিতেছেন এরূপ দেখা যায় না, পাঁচজন রাজনীতিজ্ঞ ঐক্য সাধন করিতে পারেন না, পাঁচজন ধনী মিলিয়া বাণিজ্য করেন এরূপ বিরল। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কিন্তু আমি ভরসা করি অন্য শিক্ষার সঙ্গে এ শিক্ষাও আমরা লাভ করিব, এ শিক্ষা লাভ না করিলে সভ্যতার আশা নাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে ভৃত্য আসিয়া বলিল আহার প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সকলেই বাড়ীর ভিতর আহার করিতে গেলেন।

আহারাদি সমাপন হইলে পুনরায় সকলে বাহিরে আসিলেন। আর ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়া হেম ও শরৎ বিদায় হইলেন।

শরৎ আপনার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, হেম চন্দ্রনাথ বাবুর কথাগুলি অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন। পথে সুন্দর চন্দ্রালোক পড়িয়াছে, নিশার বায়ু শীতল ও মনোহর, হেমচন্দ্র বেড়াইতে বেড়াইতে বালীগঞ্জের দিকে গিয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটী শকটের শব্দ পাইলেন। ফিরিয়া দেখিলেন দুইটী উজ্জ্বল আলোকযুক্ত একখানা বড় গাড়ী তীব্র বেগে আসিতেছে, বলবান্ শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয় যেন পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া উড়িয়া আসিতেছে, ফেটিন ঘর্ঘর শব্দে দরিদ্র হেমের পাশ দিয়া যাইয়া একটী বাগানের ফাটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর আবার আর একটা জুড়ি আসিল, দুইটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব এক বৃহৎ লেণ্ড লইয়া বিদ্যুৎ-বেগে সেই ফাটকে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার সময় নারী-কণ্ঠ-সম্ভূত খল খল হাস্যধ্বনি হেমের শ্রুতি পথে পঁহুছিল।

হেম একটু উৎসুক হইলেন, এবং সবিশেষ দেখিবার জন্য বাগানের ফাটকের কাছে আসিলেন। দেখিলেন ফাটকে রামসিংহ, ফতেসিংহ, বলবন্তসিংহ প্রভৃতি শ্মশ্রুধারী দ্বারবান্গণ সগর্ব্বে পদচারণ করিতেছে। বাগানের ভিতর অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি, দুই একটী সুন্দর জলাশয়। তাহার পর একটী উন্নত অট্টালিকা। অট্টালিকা ইন্দ্রপুরীতুল্য, তাহার প্রতি গবাক্ষ হইতে উজ্জ্বল আলোকরাশি বহির্ভূত হইতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে বাদ্যধ্বনি ও নারী-কণ্ঠ-সম্ভূত গীতধ্বনি গগণপথে উত্থিত হইতেছে।

হেম ধীরে ধীরে একজন দ্বারবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বাগান কার বাপু ?"

দ্বারবান্ দাড়ীতে একবার মোচড় দিয়া গোঁফে একবার তা দিয়া বলিল, "এ বাগান তুমি জানে না, মুলুক কা সব বড়া বড়া লোক জানে, তুমি জানে না ? তুমি কি নয়া আদমী আছে ?"

হেম। হাঁ বাপু, আমি নূতন মানুষ, এদিকে কখনও আসি নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দ্বারবান্। সোই হবে। এখানে সব কোই এ বাগান জানে। কলকাত্তাকা যেত্তা বড়া বড়া বাঙ্গালী আছে, জমীদার, উকিল, কৌঁসিলি, সব এ বাগানে আসে, সব কোই এ বাগান জানে।

হেম। তা হবে বাপু, আমি গরিব লোক আমি সে সব কথা কেমন কোরে জানব ?

দ্বারবান্। হাঁ সো ঠিক, তোমরা লায়েক আদমী এ বাগান জানে না। আজ বড়া নাচ হোবে, বহুত বাবু লোক আসেছে, বড়া তামাসা।

হেম। তা নাচ দিচ্চে কে ? বাগানটা কার ?

দ্বারবান্। ধনপুরকা জমিদার ধনঞ্জয় বাবু।

হেমের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

হা হতভাগিনী উমাতারা! ধনে যদি সুখ থাকিত, মর্ম্মর শোভিত ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদে যদি সুখ থাকিত, সাদা জুড়ি ও কাল জুড়িতে যদি সুখ থাকিত, তবে তুমি আজ হতভাগিনী কেন ?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধনঞ্জয় বাবু।

যে দিন রাত্রিতে হেমবাবু ধনঞ্জয় বাবুর বাগান দেখিয়া আসিলেন সেই দিন অবধি তিনি বড়ই চিন্তিত ও বিষণ্ণ রহিলেন। সহসা সে কথা বিন্দুকে খুলিয়া বলিতে পারিলেন

না, পাছে বিন্দু উমাতারার জন্য মনে ব্যথা পান ; এবং বিন্দুর নিকট হইতে কথাটা গোপন রাখিতেও তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইল। কি করিবেন ? কি উপায় অবলম্বন করিবেন ? হত-ভাগিনী উমাতারার সংবাদ কিরূপে লইবেন ? উমাতারার কোনওরূপ সহায়তা করা কি তাঁহার সাধ্য ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী যাবেন ঠিক করিলেন। ধনঞ্জয় বাবু বাল্যকালে যখন তালপুখুরে আসি-তেন তখন হেমকে বড় মান্য করিতেন, সম্ভবতঃ এখনও হেমের দুই একটী পরামর্শ গ্রহণ করিতেও পারেন। আর যদি তাহাও না হয়, তথাপি একবার স্বচক্ষে উমাতারার অবস্থা দেখিয়া আসা হবে, তাহার পর যথোচিত উপায় বিধান করা যাইবে।

এইরূপ মনে মনে স্থির করিলেন কিন্তু ধনঞ্জয় বাবুর সহিত সহসা দেখা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কলিকাতা মহা-নগরীতে ধনঞ্জয় বাবুর বড় মান, অনেক বন্ধু, অনেক কাযের ঝন্‌ঝট, তাঁহার সহিত হেমের ন্যায় সামান্য লোকের দেখা হওয়া শীঘ্র ঘটিয়া উঠে না। হেমের গাড়ী নাই, তিনি এক দিন সকালে হাঁটিয়া ধনঞ্জয় বাবুর কলিকাতার প্রাসাদতুল্য বাটীতে গেলেন। দ্বারে দ্বারবান্‌গণ একজন সামান্য পথশ্রান্ত বাবুর কথায় বড় গা করে না, কেহ কোনও উত্তর দেয় না, খাটিয়ারূপ সিংহাসন থেকে কেহ শীঘ্র উঠে না। কেহ গা ভাঙ্গিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ ডাল বাছিতেছে, কেহ বা বাড়ীর দাসীর সহিত দুই একটী মধুর মিষ্টালাপ করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে একজন অনুগ্রহ করিয়া হেমের দিকে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া কহিল,—

কেয়া হ্যায় বাবু ? তুমি সকাল থেকে বসে আছে, কি চাই কি ?

হেম। বলি একবার ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে কি দেখা হতে পারে ? অনেক দূর থেকে এসেছি, একবার খবর দাও না, বল তালপুখুর গ্রাম থেকে হেমবাবু দেখা করিতে এসেছেন ?

দ্বারবান্। গ্রামের লোক ঢের আসে, বাবু সকলের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, বাবুর অনেক কায।

হেম। তবু একবার খবর দাও না, বড় প্রয়োজনে আসিয়াছি, একবার দেখা হলে ভাল হয়।

দ্বারবান্। প্রয়োজনে সকলে আসে, বাবুর কাছে এখন সকল গ্রামের লোকের প্রয়োজন আছে, সকলেই কিছু আশা করে। তোমার কি গ্রাম শালপুখুর, সে মুলুকে বড় শালবন আছে ?

হেম। না হে দ্বারবান্জী, শালপুখুর নয় তালপুখুর, তোমাদের বাবুর শ্বশুর বাড়ী সেই গ্রামে।

তখন একটী খাটিয়ায় অর্দ্ধশয়ান দ্বিতীয় এক মহাপুরুষ একবার হাই তুলিয়া অর্দ্ধেক গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—

হাঁ হাঁ আমি জানে, সে তালপুখুর গ্রামে বাবু সাদী করিয়াছেন। তুমি বাবুর শ্বশুর বাড়ীর লোক আছে ?

হেম। সেই গ্রামের লোক বটে, বাবুর সঙ্গে সম্পর্কও আছে।

তখন দুই তিনজন বিজ্ঞ শ্মশ্রুধারী ক্ষণেক পরামর্শ করিল। একজন কহিল, গ্রামে থেকে অনেক কাঙ্গালী আসে, তাড়াইয়া দাও। আর এক জন কহিল, না শ্বশুর বাড়ীর লোক, সহসা তাড়াইয়া দেওয়া হয় না, মা শুনিলে রাগ করিবেন।

তৃতীয় একজন নিষ্পত্তি করিল, আচ্ছা একটু বসিতে বল। হেমবাবু আবার ক্ষণেক বসিলেন। তিনি একটু চিন্তাশীল সমালোচনাপ্রিয় লোক ছিলেন, বড় মানুষের দ্বারবান্‌দিগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও সভ্যতা বিশেষরূপে সমালোচনা করিবার অবকাশ পাইলেন, এবং তাহা হইতে পরমপ্রীতি ও উপদেশ লাভ করিলেন।

দ্বারবান্‌গণ দেখিল এ কাঙ্গালী যায় না। তখন একজন অগত্যা বহু সুখের আধার খাটিয়া অনেক কষ্টে ত্যাগ করিয়া একবার হাই তুলিয়া, একবার অসুরতুল্য বাহুদ্বয় আকাশের দিকে বিস্তার করিয়া আর একবার শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিয়া ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

হেম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় একদণ্ড পর দ্বারবান্ ফিরিয়া আসিয়া সুখবর দিলেন,—যাও বাবু এখন দেখা না হোবে।

হেম। আমার নাম বলিয়াছিলে ?

দ্বারবান্। নাম কি বলিবে ? এত সকালে কি বাবুর সঙ্গে দেখা হোয় ? বাবু এখনও উঠেন নাই, দশটার সময় উঠেন, তাহার পর আসিও। হেম অগত্যা ফিরিয়া গেলেন।

একদিন দশটার পর গেলেন, তখন বাবু বাড়ী নাই। এক দিন অপরাহ্নে গেলেন, বাবু বাগানে বাহির হইয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় গেলেন, সে দিন বাবু কোথা নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। চার পাঁচ দিন বৃথা হাঁটাহাঁটি করিয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আবার গেলেন, ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয় বাবু বাড়ী আছেন।

দ্বারবান্ বলিল, কি নাম তোমার? গোবর্দ্ধন না গৌরচন্দ্র?

হেম। নাম হেমচন্দ্র, তালপুখুর গ্রাম হইতে আসিয়াছি।

দ্বারবান্ উপরে যাইয়া খবর দিল। আসিয়া বলিল উপরে যান। হেমচন্দ্র উপরে গেলেন।

ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের ধনবান্ উত্তরাধিকারী, গৌরবর্ণ, সুন্দর, যৌবনোপেত ধনঞ্জয় বাবু কয়েকজন পাত্র মিত্রের মধ্যে সেই সভাগৃহে বিরাজ করিতেছেন। তিনি শিষ্টাচার করিয়া আপন শ্যালীপতি ভ্রাতাকে মক্‌মল মণ্ডিত সোফায় বসিতে আজ্ঞা দিলেন। হেমচন্দ্র যাহার পর নাই আপ্যায়িত হইলেন।

হেমবাবু সহসা কোনও কথা উত্থাপন করিতে পারিলেন না, সে সভাগৃহের শোভা দেখিয়া ক্ষণেক বিমোহিত হইয়া রহিলেন। তিনি চৌরঙ্গিত প্রাসাদ তুল্য বাটী সমূহের বারাণ্ডায় টানাপাখা চলিতেছে, পথ হইতে দেখিয়াছেন; লাট সাহেবের বাড়ীর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন; উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দুই একটী ইংরাজি দোকানের অভ্যন্তর একটু একটু দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন সুশোভিত সুন্দর সভাগৃহের ভিতর পদবিক্ষেপ করা তাঁহার কপালে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই! সভার মেজে সুন্দর কার্পেট মণ্ডিত, তাহাতে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে, লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে, ডালে ডালে পাখী বসিয়াছে, সে কার্পেটের উপর হেমচন্দ্র ধূলিপূর্ণ তালি দেওয়া জুতা স্থাপন করিতে একটু সঙ্কুচিত হইলেন। তাহার উপর আবলুশ কাষ্ঠের সোফা, অটোমান্ চৌকি, ইজিচেয়র, সাইডবোর্ড, টেবিল; আবলুশ কাষ্ঠের উপর সুবর্ণের সূক্ষ্ম রেখাগুলি বড় শোভা পাইতেছে। সোফা ও চৌকি হরিৎবর্ণ মক্‌মলে মণ্ডিত, হেমের

ছেলে দুইটী সেরূপ মক্‌মলের জামা কখন পরিধান করে নাই। মার্বেলের টেবিল, মার্বেলের সাইডবোর্ড, মার্বেলের প্রতিমূর্ত্তি গুলি! উপর হইতে বেলওয়ারীর ঝাড়ের ভিতর গ্যাসের আলোক দীপ্ত রহিয়াছে, সে আলোকে ঘর দিবার ন্যায় আলোকিত হইয়াছে, গবাক্ষ দিয়া সে আলোক বাহির হইয়া সে পাড়া সুদ্ধ আলোকিত করিয়াছে। একদিকে কোন স্থানে সেতার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র রহিয়াছে, সাইডবোর্ডে দুইটি ডিকেণ্টর ও কয়েকটী গেলাস ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দেয়ালে অসংখ্য বড় বড় দর্পণে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে, হেমের দরিদ্র চেহারাখানি চারিদিকের দর্পণে অঙ্কিত দেখিয়া সে দরিদ্র আরও লজ্জিত হইলেন। কয়েকখানি সুন্দর বহুমূল্য অয়েল পেণ্টিং; ইন্দ্রপুরী হইতে বিবস্ত্রা মেনকা রম্ভা যেন সেই অয়েল পেণ্টিং হইতে হাস্য করিতেছে!

সভাগৃহের বর্ণনা একপ্রকার হইল, সভ্যদিগের বর্ণনা করি কিরূপে? আজ অধিক লোক নাই তথাপি ধনঞ্জয় বাবুর অতি প্রিয়, অতি গুণবান্ কয়েকজন বন্ধু সে সভাকে নবরত্ন সভা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যথেষ্ট বর্ণনা করা অসম্ভব, দুই একটী কথায় পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ হস্তে সুমতি বাবু বসিয়াছিলেন, তিনি রূপবান্ যুবা পুরুষ, বয়স ঠিক জানি না, কিন্তু যৌবনের শোভা সে সুন্দর মুখে, সে কালাপেড়ে কাপড়ে ও ফিন্‌ফিনে একলাইয়ে লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার ব্যবসায় জানি না, কিন্তু প্রায় বড় মানুষদিগের দক্ষিণ হস্তে তাঁহার স্থান। তিনি গীতে অদ্বিতীয়, হাস্য রহস্যে অদ্বিতীয়, ধনীদিগের মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়, প্রবাদ আছে যে

বিষয়বুদ্ধিতেও অদ্বিতীয়! মধুমক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিতে জানিতেন, অনেক মধুচক্র হইতে মধু আহরণে তাঁহার ধনাগার পূর্ণ হইয়াছিল, সুন্দর গাড়ী ও জুড়িতে ছাপিয়া পড়িতেছিল। প্রবাদ আছে যে বণ্ড, হেণ্ডনোট প্রভৃতি গূঢ় মন্ত্রে তিনি বিশেষ রূপে দীক্ষিত, নাবালক বা তরুণ ধনীদিগের প্রতি সেই সুন্দর মন্ত্র চালনায় তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু এ সকল জনপ্রবাদ গ্রাহ্য নহে, সুমতি বাবুর মিষ্ট হাস্য ও আলাপ ক্ষমতা সন্দেহ-বিবর্জিত।

সুমতি বাবুর পার্শ্বে যদুনাথ বসিয়াছিলেন,—গুণ বল, লেখাপড়া বল, কার্য্যদক্ষতা বল, হাস্য রহস্য ক্ষমতা বল,—যদুনাথের ন্যায় কলিকাতায় কে আছে? ব্যবসা ওকালতি, মুখে ইংরাজী বুলি যেন খই ফোটে, ইংরাজী চাল চোল, ইংরাজী খানায়, ইংরাজী ধরণে তাঁহার ন্যায় কে উপযুক্ত? সেম্পেন বা সোটরণ্ বা সাবলিস্ সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় কে বিচারক? আবার বক্তৃতা ক্ষমতাও তাহার অসাধারণ,—"ন্যাশনালিটী" রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া কলিকাতার কোন্ শিক্ষিত লোকের মন না দ্রবীভূত হইয়াছে? যদুনাথ বাবুর সমকক্ষ হওয়া বালকদিগের উচ্চাভিলাষ, যদুনাথ বাবুর সহিত বন্ধুতা করা বিষয়ীদিগের উদ্দেশ্য, যদুনাথ বাবুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কন্যাকর্ত্তাদিগের সুখস্বপ্ন!

তাঁহার পশ্চাতে হাতকাটা বেনিয়ান পরিয়া সুবর্ণের চেন ঝুলাইয়া হরিশঙ্কর বাবু একটু একটু হাসিতেছেন। তিনি সেকেলে লোক, ইংরাজী বড় জানেন না, কিন্তু বাহাদুরি কেমন? কোন্ ইংরাজীওয়ালা তাঁহার ন্যায় চাকুরি পাইয়াছে? তিনি মাথায় সাদা ফেট্টা বাঁধিয়া আপিসে যান, পুরাণধাঁচে ইংরাজী কহেন,

বড় বড় সাহেবের বড় প্রিয়পাত্র। প্রাচীন হিন্দু সমাজের এই স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্কর বাবুকে সাহেবরা বড় স্নেহ করেন, হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে হরিশঙ্কর বাবুকে মূর্ত্তিমান্ বেদ মনে করেন, হিঁদুয়ানি ও সাবেক রকম রীতি নীতি বজায় রাখিবার একটী প্রধান কারণ মনে করেন, নব্য উদ্ধত যুবকদিগকে হরিশঙ্কর বাবুর উদাহরণ দেখান। হরিশঙ্কর বাবু লোকটী বিচক্ষণ, দেখিলেন এই চালে চলিলেই লাভ, সুতরাং সেই চালই আরও অনুবর্ত্তন করিলেন। তাহার সুফল শীঘ্র ফলিল, ধর্ম্মপতি রাজপুরুষেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীকে অনেক শিক্ষিত কর্ম্মচারীর উপরে একটা বড় চাকুরি দিলেন। সাবেক রীতিনীতির স্তম্ভ মনে মনে একটু হাসিলেন, সন্ধ্যার সময় ইয়ারদিগের নিকট এই কথা গল্প করিয়া, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথোচিত প্রশংসা লাভ করিলেন। সেই রাত্রি সুধার উৎস বহিল।

হরিশঙ্কর বাবুর এক পার্শ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার "মিষ্টর" কর্ম্মকার বসিয়াছেন, তাঁহার কোট পেণ্টলুন অনিন্দনীয়, চক্ষের চসমা অনিন্দনীয়, কলার নেকটাই অনিন্দনীয়, হস্তে শেরীর গেলাস অনিন্দনীয়। তাঁহার ইংরাজী বুলি বিস্ময়কর, ইংরাজী ধরণ বিস্ময়কর, ইংরাজী মেজাজ বিস্ময়কর। ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম ফল আহরণ করিয়া তিনি ধনঞ্জয় বাবুর সভা শোভিত করিতেছেন। সুমতি বাবু কখন কখন তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনিন্দনীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ইয়ারদিগের নিকট বলিতেন, "এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থ বুঝিলাম, মিষ্টর কর্ম্মকারের মুখের কান্তি অপেক্ষা পশ্চাতের শোভাটাই কিছু অধিক।"

হরিশঙ্কর বাবুর অপর পার্শ্বে বিশ্বম্ভর বাবু বসিয়াছেন, তিনি তাঁহার পাড়ার মধ্যে বড় মানুষ, দলের মধ্যে দলপতি, বড় হাউসের বড় বেনিয়ান! তাঁহার অর্থের ন্যায় কাহার অর্থ, তাঁহার নূতন বাড়ীর ন্যায় কাহার বাড়ী, তাঁহার গাড়ী ঘোড়ার ন্যায় কাহার গাড়ী ঘোড়া? তাঁহার পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বর বাবু, গিদ্ধেশ্বর বাবু, প্রভৃতি বনিয়াদী বড়মানুষগণ বসিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরব বর্ণনায় আমরা অক্ষম।

ধনস্বরূপ পদ্মবনের চারিদিকে মধুমক্ষিকাগণ গুণ্ গুণ্ করিতেছে; ধনস্বরূপ ময়ূরসিংহাসনে রত্নরাজি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! হেমবাবু কয়েকমাস কলিকাতায় বাস করিয়া দেখিলেন, কেবল ধনঞ্জয় বাবুর বাড়ী নহে, চারি দিকেই সমাজ এ রত্নরাজিতে মণ্ডিত রহিয়াছে! এ মহা নগরী এই রত্নপ্রভায় ঝলসিত হইতেছে!

এ সভায় হেমচন্দ্র কি বলিবেন? 'হংস মধ্যে বকো যথা' হইয়া তিনি ক্ষণেক সেইখানে সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। একবার কষ্ট করিয়া ধনঞ্জয় বাবুর বাগানের কথা উত্থাপন করিলেন, তখনই সভাসদ্‌গণ সহস্রমুখে সেই বাগানের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় বাবু হেমবাবুকে একদিন বাগানে লইয়া যাইবেন বলিয়া অনুগৃহীত করিলেন, হেম অপ্রতিভ হইয়া রহিলেন। একবার তালপুখুরের কথা উচ্চারণ করিলেন, ধনঞ্জয় বর্দ্ধমানের নাজীরের কথা উত্থাপনে একটু মুখ হেঁট করিলেন, সে কথায় কেহ বড় গা করিলেন না। সভাসদ্‌গণ একটু অধীর হইতে লাগিলেন, কেহ সেতার লইয়া কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কেহ সাইডবোর্ডে

ডিকেণ্টরের দিকে চাহিলেন, কেহ ঘড়ীর দিকে চাহিলেন। হেমচন্দ্র ভাব গতিক বুঝিয়া বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী-ভিতর একবার যাবেন কি? ধনঞ্জয় ত তাঁহাকে একবার বাড়া-ভিতর যাইবার কথা বলিলেন না। তথাপি হতভাগিনী উমাতারাকে না দেখিয়া কি চলিয়া যাইবেন?

প্রাঙ্গনে আসিয়া হেমচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিলেন। এমন সময়ে বাহিরে ঘর্ঘর শব্দে আর দুই একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল! গাড়ী হইতে হাস্যরবে বাটী ধ্বনিত করিয়া কাহারা বাবুর বৈঠকখানায় গেল। সভা জমিল, সেতারের বাদ্য শ্রুত হইল, আবার মধুর হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল,—অচিরে কলকণ্ঠজাত গীতধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল।

হেম এক পা দু পা করিয়া একটী প্রাচীর পার হইয়া বাড়ী-ভিতরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়াছেন! তথায় শব্দ নাই, আলোক নাই, মনুষ্য চিহ্ন নাই, মনুষ্য রব নাই। অন্ধকারে ক্ষণেক প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। কাহাকেও ডাকিবেন কি?

একটী উন্নত প্রকোষ্ঠের গবাক্ষের ভিতর দিয়া একটী দীপ দেখা যাইতেছে, হেম অনেকক্ষণ সেই দীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সাড়া দিবার সাহস হইয়া উঠিল না।

ক্ষণেক পর একটী ক্ষীণ বাহু সেই গবাক্ষে লক্ষিত হইল। ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষ বদ্ধ হইল, আলোক আর দৃষ্ট হইল না, সমস্ত অন্ধকার। হৃদয়ে দুই হস্ত স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র নিঃস্বব্দে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী।

হেমচন্দ্র বাটী আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কায করিয়াছি, নারীর যাতনার সময় নারীই শান্তনা দিতে পারে। আমি সমস্ত কথা স্ত্রীর নিকট কহিব, তিনি যাহা পারেন করুন।

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বিন্দু দেখিলেন হেমচন্দ্রের মুখ-মণ্ডল অতিশয় গম্ভীর, অতিশয় ম্লান। ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আজ কি হয়েছে গা? তোমার মুখখানি অমন হয়ে গিয়েছে কেন?

হেম। বলিতেছি, বস। সুধা শুইয়াছে?

বিন্দু। সুধা খাওয়া দাওয়া করিয়া শুয়েছে। কোনও মন্দ খবর পাও নাই।

হেম। শুন, বলিতেছি। এই বলিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে হেমচন্দ্র আদ্যোপান্ত যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, বিন্দুর নিকট বলিলেন।

বিন্দু। আঁচল দিয়া অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া বলিল, এটী হবে তাহা আমি জানিতাম, অভাগিনী উমা তাহা জানিত।

হেম। কেমন করিয়া?

বিন্দু। তা জানি না, বোধ হয় কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছিল, সে চাপা মেয়ে, কোনও কথা শীঘ্র

বলে না, কিন্তু তালপুখুর থেকে আসিবার সময় সে অভাগিনীর কান্না কাঁদিয়াছিল।

হেম। এখন উপায়? যেরূপ শুনেতেছি তাহাতে ধনেশ্বরের কুলের ধন দুই বৎসরে লোপ হইবে, ধনঞ্জয় রোগগ্রস্ত হইবে, উমা দুই বৎসরে পথের কাঙ্গালিনী হইবে।

বিন্দু। সে ত দুই বৎসরের পরের কথা, এখন উমা কেমন আছে? সে সভাবতঃ অভিমানিনী, স্বামীর আচরণ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছে? তালপুখুর হইতে আসিয়া সেই বড় বাড়ীতে ছেলে মানুষ একা কেমন করিয়া আছে? তার ছেলে পুলে নেই, বন্ধু বান্ধব যে কেউ নেই, যার কাছে মনের কথা বলে। তুমি কেন একবার গিয়ে দুটো কথা কহিয়া আসিলে না?

হেম। আমার ভরসা হইল না,—তুমি একবার যাও,—তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর, তার পর ভগবান্ আছেন।

তাহার পর দিন খাওয়া দাওয়ার পর ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া বিন্দু একটী পালকি করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন। সুধাও উমাদিদির সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে বলিয়া উৎসুক হইল, কিন্তু বিন্দু বলিলেন, আজ নয় বন, আর একদিন যদি পারি তোমাকে লইয়া যাইব।

প্রশস্ত শয়ন কক্ষে গিয়া বিন্দু দেখিলেন উমা একা বসিয়া একটী চুলের দড়ি বিনাইতেছে, দাস দাসী সকলে নীচে আছে। উমাকে দেখিয়া বিন্দু শিহরিয়া উঠিলেন। এই কি সেই তালপুখুরের উমা যাহার সৌন্দর্য্য কথা দিক্ বিদিক্ প্রচার হইয়াছিল? মুখের রং কালো হইয়া গিয়াছে, চক্ষে কালী

পড়িয়াছে, কণ্ঠার হাড় দুটা বেরিয়ে পড়েছে, বাহু অতিশয় শীর্ণ, শরীর খানি দড়ীর মত হয়ে গিয়াছে। চারিমাস পূর্ব্বে বিন্দু যাহাকে প্রথম যৌবনের লাবণ্যে বিভূষিতা দেখিয়াছিলেন, আজ তাহাকে ত্রিংশৎ বৎসরের রোগক্লিষ্টা নারীর ন্যায় বোধ হইতেছে। কণ্ঠার হাড়ের উপর দিয়া তারা হার লম্ববান রহিয়াছে, বহুমূল্য বালা দুগাছী সে শীর্ণ হস্তে ঢল ঢল করিতেছে।

উমা পদশব্দ শুনিয়া সেই ম্লান চক্ষুর সহিত পেছনে ফিরিয়া দেখিলেন। বিন্দুকে দেখিয়াই চুলের দড়ী রাখিয়া উঠিলেন। ম্লান বদনে ধীরে ধীরে কহিলেন, আঃ বিন্দুদিদি, তুমি এসেছ, আমি কতদিন তোমার কথা মনে করেছি। তুমি ভাল আছ? ছেলেরা ভাল আছে?

সে ধীর কথাগুলি শুনিয়াই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু উমার হৃদয়ের অবস্থা ও তাঁহার চারি মাসের ইতিহাস অনুভব করিলেন। যত্নে হৃদয়ের উদ্বেগ সঙ্গোপন করিয়া উমার হাত দুটী ধরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—

হাঁ বন্, আমরা সকলে ভাল আছি, সুধার বড় জ্বর হয়েছিল, তা সেও ভাল হয়েছে। তুমি কেমন আছ উমা? তোমাকে একটু কাহিল দেখছি কেন বন?

উমা। ও কিছু নয় বিন্দুদিদি,—আমার ও কলিকাতায় আসিয়া আমাসা হয়েছিল, তা ভাল হয়েছে, এখন একটু কাশী আছে, বোধ হয় কলিকাতার জল আমাদের সয় না, আমরা তালপুখুরেই ভাল থাকি। সেই নীরস ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাস্য লক্ষিত হইল।

বিন্দু। তালপুখুরে আবার যাইতে ইচ্ছা করে? আমরা এই পুজার পর যাব, তুমি যাবে কি?

উমা। তা সে ত আমার ইচ্ছে নয় বিন্দুদিদি, বাবু কি তাতে মত করিবেন? বোধ হয় না।

বিন্দু। তবে তোমাকে এখানে দেখবে শুনবে কে? আমরা রহিলাম অনেক দূরে, আর ছেলেদের ফেলেও ত সর্ব্বদা আসিতে পারি না। তোমার ও কাশী করেছে, রোগা হয়ে গিয়াছ, তোমাকে দেখে কে?

উমা। কেন বিন্দুদিদি, রোজ ডাক্তার আসে, বাবু একজন ভাল ডাক্তার রাখিয়া দিয়াছেন সে ঔষুধ দিতেছে, আমি এখন ঔষুধ খাই।

বিন্দু। তা যেন হোল,কিন্তু তবু আপনার লোক না হলে কি কেউ দেখতে শুনতে পারে? আর তোমার অসুখ হলে সংসারই দেখে কে? তা জেঠাইমাকে কেন লেখ না, তিনি এসে কয়েক দিন থাকুন। আবার তুমি একটু সারলে তিনি চলে যাবেন, তুমিও না হয় দিনকতক গিয়ে তালপুখুরে থাকবে।

উমা। না মাকে আর কেন আনান, আমার ব্যারামের বেশ চিকিৎসা হইতেছে, আর সংসারে অনেক চাকর দাসী আছে, কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত, মাকে কেন ডাকান?

বিন্দু। না তবু বোধ হয় তেমন যত্ন হয় না, মায়ে যেমন যত্ন করে, তেমন কি আর কেউ পারে, হাজার হোক মার প্রাণ। তা ধনঞ্জয় বাবু তোমাকে যত্নটত্ন করেন ত?

অতি ক্ষীণস্বরে উমা উত্তর করিলেন, হাঁ তা আমার যখন

যা আবশ্যক, তখনই পাই, কিছুর অভাব নাই। যত্ন করেন বৈ কি।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন, অভিমানিনী উমা আপনার প্রকৃত যাতনার কথা কহিতে চাহে না; উমার ইহ জগতে সুখ ও সুখের আশা ভস্মসাৎ হইয়াছে। বিন্দুই বা সে কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করেন? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

না উমা, আমার বোধ হয় জেঠাইমা এখানে আসিয়া কয়েকদিন থাকিলে ভাল হয়। দেখ আমাদের সুখ দুঃখ, ব্যারাম স্যারাম সকলেরই আছে, ব্যারামের সময় আপনার লোক যতটা করে, পরে কি ততটা করে? এই সুধার ব্যারাম হইল, বাবু ছিলেন, শরৎ ছিল, কত যত্ন কত সুশ্রুষা করিল, তবে আরাম হল। তুমিও বন বড় কাহিল হয়ে গিয়াছ, সর্ব্বদা কাশ্‌ছ, এখন থেকে একটু যত্ন নেওয়া ভাল। তা আমার কথা রাখ বন্, জেঠাইমাকে আজই চিঠি লেখ, না হয় আমায় বল আমিই লিখছি। আহা উমা, তুমি কি ছিলে বন আর কি হয়ে গিয়াছ। এই বলিয়া বিন্দু সস্নেহে উমার কপালে হাত বুলাইয়া কপাল থেকে চুলগুলি সরাইয়া দিলেন।

এই টুকু স্নেহ উমা অনেক দিন পান নাই,—এই টুকুতে তাঁহার হৃদয় উথলিল, চক্ষু দুইটী ছল্ ছল্ করিল, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উমা ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে ছেলে বেলা থেকে বড় ভাল বাস" আর কথা বাহির হইল না, উমা চক্ষুর জল অঞ্চল দিয়া মুছিলেন।

বিন্দু অতিশয় স্নেহের ভাষায় বলিলেন, উমা তুমি কি আমাকে ভাল বাস না?

উমা। বাসি, যতদিন বাঁচিব, তোমাকে ভাল বসিব।

বিন্দু। তবে বন্ আজ আমার কাছে এত গোপন চেষ্টা কেন? তোমার মনের দুঃখ কি আমি বুঝি নাই? জগতে তোমার সুখের আশা শেষ হইয়াছে তাহা কি আমি বুঝি নাই? বিবাহের পর যে প্রণয়ে তুমি ভাসিতে, আমার সহিত দেখা হইলেই যে কথা আমাকে বলিতে, সে প্রণয় সুখ শেষ হইয়াছে, তাহা কি আমি বুঝি নাই? উমা তুমি এ সব কথা আমার নিকট কেন লুকাইতেছ? আমি কি পর? প্রাণের উমা, তুমি আমি যদি পর হই তবে জগতে আপনার লোক কে আছে?

এ স্নেহ বাক্য উমা সহ্য করিতে পারিল না, নয়ন দিয়া ঝর ঝর করিয়া বারি বহিতে লাগিল, প্রাণের বিন্দুদিদির হৃদয়ে মুখ খানি লুকাইয়া অভাগিনী একবার প্রাণ ভরে কাঁদিল।

অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া উমা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—বিন্দুদিদি তোমার কাছে আমি কখনও কিছু লুকাই নাই, কখনও লুকাইব না। কিন্তু আজ ক্ষমা কর, এ সব কথা আর একদিন বলিব।

বিন্দু। উমা, আমি আজই শুনিব। মনের দুঃখ মনে রাখিলে অধিক ক্লেশ হয়, আপনার লোকের আছে বলিলে একটু শান্তি বোধ হয়।

উমা। কি বলিব বল?

বিন্দু। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ধনঞ্জয় বাবু কি এখন তেমন যত্নটত্ন করেন?

উমা। বিন্দুদিদি, আমার যখন যা দরকার হয় সবই

পাই, আমার রোগের চিকিৎসা করাইতেছেন, যত্ন নাই কেমন করে বলিব ?

বিন্দু। উমা তুমি কি আমাকে পুরুষ মানুষ পাইয়াছ যে ঐ কথায় ভুলাইতেছ। ভাত কাপড় ও ঔষধে কি স্বামীর যত্ন ? আমি সে যত্নের কথা বলি নাই। ধনঞ্জয় বাবু কি পূর্ব্বের মত তোমাকে স্নেহ করেন, পূর্ব্বের মত কি মন খুলিয়া তোমাকে ভাল বাসেন, পূর্ব্বের মত কি তোমার ভাল বাসায় সুখী হয়েন। উমা, মেয়ে মানুষের কাছে মেয়ে মানুষের কি এ কথাগুলি খুলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। স্বামীর যে স্নেহ ধনবতী স্ত্রীর ধন, দরিদ্র নারীর সুখ, সকল মেয়েমানুষের জীবন, সে স্নেহটী কি তোমার আছে ?

হতভাগিনী উমা "না" কথাটী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, কেবল মাথা নাড়িয়া সেই কথার উত্তর করিয়া মাথাটী আবার বিন্দুর বুকে লুকাইলেন।

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, উমা, সে ধনটী হারাইলে ত চলিবে না, সে ধনটী রাখিবার জন্য কি তুমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলে ?

উমা। ভগবান জানেন আমার ভালবাসা কমে নাই, তাঁহাকে এখনও চক্ষে দেখিলে আমার শরীর জুড়ায়।

বিন্দু। উমা, তোমার ভালবাসা আমি জানি, তুমি পতিব্রতা, এ জীবনে তোমার ভালবাসা হ্রাস হইবে না। কিন্তু দেখ বন, কেবল ভালবাসায় স্বামীর স্নেহ থাকে না, সংসারও চলে না। মেয়েমানুষের আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে, আমাদের আর কিছু শিখিতে হয়।

উমা। বিন্দুদিদি, যিনি আমাদিগকে খেতে পরিতে দেন, যিনি আমাদিগের প্রথম গুরু, তাঁহাকে ভালবাসা ছাড়া আর কি দিতে পারি? ভালবাসা ভিন্ন নারীর আর কি দেয় আছে।

বিন্দু। উমা, ভালবাসাই আমাদের প্রথম ধর্ম্ম, কিন্তু তাহা ভিন্ন ও আমাদের কিছু শিখিতে হয়। তা না হইলে সংসার চলে না। যিনি আমাদের জন্য এত করেন তাঁহার মনটী সর্ব্বদা তুষ্ট রাখিবার জন্য, তাঁহার গৃহটী সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার জন্য আমরা যেন একটু যত্ন করিতে শিখি। অনেক সময় একটী মিষ্ট কথায় ক্ষোভ নিবারণ হয়, একটী মিষ্ট কথায় ক্রোধ শান্তি হয়, আমাদের একটু যত্ন ও প্রফুল্লতায় সংসারটী প্রফুল্ল থাকে। সংসারের জ্বালা যদি একটু সহ্য করিতে শিখি, ক্রোধ একটু সম্বরণ করিতে শিখি, অভিমান একটু ত্যাগ করিয়া ক্ষমা গুণ শিখি, তাহা হইলে সংসারটী বজায় থাকে, না হইলে জীবন তিক্ত হয়। উমা আমি অনেক নির্দ্দোষ চরিত্র পুরুষ ও নির্দ্দোষ চরিত্রা নারী দেখিয়াছি, তাহাদিগের ভালবাসারও অভাব নাই, তথাপি তাহাদিগের সংসার শ্মশান ভূমি, জীবন তিক্ত। একটু ধৈর্য্য, একটু ক্ষমা সংসারের পথকে মসৃণ করে, সে গুণ গুলির অভাবে উৎকৃষ্ট সংসার ও কণ্টকময় হয়, তখন তাঁহারা মনে করেন, পূর্ব্ব হইতে একটু যত্ন করিলে এ জীবনে কত সুখ হইতে পারিত। কিন্তু তখন অবসর চলিয়া গিয়াছে, প্রণয় একবার ধ্বংশ হইলে আর আসে না, জীবনের খেলা একবার সাঙ্গ হইলে আর সে খেলা আরম্ভ করিতে আমাদের অধিকার নাই।

উমা। বিন্দুদিদি, তোমারই কাছে বাল্যকালে এ কথাটী আমি শুনিয়াছিলাম, তালপুখুরে তোমাদের দরিদ্র সংসার দেখিয়া এ শিক্ষাটী আমি শিখিয়াছি, ভগবান্ জানেন ইহাতে আমার কোন ক্রটী হয় নাই। লোকে আমাকে ধনাভিমানিনী বলিত, কিন্তু যিনি আমার গুরু তিনিই আমাকে সর্ব্বদা মুক্তাহার ও হিরকাভরণ পরিতে দেখিতে ভাল বাসিতেন, সেই জন্য আমি পরিতাম, এই মাত্র আমার অভিমান। লোকে আমাকে রূপাভিমানিনী বলিত, কিন্তু দিদি, তুমি জান, সেরূপে স্বামী একদিন তুষ্ট ছিলেন সেই জন্য আমার অভিমান, তাঁহাকে তুষ্ট রাখা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য ইচ্ছা ছিল না। যখন কলিকাতায় আসিলাম তখন আমি এই যত্ন দ্বিগুণ করিলাম কেন না আমি ভিন্ন এ বাড়ীতে আর মেয়েমানুষ নাই, আমি যদি একটু যত্ন না করি কে করিবে বল?

বিন্দু। উমা, তুমি যে এটুকু করিবে তাহা আমি জানিতাম, তোমাকে ছেলেবেলা থেকে আমি জানিতাম, অন্যে তোমাকে দোষ দিয়াছে, আমি দোষ দি নাই। ধৈর্য্য, ক্ষমা, একটু যত্ন স্নেহ ও প্রফুল্লতাই আমাদের কর্ত্তব্য, এ গুলি তুমি শিখিয়াছ, সকলে শিখে না। পূর্ব্বকালে আমরা বড় বড় সংসারে বৌ মানুষ হইয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর ভয়ে, ননদের ভয়ে, জায়ের ভয়ে, আমাদের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য অনেক চাপা পড়িত, আমরা মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতাম, শাশুড়ীর আদেশে সংসার চলিত। এখন সবাই পৃথক পৃথক থাকিতে শিখিয়াছে, ছেলেরাও যাহা ইচ্ছা করে, বৌয়েরাও আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, সংসার সুখ অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

উমা। বিন্দুদিদি, আমারও অনেক সময় মনে হয়, সকলেই একত্রে থাকিবার প্রথাই ভাল ছিল, ছেলেরা শীঘ্র কুপথে যাইতে পারিত না, মেয়েরাও নম্রতা শিখিত।

বিন্দু। উমা, সুখ দুঃখ সকল প্রথাতেই আছে। কালী-তারা বৃহৎ পরিবারে আছে, আহা! কালী কি সুখে আছে? একত্র বাস করিবার কি এই সুখ?

উমা। কালীদিদির দুঃখের অন্য কারণ। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, সে চিরজীবন প্রণয়সুখে বঞ্চিত।

বিন্দু। আমি প্রণয়সুখের কথা বলিতেছি না। কিন্তু প্রত্যহ পথের মুটের চেয়েও যে সকাল থেকে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়া খাটিয়া সে রোগগ্রস্ত হইয়াছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে নির্দ্দোষে পথের কাঙ্গালী অপেক্ষাও গঞ্জনা ও গালী খায়, তাহার কারণ কি?

উমা। বিন্দু দিদি, সে কালীদিদির খুড়শাশুড়ীরা মন্দ লোক এই জন্য।

বিন্দু। তা বড় সংসারে সকলেই যে ভাল লোক হইবে, তাহারই সম্ভাবনা কি? একজন মন্দ হইলেই সংসার তিক্ত হয়, সমস্ত দিন খিটি নাটি ও কোন্দল; যে কালীতারার মত ভাল মানুষ তাহারই অধিক যাতনা। এই সব দেখিয়াই যাদের একটু টাকা হয় তারা ভিন্ন থাকিতে চায়, না হইলে আপনার লোক কে ইচ্ছা করে ত্যাগ করে বসে। তা ভিন্ন থাকিয়াও যদি আমাদের যার যেটুকু করা আবশ্যক তাহাই করি, শাশুড়ীর ভয়ে যেটুকু শিখিতাম, সেইটুকু যদি নিজ বুদ্ধিতে

শিখি, তাহা হইলেও সংসারে অনেকটা সুখ থাকে। এখনকার মেয়েরা এটী বড় শিখে না, কালে বোধ হয় শিখিবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে রাস্তায় জুড়ীর শব্দ হইল, একখানি গাড়ী আসিয়া ফাটকে দাঁড়াইল। উমা তাহার অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং দেখিতে উঠিলেন না, বিন্দু গবাক্ষের নিকট যাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ধনঞ্জয় বাবু বাগান হইতে আসিলেন। তাঁহার বেশভূষা বিশৃঙ্খল, তিনি নিজে অচেতন, দুইজন ভৃত্য তাঁহাকে গাড়ী হইতে উপরে উঠাইয়া লইয়া গেল।

ঝর ঝর করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে বিন্দু উমাকে দুই হস্তে আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—

উমা, ভগবান্ জানেন নারীর যতদূর কষ্ট হয়, তুমি তাহা সহ্য করিতেছ, সেই কষ্টে উমা আর উমা নাই, বোধ হয় রাত জাগিয়া, না খাইয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার এই দশা হইয়াছে, রোগও হইয়াছে। কি করিবে বন, যেটি সইতে হয় সহিয়া থাক যত্নের ত্রুটি করিও না, অভিমান দেখাইও না, একটী উচ্চ কথা কহিও না, তাহা হইলে আরও মন্দ হইবে, এ রোগের সে ঔষধি নহে। নীরবে এ যাতনা সহ্য কর, যখন অবকাশ পাইবে মিষ্ট কথায় ধনঞ্জয় বাবুকে তুষ্ট করিও, কথায় বা ইঙ্গিতে তিরস্কার করিও না, কাঁদিতে হয় গোপনে কাঁদিও। যাহাদের লইয়া ধনঞ্জয় বাবু এখন এত সুখ অনুভব করেন, হয়ত কাল তাহাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন। পরম অসদাচারী ও অসদাচার পরিত্যাগ করিয়া আবার পবিত্র স্নিগ্ধ সংসার সুখ

খুঁজিয়াছে এমনও আমি দেখিয়াছি। তোমার মাকে আমি অদ্যই চিঠি লিখিব. ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, আশায় ভর করিয়া থাক,—প্রাণের উমা, ভগবান্ এখনও তোমার কষ্ট মোচন করিতে পারেন, তোমাকে সুখ দিতে পারেন।

দুই ভগিনীতে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। উমা বিন্দুর কথায় কোনও উত্তর দিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন,—ভগবান্ একটী সুখ আমাকে দিতে পারেন,—মৃত্যু।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আর একজন হতভাগিনী।

বিন্দু বাটী আসিয়া পাল্কী হইতে না নামিতে নামিতে সুধা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল,—

অ দিদি, দিদি, কে এসেছে দেখবে এস।

বিন্দু। কে লো?

সুধা। এই দেখবে এস না, এই শোবার ঘরে বসে আছে!

বিন্দু। কে শরৎ বাবু?

সুধা। না শরৎ বাবু নয়। দিদি, শরৎ বাবু এখন আর আসেন না কেন?

বিন্দু। শরৎ বাবুর কি পড়া শুনা নেই, তার পরীক্ষা কাছে, সে কি রোজ আসতে পারে?

সুধা। পরীক্ষা কবে দিদি?

বিন্দু। এই শীতকালে।

সুধা। তার পর আসবেন?

বিন্দু। আসবে বৈ কি বন্, এখন ও আসবে। তবে রোজ রোজ কি আসতে পারে, যে দিন অবকাশ পাইবে, আসবে। উপরে কে বসিয়া আছে?

সুধা। কে বল না?

বিন্দু। চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী আসিয়াছেন নাকি? তিনি ত মধ্যে মধ্যে আসেন, আর কে আসবে?

সুধা। না তিনি নয়।

বিন্দু। তবে বুঝি দেবী বাবুর স্ত্রী, এতদিন পর বুঝি একবার অনুগ্রহ করে পদধূলি দিলেন।

সুধা। না তিনিও নয়,—কালীদিদি আসিয়াছে।

বিন্দু। কালীতারা! তারা কলিকাতায় এসেছে বৈ কিছুই ত জানিনা।

এই বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া বিন্দু কালীতারাকে দেখিলেন; অনেক দিন পর তাহাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন,—

এ কি, কালীতারা! কলিকাতায় কবে এলে? তোমরা সকলে ভাল আছ?

কালী। এই পাঁচ সাত দিন হইল এসেছি, এতদিন কাযের ঝন্ঝটে আস্‌তে পারিনি, আজ একবার মেজ খুড়ীকে অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া আসিলাম। ভাল নেই।

বিন্দু। কেন কাহারও ব্যারাম হয়েছে নাকি?

কালী। বাবুর বড় ব্যারাম, তাঁরই চিকিৎসার জন্য আমরা কলিকাতায় এসেছি। বর্দ্ধমানে এত চিকিৎসা করাইলেন, কিছুই হইল না, এখন কলিকাতায় ইংরাজ ডাক্তার দেখ্‌ছেন,

ভগবানের যাহা ইচ্ছা। ... কালীতারা রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু। সে কি ব্যারাম?

কালী। জ্বর আর আমাশা। সে জ্বর ও ছাড়ে না, সে আমাশাও বন্ধ হয় না, আহা তাঁর শরীরখানি যে কাঠিপানা হয়ে গেয়েছে। আবার চক্ষুতে বস্ত্র দিয়া কালীতারা ফোঁপাইতে লাগিলেন।

বিন্দু। তা কাঁদ কেন বন, কাঁদিলে আর কি হবে বল। ভাল করে চিকিৎসা করাও। ব্যারাম হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে। তা কবিরাজ দেখাচ্ছ না কেন? পুরাণ জ্বর আর আমাশায় কবিরাজ যেমন চিকিৎসা করে, ইংরাজ ডাক্তারে তেমন কি পারে?

কালী। কবিরাজ দেখাতে কি বাকি রেখেছে বিন্দুদিদি, কবিরাজে হার মেনেছে, তবে ইংরাজ ডাক্তার ডেকেছে। ... তিন মাস থেকে ভাল ভাল কবিরাজ দেখিয়াছে, কলিকাতা থেকে ভাল ভাল কবিরাজ গিয়াছিল, কিছু করিতে পারিল না।

বিন্দু। তবে দেখ বন, ইংরাজী চিকিৎসায় কি হয়। তোমরা আছ কোথায়?

কালী। কালীঘাটে একটী বাড়ী নিয়েছি, ঠিক আদিগঙ্গার কিনারায়।

বিন্দু। কালীঘাটে কেন? এই বর্ষাকালে কালীঘাটে ...চি অনেক ব্যারাম হচ্ছে, সেখানে না থেকে একটু

কালী। ...গায় ... কেন?

না? ভাদ্র মাস ...

কালী। তাও কি হয় দিদি, [illegible]লিকাতায় আসিতে চান না, বলেন এখানে বাছ বিচার [illegible]ত থাকে না। শেষে কত করে কালীঘাটের [illegible] দিয়ে একটী বাড়ী ঠিক করিয়া তবে আমরা আ[illegible] রোজ আমাদের আদিগঙ্গায় স্নান হয়, রোজ পূজা দে[illegible] কত ক্রিয়া কর্ম্ম, ঠাকুরকে কত মানত করা হয়েছে, আমার [illegible] জোড়া মহিষ মেনেছেন,—আমার কি আছে বিন্দুদিদি, আমার রূপার গোট ছড়াটী বেচিয়া জোড়া পাঁঠা দিব [illegible] আহা ঠাকুর যদি রক্ষা করেন, বাবুকে যদি এ যাত্রা [illegible] তবেই আমরা বাঁচিলাম, নৈলে আমাদের এত বড় সংসার ছারখার হয়ে যাবে। আমাদের মান বল, ধন বল, [illegible] খ্যাতি বল, কুলের গৌরব বল, বাবুর হাতেই সব [illegible] সকলের মাথা, তিনি একাই সব করছেন কর্ম্মাচ্ছেন, [illegible] চালিয়ে নিচ্ছেন। তিনি না থাকিলে আমাদের কে আ[illegible] ভগবান! এ কাঙ্গালিনীকে চির-হিতভাগিনী করিও না।

আজীবন যে স্বামীর প্রণয়সুখ কখনও ভোগ করে নাই, প্রণয়সুখ কাহাকে বলে জানিত না,—আজি সে স্বামী [illegible] চিন্তার যাতনায় ধূলায় লুণ্ঠিত হইল।

বিন্দু কালীকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। ব[illegible] ভয় কি বন, চিকিৎসা হইতেছে তবে আর ভয় কি? আমাদে[র] বাবু আছেন, তোমার ভাই শরৎ বাবু আছেন, সকলে দেখিবে শুনিবে, পীড়া শীঘ্র আরাম হইবে। এই সুধার এমন ব্যারাম হয়েছিল, শরৎ বাবু কত যত্ন করলেন, দিন রাত্তির [illegible] করাইলেন, ছেড়ে সেবা করিলেন, তাহাই রক্ষা, না হইলে ডাক্তার দেখছেন,

কালী। বিন্দুদিদি, শরৎ রোজ এখানে আসে ?

বিন্দু। আগে আসিত বন, এখন তার পরীক্ষা কাছে, তাই আসতে পারে না ; বাবুই বুঝি তাঁকে একটু ভাল করে লেখাপড়া করিতে বলেছেন ; প্রায় একমাস অবধি আসেন নাই।

কালী। বিন্দুদিদি, মধ্যে মধ্যে তাকে আসিতে বলিও, এখানে মধ্যে মধ্যে এসে গল্প সল্প করিলে থাকবে ভাল, আহা দিন রাত পড়ে পড়ে শরতের চেহারা কালী হয়ে গিয়াছে, চক্ষু বসে গিয়াছে। কাল সে এসেছিল, হঠাৎ চেনা যায় না।

বিন্দু। সে কি কালী, কৈ তা ত আমরা কিছু জানি না। এখানে যখন আসিত তখন বেশ চেহারা ছিল, এর মধ্যে এমন হয়ে গিয়াছে ? এমন করেও পড়ে ? না হয় পরীক্ষা নাই হইল, তা বলে কি পড়ে ব্যারাম করবে ? আমি বাবুকে বলিব এখন, শরৎ বাবুকে একদিন ডেকে আন্‌বেন, মধ্যে মধ্যে শনিবার কি রবিবার এখানেই না হয় থাকৃলেন।

তাহার পর উমাতারার কথা হইল ; বিন্দু যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, অনেক আক্ষেপ করিয়া কালীকে তাহা শুনাইলেন, কালীও খানিক কাঁদিলেন। বিন্দু শেষে বলিলেন,—

আমি আজই জেঠাইমাকে চিঠি লিখিব, জেঠাইমা আসুন, যাহা করিবার করুন, আমি আর এ কষ্ট দেখিতে পারি না। কলিকাতা ছাড়িতে পারিলে বাঁচি, আবার তালপুখুরে যাইতে পারিলে বাঁচি।

কালী। তোমাদের এই ভাদ্র মাসে যাবার কথা ছিল না ? ভাদ্র মাস ত প্রায় শেষ হইল।

বিন্দু। কথা ত ছিল, কিন্তু হয়ে উঠিল কই? আবার উমাতারার এই রোগ, তোমাদের বাড়ীতে রোগ, এসব রেখে ত যেতে পারি না। পূজার পর না হইলে আমাদের যাওয়া হচ্ছে না, পূজারও বড় দেরি নাই, মাস খানেক ও নাই।

কালী। তবে তোমাদের ধান টান দেখ্‌বে কে?

বিন্দু। বাবু সনাতনকে জমি ভাগে দিয়ে এসেছেন। সনাতন আমাদের পুরাতন লোক, আমাদের অংশ গোলায় বন্ধ করিয়া রাখিবে, তার কোনও ভাবনা নাই।

আর কতক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কালীতারা চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিলেন। বিন্দু কিছু জল খাবার আনিয়া দিলেন, এবং উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

হেম। এদিকে উমাতারার রোগ ও দুর্দ্দশা, ওদিকে কালীতারার স্বামীর উৎকট পীড়া, আবার তুমি বলিতেছ শরৎও নাকি ছেলে মানুষের মত শরীরে যত্ন না নিয়া পড়াশুনা করিতেছে। এখন কোন্ দিক সামলাই? উপায় কি? বিপদে তুমিই মন্ত্রী, ইহার উপায় কি ঠিক করিয়াছ?

বিন্দু। ললাটের লিখন রাজার সৈন্যেও ফিরায় না, মন্ত্রীর মন্ত্রনায়ও ফিরায় না। তবে আমাদের যাহা সাধ্য তাহা করিব।

হেম। তবু কি ঠিক করিলে? উমাকে কি বলিয়া আসিলে?

বিন্দু। কি আর বলিব? আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তাই দিয়া আসিলাম, এখনকার চঞ্চলমতি স্বামীকে বশ করিবার যে মন্ত্রটী জানি, তাহাই শিখাইয়া আসিলাম।

হেম। সে ভীষণ মন্ত্রটী কি, আমি জানিতে পারি কি?

বিন্দু। জান্‌বে না কেন? উমার বাড়ীতে বড় একটী কাঁঠালগাছ আছে; তাহারই ডাল লইয়া প্রকাণ্ড একটী মুগুর প্রস্তুত করিয়া বিপথগামী স্বামীকে তদ্দ্বারা বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া। এই মহা মন্ত্র!

হেম। না, বৃহস্পতির এরূপ মন্ত্র নহে।

বিন্দু। তবে কিরূপ?

হেম। কচি আঁবের অম্বল রাঁধিয়া দেওয়া, পাকা আঁবের সুমিষ্ট রস করিয়া দেওয়া, বৃহস্পতির মন্ত্রের এইরূপ কয়েকটী সাধন দেখিয়াছি, আর বেশি বড় জানি না।

বিন্দু। তবে তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছি। আর জেঠাইমাকে পত্র লিখিব, তিনি আসিলে বোধ হয় উমার মনও একটু ভাল হইবে, ধনঞ্জয় বাবুও লজ্জার খাতিরে কয়েক মাস একটু সাবধানে থাকিবেন।

হেম। জেঠাইমা জামাইয়ের বাড়ীতে আসিবেন কেন?

বিন্দু। আমি সব কথা লিখিলে আসিবেন। হাজার হোক মার মন।

হেম। আর কালীতারার কি উপায় করিলে?

বিন্দু। সেটী তোমাকে দেখিতে হবে। তোমার চাকুরি টাকুরি ত বিলক্ষণ হইল, এখন প্রত্যহ একবার করে কালীঘাটে গিয়া রোগীর যত্ন করিতে হবে। সে বাড়ীতে মানুষের মত মানুষ একজনও নাই, হয় ত ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদগুলা খাওয়াইয়া রোগার রোগ আরও উৎকট করিবে। চিকিৎসাটী যাতে ভাল করিয়া হয়, তুমি দেখিও।

হেম। তা আমার যাহা সাধ্য করিব। কাল প্রত্যুষেই সেখানে যাইব। আর শরতের কি বন্দোবস্ত করিলে? তুমি রইলে একদিকে, আমি রইলাম আর একদিকে, শরৎ বাবুকে একটু দেখে শুনে কে?

বিন্দু। তাইত, সে পাগলা ছেলেটার কথা কৈ আমি ভাবি নাই। ওলো সুধা, তুই একটু শরৎ বাবুর যত্নটত্ন করিতে পারবি? নৈলে ত সে পড়ে পড়ে সারা হইল।

সুধা দূরে খেলা করিতেছিল, দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল দিদি ডাক্‌ছিলে?

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হাঁ বন ডাকছিলাম। বলি তুমি একটু শরৎবাবুর যত্ন করিতে পারবি?

বালিকার কণ্ঠ হইতে ললাট প্রদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইল। সে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শারদীয়া পূজা।

আশ্বিনে অম্বিকাপূজার সময় আগত হইতে লাগিল। ছেলেপুলের বড় আমোদ। নূতন কাপড় হবে, নূতন জুতা হবে, নূতন পোষাক বা টুপি হবে, ইস্কুলের ছুটি হবে, পূজার সময় যাত্রা হবে, ভাসানের দিন গাড়ী করিয়া ভাসান দেখিতে যাবে। বালকবৃন্দ আহ্লাদে আটখানা।

গৃহস্থগৃহিণীদিগের ত আনন্দের সীমা নাই। কেহ বড়

তত্ত্বের আয়োজন করিতেছেন, নূতন জামাইকে ভাল রকম তত্ত্ব করিয়া বেয়ানের মন রাখিবেন। কেহ বড় তত্ত্ব প্রত্যাশা করিতেছেন, পাসকরা ছেলের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন খারাপ হইয়াছিল বলিয়া তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বেয়ানের গোট বেচাইয়া ভাল ঘড়ী আদায় করিয়াছেন, আবার অপরাহ্ণে ছাদে পা মেলাইয়া বসিয়া বুদ্ধিমতী পড়ষী-গৃহিণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন "এবার দেখিব, বেয়ান কেমন তত্ত্ব করে, যদি তত্ত্বের মত তত্ত্ব না করে, নাথি মেরে ফেলে দিব। বিয়ের সময় বড় ফাঁকি দিয়াছে, এবার দেখিব কে ফাঁকি দেয়। আমার ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে, এমন ছেলে কলিকাতায় কটা আছে? মিন্‌সের যেমন বাহাত্তুরে ধরেছে, এমন ছেলেরও এমন ঘরে বিয়ে দেয়! তা দেখিব, দেখিব, তত্ত্বের সময় কড়াগণ্ডা বুঝিয়া লইব, নৈলে আমি কায়েতের মেয়ে নই।" রোরুদ্যমানা বালবধূ বাপের বাড়ী যাইবার জন্য তিন মাস হইতে বৃথা ক্রন্দন করিতেছে, গৃহিণী তত্ত্বটী না দেখিয়া বৌ পাঠাইবেন না।

সামান্য ঘরের যুবতীগণও দিন গণিতেছে, স্বামী বিদেশে চাকুরি করেন, পূজার সময় অনেক কষ্টে ছুটী পাইয়া একবার ভার্য্যার মুখ দর্শন করেন। এবার কি তিনি আসিবেন? সাহেব কি এবার ছুটী দিবেন? হাঁ। গা সাহেবদের কি একটু দয়া মমতা নাই? তাঁদেরও কি স্ত্রী পরিবারের জন্য একটু মন কেমন করে না?

বাবু মহলেও আনন্দের সীমা নাই। কাহারও বজরা ভাড়া হইতেছে, নাচ গানের ভাল রকম আয়োজন হইতেছে, আর

কত কি আয়োজন হইতেছে, আমরা তাহা কিরূপে জানিব? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কায কি?

পল্লিগ্রামেও আনন্দের সীমা নাই। মাতা বসুমতীর অনুগ্রহ অপার, কৃষকগণ ভাদ্র মাসে শস্য কাটিয়া জমীদারের খাজানা দিতেছে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে এক মাস বা দুই মাসের জন্য গৃহে একটু ধান জমাইতেছে। কৃষকবধূগণ লুকিয়া চুরিয়া সেই ধান একটু সরাইয়া হাতের দুগাছি শাঁকা করিতেছে, বা হাটে একখানি নূতন কাপড় কিনিতেছে। বর্ষার পর সুন্দর বঙ্গদেশ যেন স্নাত হইয়া সুন্দর হরিৎবর্ণ বেশ ধারণ করিল; আকাশ মেঘরূপ কলঙ্ক ত্যাগ করিয়া শরতের আহ্লাদকর জ্যোৎস্না বর্ষণ করিতে লাগিল, বায়ু নির্ম্মল হইল, বড় গরম নহে, বড় শীতল নহে, মনুষ্য শরীরের সুখ বর্দ্ধন করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গৃহস্থের ঘর ও ধনধান্যে পূর্ণ হইল, গৃহস্থের মন একটু আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চালে নূতন খড় দিয়া ছাউনি বাঁধা হইল। বঙ্গদেশে শারদীয় পূজার যে এত ধুমধাম, তাহার এই কারণ,— অন্য কারণ আমরা জানি না।

কিন্তু আনন্দময় শরৎকাল সকলের পক্ষে সুখের সময় নয়। দরিদ্রের দুঃখ অপনীত হয়, কিন্তু শোকার্ত্তের শোক অপনীত হয় না। উমাতারার মাতা কলিকাতায় আসিলেন, বিন্দু বার বার উমাকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু উমার রোগের শান্তি হইল না। ধনঞ্জয় বাবু দিন কতক একটু অপ্রতিভের ন্যায় বোধ করিলেন, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস তাঁহার চরিত্রে গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অপনীত হইল না, তিনি

বাড়ী-ভিতরে আসা বন্ধ করিলেন, বাহিরেই আহারাদি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। উমার মাতা পুনরায় পল্লিগ্রামে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিন দিন কন্যার অবস্থা দেখিয়া সহসা কলিকাতা ত্যাগ করিতেও পারিলেন না। হতভাগিনী উমা আরও ক্ষীণ হইতে লাগিল; বর্ষাশেষে তাহার কাশী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; মুখখানি অতিশয় শুষ্ক, চক্ষু দুইটী কোটরপ্রবিষ্ট। কাহাকেও তিরস্কার না করিয়া, আপনার মন্দ ভাগ্যের কথা না কহিয়া, দিনে দিনে ধীরে ধীরে আপনার গৃহ কার্য্য করিত, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করিত, মাতার সেবা সুশ্রুষা করিত, স্বামীর জন্য নানারূপ ব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত।

হেমের যত্নে কালীতারার স্বামীর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইল, কিন্তু আরোগ্য হইল না। সে বয়সে পুরাতন রোগ শীঘ্র যায় না, তাহার উপর বৃহৎ সংসারের নানারূপ উপদ্রব, কালীঘাটের পাণ্ডাদিগের নানারূপ উপদ্রব। অনেক যত্নে যে টুকু ভাল হয় একদিন অনিয়মে সে টুকু আবার মন্দ হয়, হেমচন্দ্র পীড়ার আরোগ্যের বড় আশা করিতে পারিলেন না।

বিন্দু মধ্যে মধ্যে শরৎকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, শরৎ আসিয়া উঠিতে পারিতেন না, তাহার পড়াশুনার বড় ধুম, এখন ভাল করিয়া না পড়িলে পরীক্ষা দিবেন কিরূপে? বিন্দুও বড় জেদ করিতেন না, কেবল প্রত্যহ কোনও নূতন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া কি ফল ছাড়াইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সুধা যত্ন সহকারে মিস্রির পানা প্রস্তুত করিত, আক পেঁপে ছাড়াইয়া দিত, মুগের ডাল ভিজাইয়া দিত, প্রত্যহ অপরাহ্নে নিজ হস্তে

রেকাবি সাজাইয়া ঝিয়ের দ্বারা শরতের বাটীতে পাঠাইয়া দিত। শরৎ অনেক মানা করিয়া পাঠাইত, কিন্তু ছেলেটা কিছু পেটুক, সেই মুগের ডাল গুলির নিদর্শন রেকাবিতে অধিকক্ষণ থাকিত না, একবার চুমুক দিতে আরম্ভ করিলে সে মিস্রির পানা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইত। ঝিকে বলিতেন "ঝি, কাল থেকে আর এনো না, তাঁরা কেন রোজ রোজ কষ্ট করিয়া প্রস্তুত করেন, আমি সত্য বলিতেছি, আমার এ সব দরকার নাই।" ঝি থালি পাত্রগুলি হাতে লইয়া "তা দেখিতেই পাইতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিত। বলা বাহুল্য যে পেটুক বালকের কথায় মানা করা না শুনিয়া সুধা প্রত্যহ মিস্রির পানা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইত।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শেষে পূজা আসিয়া পড়িল। দেবী বাবুর বাড়ীতে বড় ধুম ধাম, দেবীর বৃহৎ মূর্ত্তি, অনেক গাওনা বাজানা, তিন রাত্রি যাত্রা। দেবী বাবুর গৃহিণীর বুকের বেদনাটা সেই সময় বোধ হয় একটু কমিয়াছিল, কেন না, তিনি তিন রাত্রি ধরিয়া সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত বারাণ্ডায় চিক ফেলিয়া ঠায় বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। কবিরাজ গৃহিণীর মতলব বুঝিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—হাঁ তাহাতে হানি কি ? যে তেলটা দিয়েছি সেটা যেন ভাল করিয়া মালিস করা হয়।

দেবী বাবুর গৃহিণীর উপরোধে চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য ভদ্র-গৃহিণীগণ আসিয়া যাত্রা শুনিল। নিতান্ত অনভি-লাবও নাই। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা, রাধিকার মানভঞ্জন, গানগুলি বাছা বাছা, ভাবই কত, অর্থই কত? গৃহিণীগণ

রোরুদ্যমান গণ্ডা গণ্ডা ছেলেগুলোকে থাবড়া মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীতরস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদেশিনীর প্রতি রাধিকার স্তুতি শুনিয়া বৃদ্ধাগণ ভাবে গদ গদ চিত্তে স্বর তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিন্দুও কি করেন, একদিন ছেলে দুটীকে সুধার কাছে রাখিয়া গিয়া যাত্রা শুনে এলেন। সকালে এসে হেমকে বলিলেন,—

মান ভঞ্জন বড় মন্দ হয়নি, তুমি একদিন গিয়ে শুনে এস না।

হেম। না মান ভঞ্জন প্রথা তোমার কাছেই ছেলেবেলা অনেক শিখেছি, আর যাত্রায় কি শিখিব ?

বিন্দু স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—

মিথ্যা কথাগুলা আর বোলিও না, পাপ হবে !

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া দশমী

আজি মহা কোলাহলে ভাসান হইয়া গিয়াছে ; মহানগরীর পথে ঘাটে বাটীতে বাটীতে আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছে, বাদ্য ও গীতধ্বনি শব্দিত হইয়াছে। রাজপথে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি ইতর, কি ভদ্র, কি শিশু, কি যুবা, সকলেই নদীর স্রোতের ন্যায় গমনাগমন করিয়াছে ; নিতান্ত দরিদ্রও এক খানি নূতন বস্ত্র পরিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছে। দেবীর উৎসবধ্বনি অদ্য এই মহানগরীকে পুলকিত ও কম্পিত করিয়া ক্রমে নিস্তব্ধ হইল।

তাহার পর ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত, বন্ধু বন্ধুর সহিত, পুত্র মাতার নিকট, সকলে প্রণাম বা নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা আলিঙ্গন দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করিল। বোধ হইল যেন জগতে আজি বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, যেন শত্রু শত্রুকে ক্ষমা করিল, অপরাধগ্রস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করিল। মনুষ্য হৃদয়ের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাইল, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও বাৎসল্য অদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে উথলিতে লাগিল। শরতের সুন্দর জ্যোৎস্নাতে রাজপথে আনন্দের লহরী, সৌজন্যের লহরী, ভালবাসার লহরী বহিতে লাগিল। সংসারের লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে আমরা অনেক শোকের বিষয়, অনেক দুঃখের বিষয়, অনেক পাপ ও প্রবঞ্চনার বিষয় দেখিয়াছি,—নিষ্ঠুর লেখনীতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অদ্য এই পুণ্য রজনীতে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এই সুখ লহরী দেখিলাম, হৃদয় তুষ্ট হইল, শরীর পুলকিত হইল। এ রজনীতে যদি কোন অপবিত্রতা থাকে, কোনও পাপাচরণ অনুষ্ঠিত হয়,—তাহার উপর যবনিকা পাতিত কর,—সেগুলি আজ দেখিতে চাহি না।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিন্দু রান্নাঘরে ভাত খাইয়া উঠিলেন। ছেলে দুইটী ঘুমাইয়াছে, সুধা ঘুমাইয়াছে, হেমবাবুও শুইয়াছেন, ঝিও বাড়ী গিয়াছে, বিন্দু সদর দরজায় খিল দিয়া নীচে একাকী ভাত খাইলেন, ও উঠিয়া আচমন করিলেন। এমন সময় কপাটে একটী শব্দ শুনিলেন, কে যেন আস্তে আস্তে ঘা মারিল।

এত রাত্রিতে কে আসিয়াছে? বিন্দু একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আবার শব্দ হইল।

কে গা? দরজায় কে দাঁড়িয়ে গা? কোনও উত্তর আসিল না, আবার শব্দ হইল।

বিন্দু কি উপরে গিয়া হেমকে উঠাইবেন? হেম আজ অনেক হাঁটিয়াছেন, অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। বিন্দু সাহসে ভর করিয়া আপনি গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। লোকটীকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারিলেন না, পর মুহূর্ত্তেই চিনিলেন, শরৎচন্দ্র!

কিন্তু এই কি শরৎচন্দ্রের রূপ? বড় বড় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আসিয়া কপালে ও চক্ষুতে পড়িয়াছে, চক্ষু দুটী কোটর-প্রবিষ্ট, কিন্তু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও অতিশয় গম্ভীর, শরীরখানি শীর্ণ হইয়াছে, একখানি ময়লা একলাই মাত্র উত্তরীয়।

উভয়ে ভিতরে আসিলেন,—শরৎ বলিলেন,—

বিন্দুদিদি, অনেক দিন আসিতে পারি নাই, কিছু মনে করিও না, আজ বিজয়ার দিন প্রণাম করিতে আসিলাম।

বিন্দু। শরৎ বাবু বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও, তোমার যে থা হউক, সুখে সংসার কর, এইটী যেন চক্ষে দেখিয়া যাই। ভাইকে আর কি আশীর্ব্বাদ করিব?

বিন্দুর স্নেহ-গর্ভ বচনে শরতের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, শরৎ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না, বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া প্রণাম করিলেন। বিন্দু অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। পরে বলিলেন,—

শরৎ বাবু, তুমি অনেক দিন এখানে আইস নাই, তাহাতে এসে যায় না, প্রত্যহ তোমার খবর পাইতাম, জানিতাম

আমাদের কোনও বিপদ আপদ হইলেই তুমি আসিবে। কিন্তু এমন করে কি লেখাপড়া করে? লেখাপড়া আগে না শরীর আগে? আহা তোমার চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, শরীর জীর্ণ হইয়াছে, এমন করে কি দিন রাত জেগে পড়ে? শরৎবাবু তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে কি বুঝাইতে হয়? তোমার বিন্দুদিদির কথাটী রাখিও, রাত্রিতে ভাল করে ঘুমাইও, দিনে সময়ে আহার করিও, তোমার মত ছেলে পরীক্ষায় অবশ্য উত্তীর্ণ হইবে।

শরতের শুষ্ক ওষ্ঠে একটু হাসি দেখা গেল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—বিন্দুদিদি, পরীক্ষা দিতে পারিলে কি জীবনের সুখবৃদ্ধি হয়? হেমবাবু পরীক্ষা বড় দেন নাই, হেমবাবুর মত সুখী লোক জগতে কয়জন আছে?

বিন্দু। তবে পরীক্ষার জন্য এত চিন্তা কেন? শরীর মাটি করিতেছ কেন?

শরৎ। পরীক্ষার জন্য এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করি না।

বিন্দু। তবে কিসের চিন্তা?

শরৎ উত্তর দিলেন না, বিন্দুকে রকের উপরে বসাইলেন, আপনি নিকটে বসিলেন, বিন্দুর দুই হাত আপন হস্তে ধারণ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে বড় বড় অশ্রু-বিন্দু সেই শার্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া বিন্দুর হাতে পড়িতে লাগিল।

বিন্দু। এ কি শরৎ বাবু! কাঁদ্‌ছ কেন? ছি, তোমার কোনও কষ্ট হয়েছে? মনে কোন যাতনা হয়েছে? তা আমাকে বল্‌ছ না কেন? শরৎ বাবু, ছেলেবেলা থেকে তোমার মনের কোন্ কথাটী বল নাই, আমি কোন্ কথাটী

তোমার কাছে লুকাইয়াছি? এত দিনের স্নেহ কি আজ ভুলিলে, তোমার বিন্দুদিদিকে কি পর মনে করিলে?

শরৎ। বিন্দুদিদি, যে দিন তোমাকে পর মনে করিব সে দিন এ জগতে আমার আপনার কেহ থাকিবে না। আমার মনের যাতনা তোমার নিকটে লুকাইব না, আমি হতভাগা, আমি পাপিষ্ঠ।

বিন্দু দেখিলেন, শরতের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, বিন্দু একটু উদ্বিগ্ন হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—শরৎ বাবু, তোমার মনের কথা আমাকে বল, সঙ্কোচ করিও না।

শরৎ। আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, বিন্দুদিদি, আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, আমার মন পাপ চিন্তায় কৃষ্ণবর্ণ। বন্ধুর গৃহে আসিয়া আমি অসদাচরণ করিয়াছি, ভগিনীর প্রণয়ের বিষময় প্রতিদান করিয়াছি। বিন্দুদিদি, আমার হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার হৃদয় ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত!

শরৎ বিন্দুর হাত দুটী ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে বিন্দুর দুই বাহুদেশ ধরিলেন, এত বলের সহিত ধরিলেন যে বিন্দুর সেই দুর্ব্বল কোমল বাহু রক্তবর্ণ হইয়া গেল। শরতের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে।

বিন্দু শরৎকে এরূপ কখনও দেখেন নাই, তাঁহার মনে সন্দেহ হইল, ভয় হইল। সেই আদর্শচরিত্র ভ্রাতৃসম শরৎ কি মনে কোনও পাপ চিন্তা ধারণ করে? তাহা বিন্দুর স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু অদ্য এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবককে দেখিয়া সেই নিরাশ্রয় রমণীর মনে একটু ভয়

হইল। প্রত্যুৎপন্নমতি বিন্দু সে ভয় গোপন করিয়া স্পষ্টস্বরে বলিলেন,—

শরৎ বাবু, তোমাকে বাল্যকাল হইতে আমি ভাই বলিয়া জানি, তুমি আমাকে দিদি বলিয়া ডাকিতে; দিদির কাছে ভ্রাতা যাহা বলিতে পারে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা বল।

শরৎ। আমি যে অসদাচরণ করিয়াছি, যে পাপ চিন্তা মনে ধারণ করিয়াছি, তাহা ভগিনীর কাছে বলা যায় না, আমি মহাপাপী।

বিন্দু সরোষে বলিলেন,—তবে আমার কাছে সে কথা বলিবার আবশ্যক নাই, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ভগিনীকে সম্মান করিও।

শরৎ বিন্দুর বাহুদ্বয় ছাড়িয়া দিলেন, আপনার মুখখানি বিন্দুর কোলে লুকাইলেন, বালকের ন্যায় অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন।

বিন্দু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শিশুর ন্যায় যাহার নির্ম্মল আচরণ, শিশুর ন্যায় যে পদতলে পড়িয়া কাঁদিতেছে, সে কি পাপ চিন্তা ধারণ করিতে পারে? ধীরে ধীরে শরতের মুখখানি তুলিলেন, ধীরে ধীরে আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়নবারি মুছাইয়া দিলেন, পরে আস্তে আস্তে বলিলেন,—

শরৎ, তোমার হৃদয়ে এমন চিন্তা উঠিতে পারে না, যাহা আমার শুনিবার অযোগ্য। তোমার যাহা বলিবার বল, আমি শুনিতেছি।

শরৎ। জগদীশ্বর তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে সুখী করুন। বিন্দুদিদি, আর একটী অভয়দান কর, যদি

আমার প্রার্থনা বিফল হয়, প্রতিজ্ঞা কর, তুমি এ কথাটী কাহাকেও বলিবে না। আমার পাপ চিন্তা আমার জীবনের সহিত শীঘ্র লীন হইবে, জগতে যেন সে কথা প্রকাশ না হয়।

বিন্দু। তাহাই অঙ্গীকার করিলাম।

শরৎ তখন মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেন, দুই হস্ত দ্বারা হৃদয়ের উদ্বেগ যেন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার বিন্দুর হাত দুটী ধরিয়া, তাঁহার চরণ পর্য্যন্ত মাথা নমাইয়া, অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "পুণ্যহৃদয়া, সরলা বিধবা সুধার সহিত আমার বিবাহ দাও।" বিন্দু তখন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছয় মাসের সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

শরৎ তখন ক্লিষ্ট স্বরে বলিতে লাগিল,—বিন্দুদিদি, আমি মহাপাপী। ছয়মাস হইল, যে দিন সুধাকে তালপুখুরে দেখিলাম সেই দিন আমার মন বিচলিত হইল। পুস্তক পাঠ ভিন্ন অন্য ব্যবসা আমি জানিতাম না, পুস্তকে ভিন্ন প্রণয় আমি জানিতাম না, সে দিন সেই সরলহৃদয়া, স্বর্গের লাবণ্যে বিভূষিতা, ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখিয়া আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব করিলাম। কালে সেটী তিরোহিত হইবে আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দিন দিন কলিকাতায় অধিক বিষ পান করিতে লাগিলাম, আমার শরীর, মন, আত্মা জর্জ্জরিত হইল। বিন্দুদিদি, তুমি সরল হৃদয়ে আমাকে প্রত্যহ তোমার বাটীতে আসিতে দিতে, হেমবাবু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া আমাকে আসিতে দিতেন, আমি হৃদয়ে কালকূট ধারণ করিয়া, পাপ চিন্তা ধারণ করিয়া, দিনে দিনে এই পবিত্র

সংসারে আসিতাম। জগদীশ্বর এ মহাপাপ, এ মহা প্রতারণা কি ক্ষমা করিবেন? বিন্দুদিদি, তুমি কি ক্ষমা করিবে? সুধার পীড়ার পর যখন প্রত্যহ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিতাম, অনেকক্ষণ বসিয়া দুই জনে গল্প করিতাম, অথবা আকাশের তারা গণিতাম, তখন আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া যে কি পাপ চিন্তা করিতাম, বিন্দুদিদি, তোমাকে কি বলিব! আমার বিবাহ হইবে, একটী সংসার হইবে, লাবণ্যময়ী সুধা সে সংসারে রাজ্ঞী হইবে, আমার জীবন সুধাময় করিবে, এই চিন্তা আমাকে পূর্ণ করিত, এই চিন্তা আকাশের নক্ষত্রে পাঠ করিতাম, এই চিন্তা বায়ুর শব্দে শ্রবণ করিতাম। প্রত্যহ আসিতে আসিতে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্য হইলাম, তখন হেম বাবু আমার পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া একদিন কয়েকটী উপদেশ দিলেন। তখন আমার জ্ঞান আসিল, পাঠ্য পুস্তক ও পরীক্ষা চিতার আগুণে দগ্ধ হউক,—কিন্তু যে উৎকট বিপদে আমি পড়িয়াছি, পাছে সরলচিত্তা সুধা সেই বিপদে পড়ে, এই ভয় সহসা আমার হৃদয়ে জাগরিত হইল, আমি সেই অবধি এ পুণ্য-সংসার ত্যাগ করিলাম। সুধাকে না দেখিয়া আমিও তাহার চিন্তা ভুলিব মনে করিয়াছিলাম,—কিন্তু সে বৃথা আশা! বিন্দুদিদি, সে পাপ চিন্তা ভুলিবার জন্য আমি দুই মাস অবধি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সে বৃথা চেষ্টা নদীর স্রোত হস্ত দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টার ন্যায়! আমি পাঠে মন রত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, নাট্যশালায় যাইয়া সে চিন্তা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার সহপাঠীদিগের সহিত মিশিয়াছি, গীত বাদ্য শুনিতে গিয়াছি, কিন্তু সে কাল

চিন্তা ভুলিতে পারি নাই। ঘরের দেয়ালে, নৈশ আকাশে, আমার পুস্তকের পংক্তিতে পংক্তিতে, নাট্যশালার, নাট্যাভিনয়ে, সেই অনিন্দনীয় মুখমণ্ডল দেখিতাম ;—রাত্রিতে সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতাম। বিন্দুদিদি, এ দুই মাসের কথা আর বলিব না, পথের কাঙ্গালীও আমা অপেক্ষা সুখী।

বিন্দুদিদি, আমার মনের কথা তোমাকে বলিলাম, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমাকে মহাপাপী বলিয়া দূর করিয়া দিও না। আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু তুমি ঘৃণা করিলে এ জগতে কে আমাকে একটু স্নেহ করিবে, কে আমাকে স্থান দিবে ? আবার শরতের শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া নয়ন বারি বহিতে লাগিল।

বিন্দু স্থির হইয়া এই কথা গুলি শুনিলেন, কি উত্তর দিবেন ? শরতের প্রস্তাব পাগলের প্রস্তাব, কিন্তু সে কথা বলিলে হয় ত এই ক্ষিপ্তপ্রায় যুবক আজই আত্মঘাতী হইবে। বিন্দু ধীরে ধীরে শরতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—

ছি শরৎ বাবু, আপনাকে এমন করে ক্লেশ দিও না, আপনাকে ধিকার করিও না। তোমাকে ছেলে বেলা থেকে আমি ভাইয়ের মত মনে করি, তোমাকে কি আমি ঘৃণা করিতে পারি ? এতে ঘৃণার কথা ত কিছুই নাই, কেন আপনাকে মহাপাপী বলিয়া ধিকার করিতেছ। তবে বিধবা বিবাহ আমাদের সমাজে চলন নাই, তা এরূপ বিবাহ হয় কি না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিব, যাহা হয় তিনি ব্যবস্থা করিবেন। তা তুমি আপনাকে এরূপে ক্লেশ দিও না, তোমার এ কথায় বাবুর যাহাই মত হউক না কেন, তোমার প্রতি আমাদের স্নেহ এ জীবনে তিরোহিত হইবে না।

শরৎ। বিন্দুদিদি, তোমার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, তুমি আমাকে যে এই দয়া করিলে, আমাকে যে আজ ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিলে না, এ দয়া আমি জীবন থাকিতে বিস্মৃত হইব না।

বিন্দু। শরৎ বাবু, তোমার বোধ হয়, আজ রাত্রিতে এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই, কিছু খাবে? একটু মুখটুক খোও না? বাবুর জন্য আজ লুচি করেছিলাম, তার খানকত আছে। একটী সন্দেশ দিয়ে খাবে?

শরৎ। না দিদি আজ কিছু খাইব না, খাদ্যে আমার রুচি নাই।

বিন্দু। তবে কাল সকালে একবার এস, বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিও।

শরৎ। ক্ষমা কর, এ বিষয়ে হেমবাবু যাহা বলেন, আমাকে বলিও, তাহার পূর্ব্বে আমি হেম বাবুর কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।

বিন্দু। তা কাল না আসিলে নেই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এস, এমন করে আপনাকে কষ্ট দিলে অসুখ করিবে যে।

শরৎ। দিদি ক্ষমা কর, এ বিষয় নিষ্পত্তি না হইলে আমি সুধার কাছে মুখ দেখাইব না। দেখিও বিন্দুদিদি, একথা যেন সুধার কাণে না উঠে, তাহার মন যেন বিচলিত না হয়। আমার আশা যদি পূর্ণ না হয়, জগতে একজন হতভাগা থাকিবে, আর একজনকে হতভাগিনী করিবার আবশ্যক নাই।

বিন্দু। তা তবে এ বিষয়ে বাবুর যা মত হয় তাহা তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব।

শরৎ। না দিদি, পত্রে এ কথা লিখিও না, আমি আপনি আসিয়া তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কবে আসিব বল, আমার জীবনে বিধাতা সুখ লিখিয়াছেন কি দুঃখ লিখিয়াছেন কবে জানিব বল।

বিন্দু। শরৎ বাবু, এ কথা ত দুই একদিনে নিষ্পত্তি হয় না, অনেক দিক দেখতে হবে, অনেক পরামর্শ করতে হবে! তা তুমি দিন ১৫। ১৬ পরে এস।

শরৎ। তাহাই হউক। আমি কালীপূজার রাত্রিতে আবার আসিব, এ কয়েকদিন জীবন্মৃত হইয়া থাকিব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মেয়ে মহলের মতামত।

শরৎ বাবু যেই বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, অমনি দেবী বাবুর বাড়ীর একটা ঝি ঠাকুরের প্রসাদ এক থাল ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। ঝি থাল নামাইয়া বলিল,—মাঠাকরুণ তোমাদের জন্য এই ঠাকুরের প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন গো! অনেক বাড়ীতে যেতে হয়েছিল তাই আসতে একটু রাত হইল।

বিন্দু। থাল রাখ বাছা, ঐ রকে রাখ, কাল আমাদের ঝিকে দিয়া থালা পাঠাইয়া দিব।

ঝি রকের উপর থাল রাখিল। গার কাপড় খানা একটু টানিয়া গায়ে দিয়া একটু মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, গালে একটী আঙ্গুল দিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিল।

বিন্দু। কি লো কি হয়েছে? তোদের বাড়ীতে পূজার কোন তামাসা টামাসা হয়েছে নাকি, তাই বলতে এসেছিস?

ঝি। হ্যাঁ তামাসাই বটে, ভদ্দর নোকের ঘরে হইলেই তামাসা, আমাদের ঘরে হইলেই নোকে পাঁচ কথা কয়!

বিন্দু। কি লো, কি তামাসা, কোথায় হয়েছে?

ঝি। না বাপু, আমরা গরিব গুরবো নোক, আমাদের সে কথায় কায কি বাপু। তবে কি জান, নোকে এ সব দেখলেই পাঁচ কথা কয়।

বিন্দু। কি দেখলি রে, ভেঙ্গেই বল না।

ঝি আর একবার কাপড়টা সোর করে নিয়া আর একটু মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল—বলি ঐ ছোঁড়াটা এত রাত্তিরে বেরিয়ে গেল, ও কে গা?

বিন্দু একটু ভীত হইলেন। সদর দরজাটা এতক্ষণ খোলা ছিল, ঝি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরতের কথা গুলি শুনিয়াছে? একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

তুই কি চখের মাথা খেয়েছিস? শরৎ বাবু এসেছিলেন চিন্‌তে পারিস নি? তুই কি আজ নেক্‌রা কর্‌তে এসেছিস?

ঝি। না চখের মাথা খাই নি গো, শরৎ বাবু তা চিনেছি। তা ভদ্দর নোকের ছেলে কি ভদ্দর নোকের মেয়ের সঙ্গে অমনি করে হাত কাড়াকাড়ি করে? জানি নি বাবু তোমা-দের পাড়াগাঁয়ে কি নিয়ম, আমি এই উনত্রিশ বছর কলকেতায় চাকরি কর্‌ছি, কৈ এমন ধারাটী দেখি নি। তা ভদ্দর নোকের কথায় আমাদের কায কি বাবু? আমরা দুবেলা দুপেট খেতে পাই তাই ভাল, আমাদের ও সব কথায় কায কি?

দেবীবাবুর বাড়ীর ঝি গুলা বড় বেয়াড়া তাহা বিন্দু পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য এই ঝির এই বিদ্রূপপূর্ণ অঙ্গ ভঙ্গী ও কথা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ক্রোধে আরও অনিষ্ট হইবে জানিয়া তাহা সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—

ও কি জানিস ঝি, শরৎ বাবুর মা ত বিয়ে দেয় না, তাই বাসায় একলা থেকে বই পড়ে পড়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছে, কি বলে, কি কয়, তার ঠিক নেই।

ঝি। হ্যাঁ গা তা শরৎ বাবু পাগলই হউক আর ছাগলই হউক পরের বাড়ী এসে উৎপাত করে কেন? বিয়ে-পাগলা হয়ে থাকে একটা বিয়ে করুক গিয়ে, তোমাকে এসে টানা-টানি করে কেন? তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চায় নাকি?

বিন্দু। দূর পোড়ামুখী! তোর মুখে কি কথা আটকায় না লা? যা মুখে আসে তাই বলিস? শরৎ বাবু একটী মেয়েকে দেখেছেন তার সঙ্গে বিয়ে করতে চায়। তা শরৎ বাবু সে কথা বাড়ীর কাউকে বলতে পারে না, লজ্জা করে, তাই আমার কাছে বলতে এসেছিল।

ঝি। সে কে গা? কোন্ মেয়েটী?

বিন্দু। তা জন্‌বি এখন, সম্বন্ধ যদি ঠিক হয় তোরা সব্বাই জান্‌বি।

ঝি। হ্যাঁ গা, আর লুকালে চলবে কেন? আমরা কি আর কিছু জানিনি গা? আমরা ত আর বুড়ো হাবড়া হই নি, চক্ষের মাথাও খাই নি, কানের মাথাও খাই নি। ঐ যে সুধা সুধা করে চেঁচিয়ে শরৎ বাবু কাঁদছিলেন, যেন সুধার জন্য বুক ফেটে যাচ্ছিল, তা কি আর শুনিনি গা? এ কথা তোমরা

বলবে কেন? এ কথা কি ভদ্দর নোকে বলে, না কেউ কখনও শুনেছে। বিধবার আবার বিয়ে? ও মা ছি! ছি! ছি! ভদ্দর নোককে দণ্ডবৎ, আমাদের ঘরে এমন কথাটী হইলে তাকে একঘরে করে। ও মা ছি! ছি! ছি! এমন কলঙ্কের কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে; এ ভদ্দরের ঘর? মুচি মুচুনমানের ঘরে ত এমন কথা কেউ শুনে নি। ও মা ছি! ছি! ছি! ও মা অবাক্ কল্লে মা, ও মা কোথা যাব মা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিন্দু এবার যথার্থই ভীত হইলেন। বড় মানুষের ঘরের গর্ব্বিণী মন্দভাষিণী ঝি যতক্ষণ তাঁহার উপর ব্যঙ্গ করিতেছিল ততক্ষণ বিন্দু সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সুধার নামে এ কলঙ্ক রটাইবে ভাবিয়া বিন্দু হতজ্ঞান হইলেন। শরতের পাগলামী প্রস্তাবে তিনি কখনই সম্মত হইবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধবার নামে সামান্য মিথ্যা কলঙ্কও বড় ভয়ানক, মিথ্যা সত্য কেহ ভাবে না, কলঙ্ক চারি দিকে বিস্তৃত হয়, অপনীত হয় না।

বুদ্ধিমতী বিন্দু তখন একটু চিন্তা করিয়া বাক্স হইতে একটী টাকা বাহির করিলেন। অন্য দিন দেবী বাবুর বাটী হইতে খাবার আসিলে ঝিদের দুই আনা পয়সা দিতেন, অদ্য সেই টাকাটী ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন,—

ঝি, তুই দেবী বাবুর বাড়ীতে অনেক দিন আছিস, পূজার সময় তোকে আর কি দিব, এই একটী টাকা নিয়ে যা, এক খানা নূতন কাপড় কিনিস। আর শরৎ যে পাগলের মত কথা গুলা বলিয়াছে, সে কথা আর কাউকে বলিস নি। আজ দশমীর দিন, বোধ হয় কোথাও সিদ্ধি খেয়ে এসেছিল, তাই

পাগলের মত বকেছিল। তা পাগলের কথা কি ধরিতে আছে, ভদ্র ঘরে এমনও কি হয়, আমাদের একটু মান সম্ভ্রমও আছে, শরৎ বাবুর ও মা আছেন, বোন আছেন, এমন কাযও কি হয়ে থাকে? তা পাগলের কথা যা শুনেছিস্ শুনেছিস্, কাউকে বলিস নি বাছা, এ পাগলামি কথা যেন কেউ টের পায় না।

চক্‌চকে টাকাটী দেখিয়া ঝির মত একটু ফিরিল, (অনেকেরই ফেরে,) সে বলিল,—

তা বৈ কি মা, পাগলের কথা কি ধর্‌তে আছে না বল্‌তে আছে? শরৎ বাবু একটু সিদ্ধি খেয়েছিলেন বই ত নয়, এই আমাদের বাড়ীর ছেলেরা যে বোতল বোতল কি আনাচ্ছে আর খাচ্ছে। আর কি বা আচরণ! রাত্রিতে বাড়ী থাকে না, বাপ মাকে একটু ভয় করে না, লজ্জা করে না। এখনকার সব অমনি হয়েছে গো, তা এখনকার ছেলেদের কথা কি ধর্‌তে আছে? শরৎ বাবু যা বলেছে বলেছে, তা সে কথা কি আমি মুখে আন্‌তে পারি, না কাউকে বল্‌তে পারি? কাউকে বল্‌ব না মা, তুমি কিছু ভেবো না।

ঝি তুষ্ট হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে মুহূর্ত্তের মধ্যে তারের সংবাদ যেমন জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, বিন্দুর বাড়ীর কথা সেই রাত্রিতেই সেইরূপ ভবানীপুর, কালীঘাট, কলিকাতা অতিক্রম করিল। পরদিন প্রাতে ঢি ঢি পড়িয়া গেল।

দেবী বাবুর মহিষী পরদিন পা ছড়াইয়া তেল মাখিতে মাখিতে এই কলঙ্ক কথা শুনিয়া একেবারে ভেক দর্শনে সর্পের ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিলেন।

হ্যাঁ গা, তা হবে না কেন গা, তা হবে না কেন? এখন ত আর ভদ্র ইতরে বাছ বিচার নাই, যত ছোট লোক পাড়া গাঁ থেকে এসে কায়েত বলে পরিচয় দেয়, অমনি কায়েত হয়ে যায়। ওদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কায়েতের সঙ্গে ক্রিয়া কর্ম্ম করেছে, না কায়েতের মান রাখতে জানে? ওদের সঙ্গে আবার খাওয়া দাওয়া!—মিন্সের ঘটে ত বুদ্ধি নাই তাই ওদের সঙ্গে চলা ফেরা করে। দেব এখন আজ মিন্সেকে দুকথা শুনাইয়ে, আপনার মান মর্য্যাদা জানে না, ভারি হৌসে কর্ম্ম হয়েছে, যার তার সঙ্গে চলা ফেরা করে। ওগো আমি তখনই বুঝেছি গো তখনই বুঝেছি, যখন ভবানীপুরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে বার হয় না, ডেকে পাঠাতে হয়, তখনই বুঝেছি কেমন কায়েত। আর সেই অবধি আর আসা হয় নি, জাঁক কত, ঐ বিধবা ছুঁড়ীটাকে আবার পাড়ওলা কাপড় পরান হয়, কত আদর করা হয়। তা হবে না? এ সব হবে না? যেমন জাত, তেমনি আচরণ, হাড়ী মুচীদের ঘরে আর কি হবে? ঐ যে মুচুনমানদের বিধবার নিকে হয় না? এ তাই লো তাই।

শ্যামীর মা। (গৃহিণীর ব্যথার জন্য বুকে ও হাতে ঘন ঘন তৈল্য মার্জ্জন করিতে করিতে) তা না ত কি বন্ ওরা আবার কায়েত! কায়েত হলে বিধবাটাকে অমনি করে রাখে। ও মা ঐ ছুঁড়ীটা আবার একাদশীর দিন জল টল খায়, গায়ে তেল মাখে, মাছ না হলে ভাত খাওয়া হয় না, ছি! ছি! ছি! এই আজ একাদশী, কেউ বলুক দেখি যে সকাল থেকে একটু জল গ্রহণ করেছি।

বামীর মা। (গৃহিণীর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে,) "আবার স্বহু তাই? আবার গাড়ী করে ঐ ছুঁড়ীটাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়, শরৎ বাবু আবার ওটাকে নাকি রোজ রোজ দেখতে আসে! ছি! ছি! লজ্জার কথা, লজ্জার কথা।

গৃহিণী। অমন মেয়েকেও ধিক্! মেয়ের মাকেও ধিক্! অমন মেয়ে কি গর্ভে ধারণ করে? অমন মেয়ে জন্মালে মুখে নূন দিয়ে মেরে ফেল্‌তে হয়। বিধবা হয়েছে তবু লজ্জা নেই, মাথার কাপড় খুলে শরতের সঙ্গে ছাতে বেড়ান হয়, শরতের জন্য মিস্রিরপানা করে পাঠান হয়! তা শরৎ বাবুর কি দোষ বল? পুরুষের মন বৈ ত নয়, তাতে আবার বিয়ে থা হয় নি, ছুটো বোনে অমন করে ছেলে মানুষকে ভোলালে সে আর ভুল্‌বে না? অমন মেয়ের মুখ দেখতে আছে? ঝেঁটা মার, ঝেঁটা মার!

এইরূপে গৃহিণীও তাঁহার সঙ্গিনীদিগের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি ক্রমে সপ্তমে চড়িতে লাগিল, বিন্দুর মা, বিন্দুর বাপ, বিন্দুর চতুর্দ্দশ পুরুষ অবধি যাবতীয় পুরুষ স্ত্রীর বিশেষ স্তুতিবাদ করা হইল, রোষে গৃহিণীর বুকের ব্যথাটা বড়ই বাড়িল, ঘন ঘন কবিরাজ আসিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় বাবু আপিস থেকে আসিয়া গৃহিণীর পীড়া দেখিতে আসিয়া যেরূপ মধুর আলাপ শ্রবণ করিলেন, মনুষ্য ভাগ্যে সেরূপ কদাচ ঘটে!

গৃহিণীর গলার শব্দ শুনিয়া ঝি বৌরা পাতকোতলায় জড় সড় হইয়া কানা কানি করিতে লাগিল।

প্রথমা। কি লো কি হয়েছে, অত চেঁচাচেঁচি কেন?

দ্বিতীয়া। অলো তা শুনিস্ নি, তবে শুনিছিস কি?

প্রথমা। ওলো কি লো কি?

দ্বিতীয়া। ওলো ঐ যে হেম বলে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, সেই তার স্ত্রী আর শ্যালী আমাদের বাড়ী একদিন এসেছিল, তা সেই শালী নাকি বিধবা, তার আবার শরৎ বাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে।

তৃতীয়া। দূর পোড়াকপালী! তাও কি হয় লো, বিধবার আবার বিয়ে হয়?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন, ঐ যে বিদ্যাসাগর বলে বড় পণ্ডিত আছে, ঐ যার সীতার বনবাস তুই সে দিন পড়্‌ছিলি, ঐ সেই নাকি বলেছে বিধবার বিয়ে হয়। সে নাকি কয়েকজন বিধবার বিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থী। সে ত বড় রসের সাগর লো, বিধবার আবার বিয়ে দেয়? তা বিধবা যদি বুড়ী হয় তবুও বিয়ে হয়?

দ্বিতীয়া। তা হবে না কেন, ইচ্ছে করলেই হয়।

চতুর্থী। তবে শামীর মা আর বামীর মা কি দোষ করেছেন, চুরি করে দুদ টুকু খান, মাচ টুকু খান;—তা বিদ্যাসাগরকে বলে বিয়ে করলেই হয়, আর কিছু লুকোতে চুরোতে হয় না।

প্রথমা। চুপ কর লো চুপ কর, এখনই শুন্‌তে পেলে বোকে ফাটিয়ে দেবে। তা শরৎ বাবু শুনেছি ভাল ছেলে, তিনি এমন করেন কেন?

দ্বিতীয়া। আর ভাল ছেলে, বলে যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম! ভাল ছেলে হলে কি হয়, ফুট্‌ফুটে মেয়েটী দেখেছে মন ভুলে গেছে।

তৃতীয়া। হ্যাঁ দিদি, সে হেমবাবুর শ্যালীর বয়স কত গা।

দ্বিতীয়া। বয়সও ১৩।১৪ বৎসর হয়েছে, দেখতেও সুন্দর, হেসে হেসে শরৎ বাবুর সঙ্গে কথা কয়, মিস্রির পানা খাওয়ায়, তার সঙ্গে না জানি কি খাওয়ায়, তাতে আর শরৎ বাবু ভুলবে না? হাজার হোক পুরুষের মন ত।

চতুর্থা। তবে শরৎ বাবুর সঙ্গে সে মেয়েটীর অনেক দিনের আলাপ?

দ্বিতীয়া। তবে আর শুনছিস কি, এ রসের কথা বুঝলি কি? আলাপ সেই পাড়া গাঁ থেকে। কি জানি বাবু সেখানে কি হয়েছে, না জেনে শুনে পরের নিন্দা করা ভাল নয়, কিন্তু কলিকাতায় এসে যে ঢলনটা ঢলিয়েছে তা আর ভবানীপুরে কে না জানে? ওলো শরৎ বাবু সেই মেয়েটীকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে কতদিন রাখে, তার বন আর হেমবাবুও সেই বাড়ীতে ছিলেন। হেমবাবু নাকি গতিক মন্দ বুঝে আলাদা বাড়ী করলেন, তা সেখানে অমনি রাধিকা বিরহ বেদনায় অচেতন হইয়া পড়িলেন, নতা করিলেন, যে ভারি জ্বর হইয়াছে, আবার আমাদের কৃষ্ণঠাকুর সেখানে গিয়ে উপস্থিত! ওলো এ ঢের কথা লো! বলি বিদ্যাসুন্দর পড়িছিস? এ তাই লো তাই। এখনকার ছেলেরা সব সুড়ঙ্গ কাটতে শিখিয়াছে, দেখিস্ লো সাবধান।

চতুর্থা। দুর পোড়ামুখী।

দাসী মহলেও বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বুড়ী ঝির কাছে শুনে নবীনা ঝিরা সকাল থেকে বারাণ্ডায়, উঠানে, রান্নাঘরে কানাকানি করিতেছে আর ফিস্ ফিস্ করিতেছে। একজন তম্বঙ্গী নবীনা বলিল,—

হ্যাঁলা এ কি সত্যি লা, সত্যি কি বিধবার বিয়ে হবে নাকি ?

স্থূলাঙ্গী নবীনা উত্তর করিল, তবে শুন্‌ছিস্ কি, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, পত্তর হয়ে গেছে, হেমবাবু সেকরাকে গয়না গড়াইতে দিয়েছে, আর তুই এখনও হবে কি না, জিজ্ঞেস করচিস ?

তন্বঙ্গী। তবে ত এটা চলন হয়ে যাবে! ভদ্দর ঘরে হলে তো ছোট নোকের ঘরেও হবে ?

স্থূ। কেন লো তোর আবার সক গেছে নাকি ? ঐ, ঐ কৈবর্ত্ত ছোঁড়াটাকে বে করবি নাকি ? ঐ তোদের কেউ হয় না ? ঐ যে ফিস্ ফিস্ করে তোর সঙ্গে সদাই কথা কয় ?

ত। দূর পোড়ামুখী! অমন কথা আমাকে বলিস নি। তোর আপনার মনের কথা বলছিস বুঝি ? ঐ যে তোদের জেতের সদানন্দ বেণে আছে না, তার সে দিন বৌ মরে গেছে, তার এখন ভাত রেঁধে দেয় এমন নোকটি নেই। তা ধনে মশলা কেনবার নতা করে যে ঘন ঘন তার দোকানে যাওয়া হয়, বলি, তার ঘর করতে ইচ্ছে হয় নাকি ?

স্থূ। তোর মুখে আগুন।

এইরূপে দুইজন নবীনা পরস্পরের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে এমন সময় একজন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া বলিল,—কি লো তোরা গালাগালি করছিস কেন লো ?

স্থূ। না গো কিছু নয়, এই শরৎ বাবুর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে তাই বলছিনু। ভদ্দর যাই করে তাই সাজে গা, আর আমাদের সময় যত কলঙ্ক!

বৃদ্ধা। তা এটা কি ভদ্দরের কায ? এত মুচুনমানের কায।

স্থ। তবে হেমবাবু এমন কায করেন কেন।

বৃদ্ধা। করেন তার কারণ আছে, তোরা কি জানবি বল? তোরা কানে তুলো দিয়ে থাকিস, এ কথার কি জানবি বল?

উভয় নবীনা। কি, কি, বল্‌না দিদি, এর কথাটা কি?

বৃদ্ধা। বলি শুনিস নি বুঝি? হেম বাবু যে এখন আর না বিয়ে দিয়ে পারে না, সে কথা শুনিস নি বুঝি?

উভয়ে। না, না, কি, কি?

বৃদ্ধা। এই শুনবি আয় কানে কানে বলি।

উভয় নবীনা কায কর্ম্ম ফেলিয়া বৃদ্ধার কাছে দৌড়াইয়া আসিল। বৃদ্ধা তাদের কানে কানে বলিল,—সে শব্দটী তেতালা পর্য্যন্ত ও বার বাড়ী পর্য্যন্ত শুনা গেল,—"বলি শুনিস নি? হেম বাবুর শ্যালী যে পোয়াতী!"

সত্যের আবিষ্কার হইতে লাগিল, সত্য প্রচারিত হইতে লাগিল!

ভবানীপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত খবর গেল। কালী-তারার তিন খুড় শাশুড়ী সে দিন একাদশী করিয়া রুক্ষস্বভাব হইয়া আছেন, তাঁহারা এই সংবাদ শুনিয়া একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলে গেলেন। বড়টী একটু ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন,—

এখনকার কালে আর ধর্ম্ম নাই, বাছ বিচার নাই, যার যা ইচ্ছা সে তাই করে। করুক গিয়ে বাবু, যে পাপ করবে সেই নরক ভুগবে, আমাদের সে কথায় কায কি?

ছোটটী বলিলেন,—কি হয়েছে কি হয়েছে? আমাদের বৌয়ের ভাই বিধবা বিয়ে করবে? ও মা কি ঘেন্নার কথা গা, ছি! ছি!

ছি! নোকের কি এখন মান সম্ভ্রম নাই, একটু নজ্জা নাই, যা ইচ্ছে তাই করে? এ যে হাড়ী ডোমেও এমন কায করে না, এ যে আমাদের কুলে কালী পড়িল, এ যে ছোট নোকের মেয়ে বিয়ে করে আপনার কুলটা মজালেন। ও মা ছি! ছি! ছি!

মেজটী একেবারে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কালীতারাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ও পোড়ামুখী, ও হারামজাদী, বলি হেঁলা, এই তোদের মনে ছিল লা? ওলো গলায় দড়ী দিবার জন্য কি একটা পয়সা মেলেনি লা? বলি কলসী গলায় বেঁধে আদিগঙ্গায় ডুবে মরিস নি কেন? মর, মর, মর। আমাদের কুলে এই লাঞ্ছনা! ওলো বাগ্‌দীর মেয়ে! বলি শ্বশুর কুলটা একেবারে ডোবালি রে? তা রোস না, বিয়ে হোক না, তোরই একদিন কি আমারই একদিন। নোড়া দিয়ে তোর মুখ ভোতা করে দিব না? তোর পিটে মুড়ো খেংরা ভাঙ্গবো না? মাথায় ঘোল ঢেলে তোকে ঝেঁটা মেরে যদি বের করে না দি, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।

কালীতারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল,—সন্ধ্যার সময় বিন্দুকে চিঠি লিখিলেন,—

"বিন্দুদিদি, এ কি কথা, এ ত আমি শুনিনি, এ অপযশ, এ নিন্দা, এ কলঙ্ক কি আমাদের কুলে?

"বিন্দুদিদি এ কাযটী করিও না। শরৎ যদি পাগল হইয়া থাকে তাকে তোমাদের বাড়ী ঢুকিতে দিও না। এ কায হইলে আমি শ্বশুর বাড়ী মুখ দেখাতে পারব না, শাশুড়ীরা আমাকে আস্ত রাখবে না,—তোমার কালীতারাকে, আর দেখিতে পাবে না।

কলিকাতায় সে সংবাদ রটিল। বিন্দুর জেঠাইমা লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, বিন্দু তোকে আর সুধাকে আমি পেটের ছেলের মত মনে করি, পেটের ছেলের মত মানুষ করেছি। বুড়ি জেঠাই মাকে এই বয়সে খুন করিস নি, মল্লিক বংশ একেবারে কলঙ্কে ডুবাস নি। বাছা বিন্দু তোর জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, বাপ মার কুল নরকে ডুবাসনি। বাপ মা থাকিলে কি এমন কাযটী করতিস বাছা?

বিন্দুর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। বিন্দু দেখিলেন, ঝিকে যে একটী টাকা দিয়াছিলেন তাহাতে কোনও ফল হয় নাই; কলঙ্ক জগৎ সুদ্ধ রটিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরুষ মহলের মতামত।

হেমচন্দ্র বিন্দুর নিকট সমস্ত কথা অবগত হইয়া অন্তঃকরণে বড়ই ব্যথিত হইলেন। শরতের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তাহার কিছুমাত্র লাঘব হইল না, শরতের প্রস্তাবটী তিনি পাপ প্রস্তাব মনে করিলেন না। তথাপি তিনি শান্ত স্থিতিপ্রিয় লোক ছিলেন, সমাজের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া সকল বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশীয়দিগকে মনে ক্লেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্য বিবেচনা করিলেন না। যাহা হউক তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া, অনেক পরামর্শ লইয়া যাহা হউক নিষ্পত্তি করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরামর্শের অভাব রহিল না। পরামর্শ-দাতাগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন, হিতৈষী বন্ধুগণ হিত কথা বলিতে আসিতে লাগিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় কথা বলিতে আসিলেন, সমাজ-সংস্কারকগণ প্রকৃত সংস্কার কাহাকে বলে বুঝাইতে আসিলেন, সমাজ সংরক্ষকগণ সংরক্ষা বুঝাইতে আসিলেন। ভবানীপুরে তাঁহার এত বন্ধু ছিল হেমচন্দ্র পূর্ব্বে তাহা অনুভব করেন নাই।

প্রথমে জনার্দ্দন বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু, হরিহর বাবু প্রভৃতি বৃদ্ধ সমাজপতিগণ আসিয়া হেম বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ এ দিক ওদিক কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেম বাবু অতি ভদ্র কায়স্থ সন্তান, তাঁহার শিষ্টাচারে সকলেই তুষ্ট আছে, তাঁহারা সর্ব্বদাই হেম বাবুর তত্ত্ব লইয়া থাকেন, ও হিত কামনা করেন, হেম বাবুর চাকুরির কি হইল, তিনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিয়া ভাল করিয়া চেষ্টা করেন না কেন, তাঁহারা হেম বাবুকে কোন কোন সাহেবের কাছে লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি অনেক স্নেহগর্ভ কথায় আপনাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ (যাহার পরিচয় হেমবাবু ইতিপূর্ব্বে পান নাই) প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর শরৎ বাবুর কথা উঠিল, হেম বাবুর ঘরের কথাটী উঠিল। জনার্দ্দন বাবু বলিলেন,—

এখনকার কলেজের ছেলেরা সকলেই ঐরূপ, তাহারা রীতি নীতি বুঝে না, পৈত্রিক আচার অনুসারে চলে না, সুতরাং দোষ ঘটে। তা তুমি বাবু বুদ্ধিমান্ ছেলে, তুমি কি আর নির্ব্বোধের মত কায করিবে, তা আমরা স্বপ্নেও মনে করি না। তোমাকে সৎপরামর্শ দেওয়াই বাহুল্য।

গোবর্দ্ধন বাবু। তবে কি জান বাবা, আমরা কয়েকজন খুড়া আছি, যতদিন না মরি, তোমাদেরই হিত কামনা করি, দুটা কথা না বলিলেও নয়। শরৎটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আমাদের কথা শুনে না, যা ইচ্ছে তাই করে, তা ওটাকে আর বড় বাড়িতে আসিতে দিও না। তা হইলেই এ কথাটা আর কেউ বড় শুনিতে পাইবে না, কে আর কার কথা মনে করে রাখে বল ?

হরিহর বাবু। হাঁ তা বৈ কি ? ঐ যে মিত্রজার বাড়ীতে সে দিন একটা কলঙ্ক উঠিল, তোমরা সে কথা অবশ্যই জান, (এই বলিয়া কলঙ্কটী আর একবার প্রকাশ করা হইল,) তা মিত্রজা বুদ্ধিমান্ লোক, চাপিয়া গেলেন, এখন আর সে কথা কে তোলে বল ?

জনার্দ্দনবাবু। হাঁ তা বৈ কি ? কে বা কার কথা মনে রাখে ? আজকাল সকলেই আপনার কায নিয়ে ব্যস্ত। সে কালে এক রীতি ছিল, গ্রামের বুড়াদের কথাটী না লইয়া পাড়ার কোন কায হইত না। কেমন, বল না গোবর্দ্ধন বাবু, ঐ সেকালে আমাদের মতামত না নিয়ে কি কেউ কোনও কায করিতে পার্‌ত ?

গোবর্দ্ধন বাবু। সাধ্য কি ? আর এখনই যাঁরা একটু শিষ্ট শান্ত তাঁরা কোন্ আমাদের না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করেন। ঐ ঘোষজা মশাইয়ের বিধবা ভাদ্রবধূকে লইয়া সে বৎসর এইরূপ একটা কলঙ্ক হইল, (সে কলঙ্কটী সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হইল,) তা ঘোষজা মশাই তখনই আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "হরিহর বাবু করি কি ? যাই যে ?" তা

আমি বলিলাম, "যথন আমার কাছে এসেছ তথন কিছু ভয় নাই, আমি এর একটা কিনারা করে দিবই।" কি বল জনার্দ্দন বাবু, আমরা অনেক দেখেছি শুনেছি বিপদ আপদের সময় আমাদের জানাইলে কোন না একটা উপায় করিয়া দিতে পারি ?

জনার্দ্দন বাবু। তা বৈ কি।

হরিহর বাবু। তা আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘোষজাকে বলিলাম "তোমার ভাদ্রবৌকে ৺কাশীধামে পাঠাইয়া দাও।" তিনি সেই অনুসারে কার্য্য করিলেন, এখন কাহার সাধ্য সে কথা উত্থাপন করে ? তা বাবা, এখনকার কি ছেলেরা, কি মেয়েরা, সকলেই স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, যাহার যা ইচ্ছা করে, তাতে তোমার দোষ কি বল ? তা একটা কায কর, তোমার শ্যালীটীকেও ৺কাশীধামে পাঠাইয়া দাও, সেখানে যা ইচ্ছা করিবে, কে দেখিতে যাইতেছে বল? তোমার কোন অপযশ হইবে না।

হেম আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কম্পিত স্বরে বলিলেন,—

মহাশয় আপনাদিগের কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। শরৎ যে সমাজরীতি বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মত নাই; সে বিষয় পরে বিচার্য্য। কিন্তু আপনারা যদি শরৎ বাবুর অথবা আমার শ্যালীর চরিত্রে কোনও দোষ ঘটিয়াছে এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে একেবারে ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নির্ম্মল চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, তাঁহাদিগের অপেক্ষা নির্দ্দোষচরিত্র লোক আমি জানি না।

জনার্দ্দন বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু ও হরিহর বাবু একস্বরে

বলিলেন,—না, না, আমরা দোষের কথা বলি নাই, এমন কথাও কি লোকে বলে!

হরিহর বাবু। এমন কথাও কি লোকে বলে, ঘরে কিছু হইলেও কি লোকে বলে? তা নয়, তা নয়। ঘোষজা মশাই কি সে কথা বলিয়াছিলেন তা নয়, অন্য একটু কারণ দেখাইয়া পাপ দূর করিলেন। তা আমরাও তাই বলিতেছি তোমার শ্যালীর চরিত্রে কোন দোষ থাকিলেও কি সে কথা মুখে আনিতে আছে? রাম! আমরা কি কারও কলঙ্কের কথা মুখে আনিতে পারি? তা নয়, তা নয়। তবে গোলমালটা এইরূপে চুকাইয়া ফেলিলেই ভাল। সকল বিষয়েই সরল পথ অবলম্বন করাই ভাল, সরলপথেই ধর্ম্ম।

জনার্দ্দন বাবু। তা বৈ কি, তা বৈ কি, "যতোধর্ম্ম-স্ততোজয়ঃ" শাস্ত্রেই একথা আছে। হরিহর বাবু যে কথাটা বলিলেন তাহাই সৎপথ তার কি আর সন্দেহ আছে। তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে, এবারটা যেন চেপে গেলে। কিন্তু তুমি ছেলে মানুষ, ঘরে অল্পবয়স্কা বিধবা কি রাখিতে আছে? কখন কি হয় তার কি ঠিক আছে?

গোবর্দ্ধন বাবু। তা বৈ কি, শাস্ত্রে বলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রও নারীর গুপ্ত আচরণ দেখিতে পান না, পঞ্চমুখ ব্রহ্মাও নারীর গুপ্ত কথা জানিতে পারেন না। তুমি ত বাবা ছেলে মানুষ।

হরিহর বাবু। তা বৈ কি? এবার যেন চাপিয়া গেলে, কিন্তু দৈবক্রমে,—দৈবের কথা বলা যায় না,—যদি যথাকালে তরুণ বয়স্কা বিধবা একটী সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে কি আর চাপিবার যো আছে? লোকে ত একেই কলঙ্কপ্রিয়,

তখন কি আর রক্ষা আছে ? এখনই লোকে সেই কথা বলিতেছে। তা ৺কাশীধামে পাঠান শ্রেয়।

ইত্যাদি নানা সারগর্ভ পরামর্শ দিয়া বৃদ্ধগণ বিদায় হইলেন। হেমচন্দ্র রোষে ও অভিমানে উত্তর দিতে পারিলেন না,—তাঁহার জ্বলন্ত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু বিমোচন করিলেন।

তাহার পর রামলাল, শ্যামলাল, যদুলাল প্রভৃতি নব্যের দল হেমচন্দ্রকে পরামর্শামৃত দান করিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিক্ষিত; কেহ এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরে বাড়ীতেই (রেনল্ডস্ প্রভৃতি) সাহিত্য আলোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন। কেহ সচ্চরিত্র; কেহ বা "সভ্যতা"-সম্মত আমোদ গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ও দেখেন। কিন্তু পরামর্শ দানে সকলেই সমান সক্ষম, সকলেই হেমচন্দ্রের "হিতৈষী বন্ধু।"

তাঁহারা অদ্য প্রাতে একটী কথা শুনিয়া হেমবাবুর নিকট আসিয়াছিলেন, হেমবাবুর অযথা নিন্দা প্রতিবাদ করাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা, পাড়ার একজন বিদ্যোৎসাহী যুবক ও একজন ধর্ম্মপরায়ণা বিধবার অযথা অপবাদ তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, সেই জন্যই হেমবাবুর নিকট প্রকৃত অবস্থা জানিতে আসিলেন। কিন্তু হেমবাবুর যদি কোনও কথা বলিতে কোনও আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন না, কেন না কাহারও গুপ্ত কথা অনুসন্ধান করা সুরুচি-সম্মত কার্য্য নহে। কিন্তু যদি হেমবাবুর বলিতে কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে,—ইত্যাদি, ইত্যাদি, নব্য ভাষায় গৌর চন্দ্রিকা অনেকক্ষণ চলিল।

হেম বাবুর এখন আর লুকাইবার কিছুই নাই, যেরূপ অপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহাতে সত্য কথা প্রকাশ হওয়াই ভাল। এই অনাহূত বন্ধুদিগের আগমনে ও প্রশ্নে তিনি অতিশয় তিক্ত হইলেও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া যাহা ঘটনা তাহা জানাইলেন।

রামলাল। তা যাহাই হউক, অদ্য যে ঘোর অপবাদ শুনিলাম তাহার অধিকাংশ মিথ্যা জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু দেখুন সকলে সহজে এ অপবাদটী অবিশ্বাস করিবে না, আপনি সকল সময়ে বাটী থাকেন না, শরৎ কলেজেই কিছু অবাধ্য ও গর্ব্বী, এবং স্বীয় মত গুলি লইয়া বড় স্পর্দ্ধা করে, এবং নারীর চরিত্র দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অতএব, অপবাদ সম্বন্ধে সমাজের মনে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ, এবং মনুষ্যচরিত্র পর্য্যালোচনার ফল মাত্র। তা যাহা হউক আপনি এই বিবাহে আপাততঃ মত করেন নাই এটী সুখের বিষয়।

শ্যামলাল। সে কথা যথার্থ। আরও দেখুন এ কার্য্য প্রকৃত সমাজ সংস্কার নহে। যে কার্য্যে আমাদের দিন দিন ঐক্য সাধন হইবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হইবে, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। পুরাতন লোকদিগের ন্যায় আমাদের কোনও "প্রেজুডিস" নাই, কিন্তু এ কার্য্যটী আমাদিগের সমাজে বিপ্লব ও বিচ্ছেদ ঘটাইবে মাত্র, ইহা দ্বারা আমাদের ঐক্য সাধন ইহবে না, অতএব এ কার্য্য গর্হিত।

যদুলাল। আরও দেখুন, মেলথস বলেন, লোক সংখ্যা যত শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, খাদ্য তত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় না। এইজন্যই সুসভ্য দেশে অনেক পুরুষ ও নারী অবিবাহিত থাকে। আমা-

দের দেশে সেটী হয় না, অতএব, নিদেন বিধবা গুলিকে অবিবাহিতা রাখা কর্ত্তব্য।

শ্যামলাল। আর আপনার মত বুদ্ধিমান্ লোক এটীও অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে স্বদেশের উন্নতি, ভারতের উন্নতি, আমাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য; তাহাও বিধবাবিবাহ দ্বারা বিশেষরূপে সংঘটিত হইবে না। আমার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা যতদূর দেশের উন্নতি হয় আমি তাহার চেষ্টা করিতেছি। একটী লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছি, দেশস্থ যাবদীয় গ্রন্থকার দিগকে পুস্তকের জন্য পত্র লিখিয়াছি, এবং প্রতি শনিবার সেই লাইব্রেরীতে কয়েকজন বন্ধু সমবেত হয়েন, রাজনৈতিক তর্কও করিয়া থাকেন। আপনার যদি অবকাশ থাকে, তবে এই আগামী শনিবার আসিলে আমরা বড়ই তুষ্ট হইব।

যদুলাল। আরও দেখুন আমাদের সংসারে যে কবিত্ব যে মধুরত্ব টুকু আছে, আমাদিগের গৃহে গৃহে যে অমৃত টুকু লুক্কায়িত আছে, কি কাঙ্গাল কি ধনী সকল গৃহে যে অনির্ব্বচনীয় মিষ্টত্ব টুকু আছে,—ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সে টুকু কোথায়? বৈদেশিক আচরণ অনুকরণ করিবেন না, তাহাতে আমাদিগের গৃহধর্ম্ম লুপ্ত হইবে, ভারতবাসীর শেষ সুখ টুকু বিলুপ্ত হইবে, আর্য্য-ধর্ম্মের নিস্তেজ দীপটী একেবারে নির্ব্বাণ হইবে। ইউরোপীয়দিগের সদ্‌গুণ গুলি অনুকরণ করুন, আমাদিগের গৃহ-সংসারের কবিত্ব, মিষ্টত্ব, ও হিন্দুত্বটুকু ধ্বংস করিবেন না।

রামলাল। সে কথা সত্য। যদুবাবুর কথাগুলি শুনিবেন, তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ স্বদেশহিতৈষী লোক আজ

কাল দেখা যায় না। তাঁহার কথা গুলি সারগর্ভ তাহা আর আমার বলা বাহুল্য। আর যে অপবাদ শুনিলাম তাহা যদি সত্য হয়,—যাহা অনেকে বিশ্বাস করিবে, যদিও সে বিষয়ে আমার নিজের মত সমস্ত প্রমাণাদি না দেখিয়া ব্যক্ত করিতে চাহি না,—যদি সে অপবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ যুবক ও এইরূপ রমণীকে উৎসাহিত করিলে ভারতের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক অধোগতি হইবে।

হেমচন্দ্র এরূপ তর্কের উত্তর করিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন; নব্য পরামর্শদাতাগণ ক্ষণেক পর উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর সমাজ সংরক্ষণের দুই একজন চাঁই, দিগ্‌গজ ঠাকুরকে লইয়া, হেম বাবুর বাটী আসিলেন। দিগ্‌গজ ঠাকুর ভবানীপুরের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের একটী আকটর্লনী মনুমেণ্ট, ধর্ম্ম শাস্ত্রের একটী পেসিফিক সমুদ্র, বিদ্যায় একটী শুণ্ডধারী দিগ্‌গজ, তর্কে বন্য বরাহ অবতার। বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান, সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সকল বিষয়েই তাঁহার সমান অধিকার। তিনি আপন পরিমাণ রহিত বিদ্যা-পয়োধি হইতে অজস্র তর্কস্রোত বর্ষণ করিয়া হেমচন্দ্রকে একেবারে প্লাবিত করিলেন, হেমচন্দ্র একেবারে নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন দিগ্‌গজ ঠাকুরের গলা ভাঙ্গিয়া গেল, বাক্য ক্ষমতা শেষ হইল, (তর্কক্ষমতা শেষ হইবার নহে,) তখন তিনি কাশিতে কাশিতে আরক্ত নয়নে নিরস্ত হইলেন।

হেম তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—মহাশয় এ কার্য্য করিতে এখনও আমার মত নাই সুতরাং আপনার একণে এইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করার বিশেষ আবশ্যক নাই।

তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও পড়া শুনায় যতদূর উপলব্ধি হয় তাহাতে বোধ হয় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রেও দুটী মত আছে, ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রথা ছিল। বৈদিক কালে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; মনু প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের কালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল। পরে পৌরাণিককালে এ প্রথাটী একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। আমার শাস্ত্রে অধিকার নাই, আলোচনারও ক্ষমতা নাই, অন্য পণ্ডিতদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। শুনিয়াছি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রের অসম্মত নহে।

যাঁহারা দ্বিপ্রহর রজনীতে সহসা একটী গ্রামে আগুন লাগিতে দেখিয়াছেন, আকাশের রক্তবর্ণ দেখিয়াছেন, অগ্নির প্রজ্জলিত অভ্রংলেহী জিহ্বা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তৎকালে দিগ্‌গজ ঠাকুরের মুখের ভঙ্গি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। অগ্নি গর্জ্জন-বিনিন্দিত স্বরে তিনি কহিলেন,—

সেই (কাশি) সেই বিধবাবিবাহ প্রচারক বিদ্যাসাগর পণ্ডিত? সে আবার পণ্ডিত? সে বর্ণপরিচয়ের পণ্ডিত, বর্ণ পরিচয় লিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছে, (অধিক কাশি) একটা নূতন প্রথা চালিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ধর্ম্মে কুঠারাঘাত করিয়াছে, মনুষ্য হৃদয়ের স্তরে স্তরে শেল নিক্ষেপ করিয়াছে, হিন্দু চরিত্র অনপনেয় কলঙ্ক রাশিতে আবৃত করিয়াছে, আর্য্যনাম, আর্য্যগৌরব আর্য্যরীতি নীতি একেবারে সমুদ্রবক্ষে মগ্ন করিয়াছে, (ভয়ানক কাশি) উঃ (কাশি,) সে পণ্ডিত?

সেই স্বধর্ম্মবিদ্বেষী, ম্লেচ্ছদিগের অনুকরণকারী, বিদেশীয় রীতির পক্ষপাতী, আর্য্যধর্ম্মশূন্য, আর্য্যঅভিমানশূন্য, আর্য্যবংশের কুসন্তান,—(অনবরত কাশিতে বাক্যস্রোত সহসা রুদ্ধ হইল। তখন আসন পরিত্যাগ করিয়া,—) চল হে সংরক্ষক মহাশয়, এ বাড়ীতে আর থাকা নহে, এখানে পদবিক্ষেপ করিলেও পাপ আছে। যাহা শুনিয়াছিলাম সমস্তই সত্য বটে,—সে গর্ভবতী যদি গর্ভ নষ্ট করে, তোমরা পুলিসে সংবাদ দিও।

হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন না,—দিগ্‌গজ ঠাকুরের ক্রোধ ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার একটু হাসি আসিল।

সে দিন সমস্ত দিন হেমচন্দ্রের পরামর্শের অভাব রহিল না। তাঁহার এত বন্ধু আছে, এত হিতৈষী আছে, এত পরামর্শদাতা আছে, তাহা পীড়ার সময়, কষ্টের সময়, দারিদ্রের সময়, হেমচন্দ্র অনুভব করেন নাই।

কলিকাতা হইতে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হইল। ধনঞ্জয় বাবুর বাগানে সুসভ্য সভা হইয়াছে, গীত, নৃত্য, সুধা ও দিবার ন্যায় ঝাড়ের আলোক সেই সভাকে রঞ্জিত করিতেছে! তথায় দরিদ্রের এই কথাটী উঠিল।

ধনঞ্জয় বাবু শ্যালীর কলঙ্ক সম্বন্ধে আর কোন উপহাস করিলেন না, একটু হাসিলেন;—কিন্তু অন্যান্য ধার্ম্মিকগণ এ ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হিন্দুধর্ম্মের স্থূল স্তম্ভস্বরূপ হরিশঙ্কর বাবু একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁহার হস্ত হইতে সুধাপাত্র পড়িয়া শত খণ্ড হইয়া গেল, বলিলেন "হা ধর্ম্ম! তোমাকে কি সকলেই বিস্মৃত হইল? ভদ্রলোকের ঘরে এ কি অধর্ম্ম আচরণ? হিন্দু-

য়ানি আর বুঝি থাকে না”। শিক্ষিত যদুনাথের হস্ত হইতে কাঁটা ছুরি পড়িয়া গেল, সম্মুখের গোজিহ্বা অনাস্বাদিত রহিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন “আর বুঝি ন্যাশনালিটী থাকে না”! বিশ্বম্ভর বাবু, সিদ্ধেশ্বর বাবু, গিদ্ধেশ্বর বাবু প্রভৃতি বনিয়াদি ধনাঢ্য গণ নিজ নিজ আসনে কম্পিত হইলেন, এই ঘোর অধর্ম্ম কর্ম্মের নাম শুনিয়া তাঁহারা বাক্‌শক্তিরহিত হইলেন, এবং তাঁহাদের কালের লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া এখনকার কলেজের ছেলেদের স্বেচ্ছাচারিতার ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার “মিষ্টর কর্ম্মকার” ও তাঁহার সারগর্ভ মত প্রকাশ করিলেন,—যে এরূপ বিধবা বিবাহ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুমোদিত নহে, এ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিড়ম্বনা মাত্র। বিধবা বাহির হইয়া আসুক, জগৎ পরিদর্শন করুক, সুসভ্য, সুরূপ যুবকদিগের সহিত আলাপ করুক, (দর্পণে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দর্শন,) তৎপর দীর্ঘ কোর্টসিপের পর, একজনকে নির্ব্বাচন করুক,—এইরূপ কার্য্য পাশ্চাত্য সুসভ্য প্রথা; পিঞ্জরবদ্ধ বিধবাকে বিবাহ দেওয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার অবমাননা মাত্র!

এই সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া সভার সভ্যগণ বলিয়া উঠিলেন, তাঁহারা ত জগৎ পরিদর্শন করিয়াছেন এবং সুরুচি-সম্পন্ন যুবকদিগের সহিতও আলাপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের একটী করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা (অর্থাৎ সুন্দর বর) মিলে না কেন? তাঁহাদের একটী করিয়া বিবাহ ঘটে না কেন? সভ্য ও সভ্যাদিগের মধ্যে এ রসের কথাটা সুধার সঙ্গে সঙ্গে

অনেক দূর গড়াইল, কিন্তু পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আমরা সে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

বিশ্ব জগতের পরামর্শ, মতামত, বিদ্রুপ ও দোষারোপ হেমচন্দ্রের কাণে উঠিল। সন্ধ্যার সময় হেমবাবু বিন্দুর নিকট গিয়া বলিলেন,—সমাজ একমত হইয়া এই বিধবাবিবাহ নিবারণ করিতেছে, এ কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যাঁহাদের বিদ্যা আছে, যাহাদের বিদ্যা নাই, যাঁহারা সৎলোক, যাহারা সৎলোক নহেন, যাঁহাদের শ্রদ্ধা করি, এবং যাহাদের শ্রদ্ধা করি না, সকলে একমত হইয়া এ কার্য্য নিষেধ করিতেছেন।

বিন্দু। আর তা ছাড়া এ কাযে কলঙ্ক কত, নিন্দা কত? এ কায করিলে সমাজে আমাদের অতিশয় নিন্দা হইবে?

হেম। না, তাহার বড় ভয় নাই। সমাজ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক বিশ্বাস করিতেছেন ও রটাইতে-ছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক কলঙ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধবা বিবাহতে প্রকৃত অধর্ম্ম নাই,—আমাদিগের হিতৈষীগণ বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া শরতের চরিত্র ও সরলা বালিকার চরিত্র সম্বন্ধে যার পর নাই অধর্ম্মসূচক প্রবাদ প্রকটিত করিতেছেন, এক্ষণে সেই অধর্ম্মাচরণ গোপন করিয়া রাখিলেই সমাজের মতে ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যার যে তার মনে আছে।

সুধার বিবাহের কথা লইয়া পাড়াপড়শীর ঘুম নাই, চল একবার সেই সুধাকে দেখিয়া আসি। ক্ষুদ্র গৃহের অভ্যন্তরে সেই সরল বালিকা কি করিতেছিল, চল, একবার তাহা দেখিয়া আসি।

সুধার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার সমস্ত যত্ন বৃথা হইল। যে কথা লইয়া পাড়ায় এত আন্দোলন, মেয়ে মহলে এত আন্দোলন, সে কথা গোপন থাকে না। যে বাড়ীতে ঝি আছে সে বাড়ীতে সংবাদ পত্রেরও অনাবশ্যক!

তবে ঝি বিন্দুর নিষেধ বাক্যের এই টুকু মান রাখিল যে সুধাকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না, সুধার চরিত্র সম্বন্ধে যে কলঙ্ক উঠিয়াছিল, সে টুকু বলিল না। তবে শরৎ বাবু যে সুধাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছেন, মাতা ঠাকুরাণীর নিকট সেই বিবাহের জন্য জেদ করিতেছেন, পাড়ায় পাড়ায় এই কথা রাষ্ট্র হইয়াছে, তাহা সুধাকে গোপনে অবগত করাইল।

বালিকা একবারে শিহরিয়া লজ্জায় অভিভূত হইল, যাতনায় অস্থির হইল। উঃ এ কি সর্ব্বনাশের কথা, কি অধর্ম্মের কথা, এ কথা কেন উঠিল, সুধা লোকের কাছে কেমন করিয়া আর এ মুখ দেখাইবে? কালীদিদির কাছে, শরতের মাতার কাছে, দেবীবাবুর বাড়ীতে, চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কেমন করিয়া

মুখ দেখাইবে, হতভাগিনী আবার তালপুখুরে কোন্ মুখে ফিরিয়া যাইবে? ছি! ছি! শরৎবাবু এমন কায কেন করিলেন, বিধবার নাম কেন লজ্জায় ডুবাইলেন; এ কলঙ্ক কি আর কখনও যাবে? ঐ পথে মেয়ে মানুষেরা কি বলিতে বলিতে যাইতেছে? তাহারা বুঝি সুধার কলঙ্কের কথা কহিতেছে! ঐ হেমবাবু দিদির সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন? লজ্জায়, বিষাদে, মনের যাতনায় বালিকা অধীর হইল, মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও কহিতে পারে না, বালিশে মুখ লুকাইয়া সমস্ত দুই প্রহর বেলা একাকিনী কাঁদিল, সন্ধ্যার সময় না খাইয়া শুইতে গেল। উঃ শরৎবাবু কেন এমন কায করিলেন, দরিদ্র বিধবার কেন কলঙ্ক রটাইলেন?

কিন্তু অন্ধকারে স্থাপিত লতা যেরূপ সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া একটী সূর্য্য-রশ্মির দিকে ধায়, অভাগিনী সুধার শুষ্ক অন্তঃকরণ সেইরূপ এই যাতনায় ও লজ্জায় জীবনের একটী আশা-রশ্মির দিকে ধাবিত হইল। বিষাদে অন্ধকারের মধ্যে সুধা যেন একটী কিরণচ্ছটা দেখিতে পাইল, অকূল সমুদ্রের মধ্যে যেন ধ্রুব নক্ষত্রের হীন জ্যোতি তাহার নয়নে পতিত হইল।

শরৎ বাবু কেন এমন কায করিলেন? বোধ হয় শরৎ বাবু না আসিলে সুধা যেমন পথ চাহিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় একাকিনী বসিয়া শরৎ বাবুর কথা ভাবে, শরৎ বাবুও সেই রূপ সুধার কথা একবার মনে করেন! বোধ হয় দিন রাত্রি শরৎ বাবু এই লজ্জার কথা ভাবেন, বোধ হয় সেই জন্যই অস্থির হইয়া শরৎ বাবু এই লজ্জার কথা প্রস্তাব করিয়াছেন।

বোধ হয় শরৎ বাবু অনেক যাতনা পাইয়াছেন, না হইলে কি দিদিরই কাছে মুখ ফুটিয়া এমন কথাও বলিতে পারেন? ঝি বলে, শরৎ বাবু বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, অভাগিনী সুধার জন্য শরৎ বাবু এত কষ্ট পাইয়াছেন? সুধার ইচ্ছা করে একবার শরৎ বাবুর পা দুখানি হৃদয়ে ধারণ করে। তা কি হবে? বিধাতা কি দরিদ্র সুধার কপালে এত সুখ লিখিয়াছেন? শরৎ বাবু যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কি হইতে পারে? উঃ লজ্জার কথা, পাপের কথা,—সুধা এ কথা মনে স্থান দিও না।

ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। ছোট ছোট দুটী কোমল হস্ত দিয়া সেই চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া সুধা আবার ভাবিতে লাগিল। আচ্ছা শরৎ বাবু যা বলিয়াছেন সত্য সত্যই যদি তাহা হয়? দরিদ্র সুধা যদি সত্য সত্যই শরৎ বাবুর গৃহিণী হয়? তাহা হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই তালপুখুরে শরৎ বাবুর বাড়ীটী পরিষ্কার করিবে, উঠানে ঝাঁট দিবে, বাসন মাজিবে, কায়মনে শরৎ বাবুর মাতাকে সেবা করিবে, আর স্বহস্তে শরৎ বাবুর ভাত রাঁধিয়া খাইবার সময় তাঁহার কাছে বসিবে। অপরাহ্নে আক ছাড়াইয়া দিবে, বেলের পানা প্রস্তুত করিয়া করিয়া দিবে, আর স্বহস্তে মিস্রির পানার বাটি শরৎ বাবুর মুখের কাছে ধরিবে। সহসা একটী পদশব্দ হইল, সুধা শিহরিয়া উঠিল, লজ্জায় মুখ লুকাইল, পাছে তাহার হৃদয়ের চিন্তা কেহ টের পায়, পাপীয়সীর পাপ চিন্তা পাছে কেহ জানিতে পারে!

আর যদি শরৎ বাবুর বিদেশে কোথাও চাকুরি হয়? সুধা দাসীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহার

যত্ন করিবে। একটী ক্ষুদ্র কুটীরে তাহারা বাস করিবে, সুধা সেই কুটীরে দুটী, লাউ গাছ দিবে, দুটী কুমড়া গাছ দিবে, দুই চারিটী ফুলের গাছ স্বহস্তে রোপন করিবে। কলি-কাতায় ঠাকুরদের সুন্দর সুন্দর ছবি চার পয়সা করিয়া পাওয়া যায়, সুধা তাই কিনিয়া শুইবার ঘরটী সাজাইবে! উমা সিংহে চড়িয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে, উমার মাতা দুই হাত প্রসারণ করিয়া আলু থালু বেশে মেয়েকে একবার কোলে করিতে আসিয়াছে, দাসীগণ কেহ পাখা হাতে, কেহ খাদ্য হাতে, কেহ ফুলের মালা হাতে করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়াছে। অথবা অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে পতিপ্রাণা দময়ন্তী নিদ্রিত রহিয়াছে, নলরাজা উঠিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া চিন্তা করি-তেছে। অথবা কুঞ্জবনে রাধিকা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে, বিদেশিনী তাহার নিকট বসিয়া কৃষ্ণের কথা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধিকার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। এইরূপ ঠাকুরের ছবি গুলি দিয়া সুধা ঘরটী সাজাইবে, ভাল করিয়া ঝাঁট দিয়া ঘরটী পরিষ্কার করিবে, আপন হস্তে শয্যা প্রস্তুত করিবে, সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালাইয়া শরৎবাবু আসিতে ছেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিবে। শরৎবাবু বাড়ী আসিলে সুধা জল আনিয়া আপন হস্তে শরতের পা ধুইয়া দিবে; সেই পা দুখানি ধারণ করিয়া সাশ্রুনয়নে একবার বলিবে "তোমার দয়া, তোমার যত্ন কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? আমার জীবন সর্ব্বস্ব তোমারই, দরিদ্র বলিয়া একটু স্নেহ করিও।"

চিন্তা একবার আরম্ভ হইলে আর শেষ হয় না। প্রাতঃ-কালে সুধা গৃহকার্য্য করিতে করিতে এই চিন্তা করিত,

দ্বিপ্রহরের সময় সমস্ত দিন জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ভাবিত; সন্ধ্যার সময় বিন্দু ও হেমবাবু একত্র বসিয়া যখন কথাবার্ত্তা করিতেন, সুধাও তাঁহাদের কাছে বসিত, কিন্তু তাহার মন কোথায় বিচরণ করিত! তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিন্দু দেখিলেন সুধা সমস্ত জানিতে পারিয়াছে, সুধা দিবা রাত্রি চিন্তাশীল! সুধা আর প্রফুল্ল বালিকা নহে, যৌবনপ্রারম্ভে যৌবনের স্বপ্ন তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়াছে! সুধা সমস্ত দিন অন্যমনস্কা; কখন, কদাচ, শরতের নামটী হইলেই সুধার মুখখানি লজ্জায় রঞ্জিত হইত, বালিকা অন্য কার্য্যচ্ছলে উঠিয়া যাইত।

এক দিন অপরাহ্নে বিন্দু ঘরে আসিয়া দেখিলেন সুধা জানালার কাছে বসিয়া এক খানি বৈ পড়িতেছে, দিদি আসিতেই সুধা সে বই খানি মুড়িল।

বিন্দু। ও কি বৈ পড়ছিলে বন?

একটু লজ্জিত হইয়া সুধা বলিল,—ও বঙ্কিম বাবুর এক খানা বই।

বিন্দু। কি বই?

সুধা। বিষবৃক্ষ।

বিন্দুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—

ও বই আমাকে দাও, উহা পড়িও না।

সুধা দিদির হাতে বৈ খানি দিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—

কেন পড়িব না দিদি, ও কি খারাপ বই?

বিন্দু। না বুন, বই খানি ভাল, কিন্তু ছেলে মানুষে কি ও বই পড়ে?

সুধা। তবে দিদি তুমি আমাকে গল্পটী বলিও।

বিন্দু। গল্প আর কি, নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখ হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল।

শুষ্ক হৃদয়ে সুধা স্থানান্তরে গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ালী।

ভারতবর্ষের দেওয়ালী একটী বড় সুন্দর প্রথা। এই কালী পূজার অন্ধকার নিশীথে ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত, যে খানে হিন্দু বাস করে সেই খানেই, গ্রাম ও নগর ও সংসারীর গৃহ দীপাবলীতে উদ্দীপ্ত হয়। সে দিন অমাবশ্যার অন্ধকার রাত্রি আলোকে পরিপূর্ণ হয়, আকাশের নির্ম্মল নক্ষত্র সমূহ নিস্তব্ধে জগতের নক্ষত্র দেখিয়া হাস্য করে। ধনীর গৃহ উজ্জ্বল আলোক-শ্রেণীতে পরিপূর্ণ হয়, দরিদ্র গৃহিণী একটী পয়সার তেল কিনিয়া কোন প্রকারে পাচটী প্রদীপ সাজাইয়া সন্ধ্যার সময়ে কুটীর দ্বারে জ্বালাইয়া দেয়।

কলিকাতায় আজ বড় ধূম। গৃহে গৃহে তুবড়ী উজ্জ্বল অগ্নিকণা উদ্গীরণ করিতেছে, যেন আমাদের টাউন হলের বক্তাদিগকে অনুকরণ করিতেছে, সেইরূপ গলার আওয়াজের

সহিত তাহাদের কার্য্য শেষ হয়। যুবা যশোলিপ্সুদিগের ন্যায় হাউই বাজি আকাশের দিকে মহা তেজে উঠিতেছে, আবার তেজ টুকু বাহির হইয়া গেলেই হেটমুখ হইয়া মাটিতে পড়িতেছে, যাহার মাথায় পড়ে তাহারই সর্ব্বনাশ। বঙ্গদেশের অসংখ্য নব্য কবির ন্যায় আজি রাত্রিতে অসংখ্য পটকা শব্দ করিতেছে,—একই আওয়াজে তাহাদের উদ্যম শেষ,—কেননা প্রথম প্রকাশিত পদ্যকুসুম বা গীতি কাব্যটী বিক্রয় হইল না। বিষরীর ন্যায় চরকি বাজি বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, ঘুরিতে ঘুরিতে ও সকলকে জ্বালাইতেছে, মেজাজ বড় গরম কেহ কাছে যাইতে পারে না। আর ছুঁচা বাজির ক্ষুদ্র ঘৃণিত জীবন ছুঁচামি করিয়াই শেষ হইল; কুটীলতা ভিন্ন সরল গতি তাহারা জানে না, পরকে বিরক্ত করা, পরনিন্দা, পরহিংসা, পরগ্লানি তাহাদের জীবিকার উপায়।

রাত্রি দশটার পর শরৎচন্দ্র হেমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিন্দুর সহিত দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন স্বয়ং হেমচন্দ্র দ্বারদেশে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হেমচন্দ্র নিস্তব্ধে শরতের হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া গেলেন, শরৎ লজ্জায় ও উদ্বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে হেমের সহিত সেই ঘরে গিয়া বসিলেন, মুখ নত করিয়া রহিলেন, বাকস্ফূর্ত্তি হইল না।

হেম প্রদীপের সল্‌তে উস্‌কাইয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

শরৎ, আমার স্ত্রীকে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে তাহা শুনিয়াছি।

শরৎ অনেক কষ্ট করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—

যদি আমি দোষ করিয়া থাকি, আপনার বাল্য-সুহৃদের এই একটী দোষ ক্ষমা করুন।

হেম। শরৎ, তুমি দোষ কর নাই, তোমার উন্নত চরিত্রের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছ। সমস্ত জগৎ যদি তোমাকে নিন্দা করে, জানিও তোমার প্রতি আমার মত তিলার্দ্ধও বিচলিত হয় নাই।

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষুর জল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিলেন।

হেম। আমার স্ত্রী বাল্যকাল অবধি তোমাকে বড় ভাল বাসেন, ভ্রাতার মত স্নেহ করেন, তিনিও তোমার কথায় দোষ গ্রহণ করেন নাই। তোমার প্রতি আমাদিগের ভক্তি আমাদিগের স্নেহ চিরকাল একরূপ থাকিবে।

শরৎ। আপনাদের এই দয়া আমি এ জীবনে ভুলিব না।

ক্ষণেক উভয়ে চুপ করিয়া রহিলেন, পরে অনেক কষ্টের সহিত শরৎ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করিয়াছেন?" শ্বাসরুদ্ধ করিয়া শরৎ উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, তাহার জীবনের সুখ বা দুঃখ এই উত্তরে নির্ভর করে।

হেম। সেই কথা বলিতেছি। তুমি সকল দিক দেখিয়া সকল বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবটী করিয়াছ?

শরৎ। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারি ইহাতে কোনও পক্ষে কোনও ক্ষতি দেখিতে পাই না। যতদূর আমার সাধ্য, আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই এ প্রস্তাবটী করিয়াছি।

হেম। শরৎ, তুমি শিক্ষিত, কিন্তু তোমার বয়স অল্প, এই জন্যই আমি দুই একটী কথা স্মরণ করিয়া দিতেছি। এ বিবাহে অতিশয় লোক-নিন্দা।

শরৎ। অনেক নিন্দা সহ্য করিয়াছি, জীবনে অনেক নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কাযটী যদি অন্যায় না হয় তবে নিন্দা ভয়ে আমি জীবনের সুখ বিসর্জ্জন করিব?

হেম। তোমাদের একঘরে করিবে।

শরৎ। সমাজের যদি তাহাতেই রুচি হয়, তাহাই করুন। আমি সমাজের অনুগ্রহের প্রার্থী নহি।

হেম। তোমাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইবে।

শরৎ। কলঙ্ক কি? আমি বিধবাবিবাহ করিয়াছি এই কথা? এটী যদি পাপ কার্য্য না হয় তবে সে কলঙ্ক আমার গায়ে লাগিবে না; যাঁহারা নিন্দা করিবেন তাঁহাদের মতামতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আর যদি আপনি এ কায নিন্দনীয় মনে করেন, আজ্ঞা করুন, আমি ইহাতে নিরস্ত হই।

হেম। বিধবা বিবাহ বোধ হয় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু আধুনিক রীতি বিরুদ্ধ।

শরৎ। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রগমনও রীতি বিরুদ্ধ ছিল, অদ্য জাহাজে করিয়া সহস্র সহস্র যাত্রী জগন্নাথ যাইতেছে। চন্দ্রনাথ বাবু সে দিন বলিলেন, অস্বাস্থ্যকর নিয়ম গুলির ক্রমশঃ সংস্কার হওয়াই জীবিত সমাজের লক্ষণ। ক্রমশঃ উন্নতিই জীবনের চিহ্ন, গতি হীনতা মৃত্যুর চিহ্ন।

হেম। শরৎ, তুমি চিন্তাশীল, তুমি উদার চরিত্র, একটী কথা আমি স্পষ্ট করিয়া বলিব, বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমার

প্রকৃত মতটী আমাকে বলিও। দেখ হৃদয়ের উদ্বেগ চিরকাল সমান থাকে না, অদ্য যে প্রণয় আমাদিগকে উন্মত্ত প্রায় করে, দুই বৎসর পর সেটী হ্রাস পায় অথবা সেটী একেবারে ভুলিয়া যাই। সুধার প্রতি তোমার এরূপ প্রণয় চিরকাল না থাকিতে পারে, তখন তোমার মনে কি একটু আক্ষেপ উদয় হইবে না? উত্তর করিও না, আমি যাহা বলিতেছি আগে মন দিয়া শুন। তখনও তোমরা একঘরে হইয়া থাকিবে, বন্ধুগণ তোমাদের গৃহে আহার করিবে না, তোমার কন্যাকে কেহ বিবাহ করিবে না, তোমার পুত্রকে কেহ গৃহে ডাকিবে না, সমাজের মধ্যে তোমরা একক! তখন হয় ত মনে উদয় হইবে কেন বাল্যকালে না বুঝিয়া একটী কায করিয়া এত বিপদ জড়াইলাম, আমার স্নেহের পাত্র, ভালবাসার পাত্র পুত্র কন্যাকে জগতে অসুখী করিলাম। শরৎ, যে কাযে এই ফল সম্ভব, সে কাযে কি সহসা হস্তক্ষেপ করা বিধেয়? যৌবনের সময় একটু বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বার্দ্ধক্যের অনুশোচনা দূর করা উচিত নহে? সুধার ন্যায় অনিন্দনীয়া রূপবতী, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া সরলহৃদয়া অনেক বালিকা কায়স্থ গৃহে আছে, তোমার ন্যায় জামাতা পাইলে তাহাদের পিতা মাতা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন; সেরূপ বিবাহ করিলে, এখন না হউক কালে তুমিও সুখী হইবে। শরৎ, তুমি বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর, এখনকার লালসার বশবর্ত্তী না হইয়া যাহাতে জীবনে সুখী হইবে তাহাই কর।

শরৎ। হেম বাবু, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি কেবল হৃদয়ের উদ্বেগের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাব করি নাই,

জীবনে সুখী হইব সেই আশায় প্রস্তাব করিয়াছি। আপনি যে কথাগুলি বলিলেন তাহা শতবার আমার মনে উদয় হইয়াছে, আলোচনা করিতে ক্রটী করি নাই। আক্ষেপের বিষয় যে বলিতেছেন, যদি বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় কার্য্য হয় তবে আক্ষেপ হইবে বটে, যদি তাহা না হয় তবে তজ্জন্য কখনই আমার হৃদয়ে আক্ষেপ উদয় হইবে না। বলুন এই বিস্তীর্ণ সমাজে কোন্ বিজ্ঞ লোক সৎকার্য্য করিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অনেকে জাতি হারাইয়াছেন, বিদেশ গমন করিয়া অনেকের জাতি গিয়াছে, ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ তেজস্বী লোক সেইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া পরে আক্ষেপ করিয়াছেন? সমাজের সংস্কার পথে তাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহাদিগের জীবনের সুখের হেতু হয়, এই চিন্তা তাঁহাদিগের বার্দ্ধক্যে শান্তি দান করে। হেমবাবু, তাঁহারা সমাজের বহির্ভূত নহেন, সমাজ অদ্য তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, সমাদর করে, স্নেহ করে, কল্য তাঁহাদিগকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপে সমাজ সংস্কার সিদ্ধ হয়, এইরূপে জীবিত সমাজ হইতে অনিষ্টকর নিষেধগুলি একে একে স্খলিত হয়।

'হেমবাবু, পরে আক্ষেপ হইবে এরূপ কায করিতেছি না, চিরকাল সুখে থাকিব, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় চিরকাল অভাগিনী সুধাকে সুখী করিব এই জন্য এই কায করিতেছি।

সুধার মন, সুধার হৃদয়, সুধার স্নেহ, সরলতা ও আত্মবিসর্জ্জন আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, সুধা আমার

সহধর্ম্মিণী হইলে এ জীবন অমৃতময় হইবে। হেমবাবু, আমার হৃদয়ের উদ্বেগের কথা বলিয়া আপনাকে ত্যক্ত করিব না, কিন্তু যদি এ বিবাহে আপনাদিগের মত না হয়, আমার জীবনের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও চেষ্টা অদ্য সাঙ্গ হইল, হৃদয়ে একটী শেল লইয়া শ্রমজীবীরা পরিশ্রম করে না।

হেমচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন,—একটী বালিকার জন্য উৎসাহী পুরুষের জীবনের উৎসাহ লোপ হয় না,—একটী নৈরাশ্যে তোমার ন্যায় উন্নত হৃদয় যুবকের জীবনের চেষ্টা ও উদ্যম ক্ষান্ত হইবে না।

হতাশ হইয়া শরৎ বলিলেন,—একটী অবলম্বন না থাকিলে মনুষ্য হৃদয়ে উৎসাহ, চেষ্টা, ধর্ম্ম কিছুই থাকে না, অদ্য আমার জীবন অবলম্বনশূন্য হইল। কিন্তু একথা আপনাকে বুঝাইতে পারি এরূপ আমার ক্ষমতা নাই। তবে আপনারা স্থির করিয়াছেন, এ বিবাহে আপনাদিগের মত নাই?

হেমচন্দ্র শরতের দুইটী হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন,—শরৎ, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া এই কার্য্যটী করিতেছ কি না, তাহাই দেখিতেছিলাম। উপরে যাও, আমার স্ত্রী তোমাকে বলিবেন, এ বিবাহে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। হতভাগিনী সুধার জীবন জগদীশ্বর সুখপূর্ণ করিবেন তাহাতে কি আমাদের অমত হইবে? জগদীশ্বর তোমাদের উভয়কে সুখী করুন।

শরৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ধারা বহিয়া তাহার নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি নীরবে হেমের হাত দুটী আপনার মাথায় স্থাপন করিলেন, পরে উপরে গেলেন।

শয়নঘরে বিন্দু একটী প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া

বসিয়াছিলেন, শরৎ সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বিন্দুর পা দুটী ধরিয়া নয়ন জলে তাহা সিক্ত করিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন,—

বিন্দুদিদি, তুমি আমাকে জীবন দান করিলে, এ দয়া, এ স্নেহের কি পরিশোধ করিতে পারি?

বিন্দু। ও কি শরৎ বাবু, ছাড়, ছাড়? ছি! ছি! যার পা ধরিতে হবে সে ধরবেই এখন, আমাকে কেন, ছি! ছেড়ে দাও।

শরৎ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—

বিন্দুদিদি, তুমি হেমবাবুকে এ কথা বুঝাইয়াছ, তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছ, তাহার জন্য চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

বিন্দু। আর সম্মতি না দিয়া কি করি? যখন বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা সম্মত হইয়াছেন তখন আর আমরা বারণ করে কি করি?

শরৎ। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা কে?

বিন্দু। দেখতে পাচ্ছি বরই বরকর্ত্তা, কন্যাই কন্যাকর্ত্তা! বর এসে কনে দেখে গেলেন, বেশ পছন্দ হইল, আর কনেও লুকিয়ে লুকিয়ে বর দেখিলেন, বেশ পছন্দ হইল, সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল!

শরৎ। বিন্দুদিদি, একবার উপহাস ত্যাগ কর, তুমি নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তোমার সম্মতি প্রকাশ করিয়া আমার মনকে শান্ত কর। সুধা ছেলে মানুষ, তার আবার সম্মতি কি? সে এ গুরু কার্য্যের কি বুঝিবে বল?

বিন্দু। না গো, সে এখন বেশ বুঝতে সুঝতে শিখেছে।

তা বুঝি জান না? সে যে এখন সেয়ানা মেয়ে হয়েছে, লুকিয়ে লুকিয়ে বিষবৃক্ষ পড়ে।

শরৎ। তোমার পায়ে ধরি বিন্দুদিদি, ঠাট্টা ছাড়, একবার তোমার মনের কথাটী বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর।

বিন্দু। না বাবু, পায়ে টায়ে ধরিও না, এখনই সুধা দেখ্‌তে পাবে, আবার রাগ করিবে? তুমি চলে গেলে কি আমরা দুটী বনে কোঁদল করিব? পরের দায়ে কেন ঠেকা বাবু?

শরৎ। তোমার সঙ্গে আর পারিলাম না বিন্দুদিদি। মনে করেছিলাম তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিব, সব ঠিকঠাক করিব, তা দেখছি আজ কিছুই হইল না।

বিন্দু। তা ঠিকঠাক আর কি? কেবল বামুন পুরুত ডাকা বাকি আছে বৈত নয়, তা না হয় ডেকে দি বল? না কি আজ কাল কলেজের ছেলে নিজেই বামুন পুরুতের কাজ সেরে নেয় তাও ত জানি না। স্ত্রী-আচারটা কি আমাদের করিতে হইবে, না তাও সুধা নিজেই সেরে নেবে? তা না হয় সুধাকে ডেকে দি? ও সুধা! একবার এদিকে আয় ত বন, শরৎ বাবু তোকে ডাকচেন, বড় দরকার, একটু শীঘ্র করে আয়।

শরৎ হতাশ হইয়া উঠিলেন, বিন্দুও হাসিতে হাসিতে উঠিলেন। তখন শরৎ বিন্দুর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন,—

বিন্দুদিদি, তুমি ছেলে বেলা থেকে আমাকে বড় স্নেহ কর, একটী কথা শুন। তুমি এ কার্য্যে সম্মত হইয়াছ, হেমবাবু তাহা আমাকে বলিয়াছেন, একবার সেই কথাটী মুখে বলিয়া আমাকে তৃপ্ত কর,—একবার আমাদের আশীর্ব্বাদ কর।

বিন্দু তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, শরৎ বাবু, ভগবান্ আমার অভাগিনী ভগিনীর জীবনের সুখের উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কি আমাদের অমত? ভগবান্ তোমাকে সুখে রাখুন, তোমার চেষ্টা গুলি সফল করুন, তোমাকে মান ও যশ দান করুন। অভাগিনী সুধাকে ভগবান্ সুখে রাখুন, যেন চির-পতিব্রতা হইয়া সংসারে সুখলাভ করে।

সাশ্রুনয়নে শরৎ উত্তর করিলেন, বিন্দুদিদি, জগদীশ্বর তোমার এ দয়ার পুরস্কার দিবেন। তোমাদের দয়া, তোমাদের সৎকার্য্যে সাহস, তোমাদের অনিন্দনীয় স্নেহ এ জগতে দুর্লভ। লোকনিন্দা ভয় করিও না; বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিতগণ বলেন বিধবা-বিবাহ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।

বিন্দু। শরৎ বাবু আমি মেয়ে মানুষ, আমি শাস্ত্র বুঝি না। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে কচি মেয়েকে আমরা চিরকাল যাতনা দিব এরূপ আমাদের শাস্ত্রের মত নহে, দয়াবান্ পরমেশ্বরেরও ইচ্ছা নহে।

জগতের মধ্যে সুখী শরৎচন্দ্র বিন্দুর নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লইলেন। নীচে উঠানে আসিলেন। দেখিলেন সুধা ভাঁড়ার ঘরের দরজায় চাবি দিয়া একটী প্রদীপ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে! শরৎ সুধাকে প্রায় দুই মাস অবধি দেখেন নাই, তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইল। ঐ লাবণ্যময়ী পবিত্রহৃদয়া স্বর্গীয়া কন্যা কি শরতের হইবে? ঐ স্নেহপ্লাবিত নির্ম্মল নয়ন দুটী কি শরৎ চুম্বন করিবেন? ঐ লতা-বিনিন্দিত কমনীয় পেলব বাহুদুটী কি শরৎ নিজ বাহুতে ধারণ করিবেন? ঐ কুসুম

বিনিন্দিত লাবণ্যবিভূষিত দেহলতা কি শরৎ নিজ বক্ষে ধারণ করিবেন? শরতের দরিদ্র কুটীরে কি ঐ সুন্দর কুসুমটী দিবা-রাত্রি প্রস্ফুটিত থাকিবে? প্রাতঃকালে ঊষার আলোকের ন্যায় ঐ প্রণয় আলোক কি শরতের জীবন আলোকিত করিবে? সায়ংকালে ঐ স্নেহ প্রদীপ কি শরতের ক্ষুদ্র কুটীর উজ্জ্বল করিবে? অসংখ্য উদ্যমে, অসংখ্য চেষ্টায়, ক্লেশে ও পরিশ্রমে, ঐ স্নেহময়ী ভার্য্যা কি শরতের জীবনে শান্তি দান করিবে, জীবন সুখময় করিবে? এইরূপ চিন্তা লহরীতে শরতের পূর্ণ হৃদয় উথলিতে লাগিল, শরৎ একটী কথা কহিতে পারিল না।

সুধা কবাটের শিকলি দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দেখিলেন শরৎ বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। সহসা তাহার গৌরবর্ণ মুখ-মণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, সুধা হেটমুখী হইল, মাথার কাপড়টী টানিয়া দিল। আবার শরৎ বাবুর কাছে মাথায় কাপড় দিল মনে করিয়া অধিক লজ্জিত হইল, চক্ষু দুটী মুদিত করিল, চক্ষুর উপরের চর্ম্ম পর্য্যন্ত লজ্জায় রঞ্জিত হইয়াছে। সুধা আর দাঁড়াইতে পারিল না, দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

সুধার সেই রঞ্জিত অবনত মুখ খানি অনেক দিন শরতের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। ক্লেশে, নৈরাশ্যে, পীড়ায়, সে মূর্ত্তি অনেক দিন তাঁহার স্মরণপথে আরোহণ করিয়াছিল।

আনন্দ ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে শরৎ বাটী আসিলেন। শরতের ভাগ্যে কি এই স্বর্গীয় সুখ যথার্থই আছে? না অদ্য রজনীর দীপাবলীর ন্যায় এই সুখের আশা সহসা নিবিয়া যাইবে, ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার শরতের হৃদয় পূর্ণ করিবে?

অপরিমিত সুখ মনুষ্য ভাগ্যে প্রায় ঘটে না, অপরিমিত সুখের সময় মনুষ্য হৃদয়ে এইরূপ ভয়ের উদয় হয়।

বাটী আসিবামাত্র শরতের ভৃত্য শরতের হস্তে এক খানি পত্র দিল। শরতের হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল, কেন হইল শরৎ তাহা জানেন না।

উপরে গিয়া বাতির আলোকে শরৎ দেখিলেন তাঁহার মাতার চিঠি। মাতা গুরুকে দিয়া পত্র লিখাইয়াছেন। পত্র এইরূপ—

"বাছা শরৎ! তুমি সুস্থ শরীরে কুশলে থাক, তোমার চেষ্টা সফল হয়, তোমার জীবন সুখময় হয়, তাহাই ভগবানের নিকট দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতেছি।

"বাছা, আজ একটী নিন্দার কথা শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলাম। বাছা শরৎ, তুমি ভাল ছেলে, তুমি মাকে ভালবাস, আমি এ নিন্দার কথা বিশ্বাস করি না; তুমি তোমার অভাগিনী মাতাকে কষ্ট দিবে না।

"লোকে বলে তুমি সুধাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। বাছা এটী অধর্ম্মের কথা, এ কাযটী করিয়া তোমার বাপের নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক দিও না, তোমার মা যত দিন বেঁচে আছে তাহাকে তুমি কষ্ট দিও না। বাছা, তুমিত কথার অবাধ্য ছেলে নও।

"বাছা শরৎ, আমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তোমার বাপ আমাকে কাঁদাইয়া রেখে গিয়াছেন, বাছা কালীর যে অবস্থা তাহা তুমি জান। তুমি আমার হৃদয়ের ধন, তোমার আশায় বেঁচে আছি, এ বয়সে তুমি আমাকে কাঁদাইও না, আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই।

"আমার মাথার চুলের মত তোমার পরমায়ু হউক। ভগবান্ তোমাকে সংসারে সুখ দান করুন, পুণ্য কর্ম্মে তোমার মতি হউক। এ অভাগিনী আর কি আশীর্ব্বাদ করিবে?"

শরৎ একবার, দুইবার, তিনবার এই পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। দুর্ব্বল হস্ত হইতে পত্রখানি পড়িয়া গেল;—শরৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতা ও সন্তান।

সে দিন রাত্রিতে শরৎ যে যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। নৈরাশ্যের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া তাঁহার হৃদয়কে আবৃত করিল, ঘৃণা ও লজ্জা তাঁহাকে ব্যথিত করিল, বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন এই চিন্তা শত বৃশ্চিকের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল।

যে স্বপ্নবৎ সুখের আশা ছয় মাস ধরিয়া শরৎ হৃদয়ের হৃদয়ে সযত্নে ধারণ করিয়াছেন তাহা অদ্য জলাঞ্জলি দিবেন? মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ শরৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। সমস্ত জীবন সুখশূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য, আশাশূন্য হইবে, মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও রসশূন্য হইবে, দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে পারিবেন? মাতৃ আজ্ঞার জন্য শরৎ তাহাতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু জীবনের প্রিয়তম বন্ধু হেমচন্দ্র ও বিন্দুর

নামে আজি যে কলঙ্ক রটিল, সমাজে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে, তিরস্কার করিবে, অঙ্গুলি দিয়া তাহাদিগের দিকে দেখাইয়া দিবে, শরৎ সেটি কি সহ্য করিতে পারিবেন? লোকে এখন বলিবে, ঐ দুইজনে একটা নষ্টা বিধবাকে শরতের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিল, শরৎ বুঝিয়া সুঝিয়া সে বিবাহ করিলেন না, ব্যভিচারিণীটা হেমবাবুর ঘরেই আছে, এ হৃদয়-বিদারক কথা কি শরৎ সহ্য করিতে পারিবেন? যে বিন্দু বাল্যকালাবধি শরতের স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায়, তাঁহার প্রতি শরৎ এইরূপ আচরণ করিবেন? যে হেমবাবু স্বীয় ঔদার্য্যগুণে শরৎকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন, লোকনিন্দা তুচ্ছ করিয়া আজি কেবল শরৎ ও সুধার সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরতের বিষম প্রস্তাবেও সম্মত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে কি শরৎ জগতের তিরস্কার ও ঘৃণার পদার্থ করিবেন? যে স্নেহপূর্ণ নিষ্কলঙ্ক পরিবারে প্রবেশ করিয়া শরৎ এতদিন শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আজি কি কুটিলগতি বিষধর সর্পের ন্যায় তাহাদিগকে দংশন করিয়া চলিয়া আসিবেন? কাল বিষে সে পরিবার জর্জ্জরিত হউক, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, অনপনেয় কলঙ্ক সাগরে নিমগ্ন হউক, শরৎ নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিলেন! এ চিন্তা শরতের অসহ্য হইল, অসহ্য বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন "মাতা, ক্ষমা কর, আমি এ কাযটী পারিব না।"

আর সেই ধর্ম্ম-পরায়ণা, পবিত্র-হৃদয়া হতভাগিনী সুধা? ছয় মাস পূর্ব্বে সে বালিকা ছিল, প্রণয়ের কথা জানিত না, বিবাহের কথা মনে উদয় হয় নাই। এই ছয় মাসের মধ্যে

শরৎই তাহাকে প্রণয় শিখাইয়াছে, বালিকার হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আশা জাগরিত করিয়াছে। আহা! ঊষার আলোক যেরূপ নিস্তব্ধে ধীরে ধীরে সুপ্ত জগতে ও গভীর আকাশে প্রসারিত হয়, এই নূতন আশা অনাথিনী বিধবার হৃদয়ে সেইরূপ ব্যাপ্ত হইয়াছে, আজি লজ্জাবতী নম্র-মুখী বিধবা তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় প্রণয় বারির জন্য চাহিয়া রহিয়াছে। এখন শরৎ তাহাকে বঞ্চিতা কবিবেন? চিরকাল হতভাগিনী করিবেন, কলঙ্কে কলঙ্কিতা করিয়া তাহাকে এই নিষ্ঠুর সংসার মধ্যে ত্যাগ করিবেন? হয় ত অসহ্য অবমাননা ও কলঙ্কে দগ্ধহৃদয়া হইয়া অকালে সে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা চিরজীবন হৃদয়ে এই নিষ্ঠুর শেল বহন করিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিবে! শরৎ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গর্ব্বিত যুবক আজি ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

ঘর বড় গরম হইল। শরৎ উঠিয়া গবাক্ষের কাছে দাঁড়া-ইলেন, শরৎকালের নৈশবায়ু তাঁহার ললাটে লাগিল; তাঁহার জ্বলন্ত মুখমণ্ডল ঈষৎ শীতল হইল। সমস্ত জগৎ সুপ্ত ও নিস্তব্ধ। অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ও মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, আকাশ হইতে অসংখ্য তারা এই পাপপূর্ণ, শোকপূর্ণ জগতের দিকে নিস্তব্ধে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে।

মাতা পত্রে লিখিয়াছেন তিনি দুই একদিনের মধ্যে কলি-কাতায় আসিবেন। মাতাকে এ সকল কথা বুঝাইলে তিনি বুঝিবেন? এ কার্য্যে তিনি সম্মতি দিবেন? সে বৃথা আশা! শরৎ মাতাকে জানিতেন, বার্দ্ধক্যে, বৈধব্যে, তিনি কখনই এ

কার্য্যে সম্মত হইবেন না, কিম্বা যদি মুখে সম্মতি প্রকাশ করেন, হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইবেন, পুত্রের আচরণে অচিরে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। করযোড় করিয়া সেই নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শরৎ সাশ্রুনয়নে কহিলেন "পুণ্যা জননি! আমি যেন সন্তানের আচরণ না ভুলি; তোমার হৃদয়ে যেন সন্তাপ না দিই, তোমার শেষ কাল যেন তিক্ত না করি!"

সমস্ত রাত্রি চিন্তার দংশনে শরৎচন্দ্র ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার শরীর একটু শীতল হইল, মন একটু শান্তি লাভ করিল, তিনি কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেন। শোকসন্তপ্ত কিন্তু শান্ত হৃদয়ে তিনি দিবালোক প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।—

প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ নিদ্রা গেলেন তাহা তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল যেন কেহ কোমল হস্তে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। তখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, দেখিলেন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বাৎসল্য ও স্নেহের সহিত তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। শরৎ উঠিবামাত্র তাঁহার মাতা বলিলেন,

বাছা শরৎ, তুমি এত কাহিল হইয়া গিয়াছ; আহা তোমার মুখখানি শুখিয়ে গিয়াছে। আহা বিছানায় না শুইয়া ভূমিতে শুইয়া আছ কেন? এস বাছা বিছানায় এস।

শরৎ। না মা, আমি বেশ ঘুমাইয়াছি আর ঘুমাব না। মা তুমি কখন এলে? কবে আসিবে তাহা ঠিক করিয়া আমাকে লিখ নাই কেন? তোমার ষ্টেশন হইতে আসিতে কোন কষ্ট হয়নি ত?

মাতা। না বাছা, আমার সঙ্গে গুরু এসেছেন, তিনি গাড়ি ঠিক করে, দিয়েছেন, আমার কোনও কষ্ট হয় নাই।

শরৎ। মা, আমি না বুঝিয়া সুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, সেটী ক্ষমা কর। তোমার চিঠি পাইয়া আমার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়াছি। মা আমি তোমার অবাধ্য হইব না, যদি কিছু কষ্ট দিয়া থাকি সন্তানকে সে টুকু ক্ষমা কর। মা তুমি আমার সকল দোষই ত ক্ষমা কর।

বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; তিনি স্নেহ গদ্ গদ্ স্বরে বলিলেন,—

বাছা শরৎ, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তুই আমার কথাটী রেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা করিলি। বাছা তুমি আমার কথা রাখিবে তাহা জানিতাম, তুমি ত আমার অবাধ্য ছেলে নও। আহা ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন।

মাতার হস্ত দুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া শরৎচন্দ্র অবারিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মাতা অঞ্চল দিয়া পুত্রের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন, মাতৃস্নেহে পুত্রের হৃদয় শান্ত হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

কুলগৌরবের পরিণাম।

সুধার সহিত শরতের বিবাহের কথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি মেয়ে মহলে সে কলঙ্কের কথা লইয়া অনেক দিন অবধি

নাড়া চাড়া হইতে লাগিল, এমন সরস কথা কি আর রোজ রোজ মিলে? কালীতারার শাশুড়ীরা ত হাটের নেড়া হুজুক চায়, যখন একটু কার্য কর্ম্ম করিয়া অবসর হয়, অথবা কালীতারাকে গঞ্জনা দিতে ইচ্ছা হয়, অমনি কথায় কথায় ঐ কথা উঠে।

ছোট। হেঁ হেঁ বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, মুখেই ভেঙ্গেছে, কাজে কি আর ভাঙ্গে? আমার বেন কলিকাতায় এসেছেন, ছেলে আর কি করে, দিন কত চুপ করে আছে। বেনও গঙ্গাযাত্রা করবেন, আর ছেলেটা ঐ হতভাগী ছুঁড়ীটাকে আবার বিয়ে করবে।

মেজ। হেঁ গো হেঁ, বেন বড় গুণবতী। ঐ পোড়ামুখীইত সব করেছে, ও না করলে কি আর সম্বন্ধ হইত? তার পর আমাদের ভয়ে সিন কাযটা থেমে গেল, আমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছে, পোড়ামুখীর প্রাণে ভয় নেই, ঐ বিয়ে হইলে কি আজ কালীকে আস্তো রাখতুম? আহা যেমন নচ্ছার মা তেমনি নচ্ছার মেয়েও হয়েছে, এমন ছোট লোকের ঘরের মেয়েও বিয়ে করে আনে? আমাদের এমন কুলেও কালী দিয়েছে।

ছোট। আর সেই মাগীই কি নচ্ছার বাবু,—ঐ হেম বাবুর স্ত্রীর কি লজ্জা সরম নেই? সে কিনা বিধবা বনটাকে বিয়ে দিতে রাজি হইল? ও মা ছি! ছি! চোদ্দ পুরুষকে একেবারে কলঙ্কে ডুবালে? অমন মেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। বাপ মা নুন খাওয়াইয়া মেরে ফেলেনি কেন?

মেজ। আর সেই এক রত্তি মেয়েটাই কি নচ্ছার গা?

অমন বিধবাকে কি আর ঘরে রাখতে হয়? অন্য নোকে হইলে কাশী বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিত, কি হরিনামের মালা হাতে দিয়ে বৈষ্ণবদের আখড়ায় পাঠিয়ে দিত। ছি! ছি! ভদ্র নোকের ঘরে এমন নজ্জার কথা?

ছোট। তা দিক্ না সেটাকে বের করে, আর এত ঢলাঢলি কেন, সেটাকে বাজারে বের করে দিক্ না?

মেজ। ওলো ঢলাঢলির কি হয়েছে? আরও হবে। তোরা ত বন সব কথা জানিস নি, আমি ওদের সব শুনেছি। এই দেখ না কি হয়? বড় দেরি নেই। তখন কেমন করে নুকোয় দেখব। পুলিসে খবর দিব না? অমন কুটুম থাকার চেয়ে না থাকা ভাল, কুটুমের মুখে আগুন।

ছোট। আবার বেন কলিকাতায় এসে কালীকে নিতে নোক পাঠিয়েছিল। একটু নজ্জা সরম নেই গা?

মেজ। ও লো নজ্জা সরম থাক্‌লে আর পোড়ামুখী ছেলের অমন সম্বন্ধ করে? তা হতভাগা বংশে আর কি হবে বল না? বৌমাকে নিতে আসবে? কাঠের চেলা দিয়ে পিঠ ভেঙ্গে দেব না? কালী একবার যাবার নাম করুক দিকি? ওর পিঠের চামড়া যদি না তুলি ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। ছি! ছি! অমন ঘরে বৌ পাঠায়, ওদের ছুঁলে আমাদের সাত পুরুষের জাত যায়, কি ঝকমারি হয়েছে যে এমন হাড়ি ডোমের ঘরে গিয়ে বাবু বিয়ে করেছেন। ছি! ছি! ছি!

এইরূপ বংশের সুখ্যাতি, মাতার সুখ্যাতি, শরতের সুখ্যাতি, বিন্দু ও সুধার সুখ্যাতি কালীতারাকে কত দিন শুনিতে হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু অমৃত-

ভাষিণীদিগের সে অমৃত বচন এক্ষণে কিছু দিনের জন্য মুলতুবি রহিল,—বাবুর পীড়া সহসা এত বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার প্রাণের সংশয় ; তখন সকলে তাঁহার চিন্তায় ব্যাকুল হইল।

তখন কালীতারার খুড়-শাশুড়ীরা বড়ই ভয় পাইল, সে বিপুল বংশ গোছাইয়া রাখিতে পারে এমন আর একজন লোক সে বংশে ছিল না। কালীতারা ভয়ে ও চিন্তায় শীর্ণ হইয়া গেল, খাইবার সময় খাওয়া হইত না, রাত্রিতে চিন্তায় ঘুম হইত না, কেবল বাবু কেমন আছেন জানিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেন। ভগিনীপতির সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ পাইয়া শরৎচন্দ্র সে বাটীতে আসিলেন, কয়েক দিন তথায় রহিলেন। হেমচন্দ্র ও প্রত্যহ প্রাতঃকালে আসিয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তথায় থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকে কাণাকাণি করিত, তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। হেমকে দেখিয়া শরৎও একটু অপ্রতিভ হইলেন কিন্তু উদারচরিত্র হেম শরৎকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, “শরৎ তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও না কেন? তুমি মন্দ কার্য্য কর নাই, লজ্জা কিসের? বিবাহে তোমার মাতার মত নাই, মাতার কথা অনুসারে কার্য্য করিয়াছ তাহা কি নিন্দনীয়? তোমার মাতার অমতে তুমি যদি বিবাহ করিতে স্বীকার করিতে, আমরা স্বীকার করিতাম না। শরৎ তোমার কার্য্যে দোষ নাই, দোষের কার্য্য না করিলে নিন্দার কারণ নাই। লোকের কথা আমরা গ্রাহ্য করি না, তুমিও গ্রাহ্য করিও না।” শরৎ হেমের এই কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যে বাল্যবন্ধুকে তিনি জগতের ঘৃণাস্পদ করিয়াছেন, যাঁহার পবিত্র সংসার

তিনি কলঙ্কিত করিয়াছেন, সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি আপনি আসিয়া শরতের হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকল মার্জ্জনা করিলেন! শরৎ হেমের কথায় উত্তর দিতে পারিলেন না, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল, মনে মনে কহিলেন "এত দিন আপনাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া স্নেহ করিতাম, অদ্য হইতে দেব বলিয়া পূজা করিব।"

হেমচন্দ্র ও শরৎ রোগীর যথেষ্ট সুশ্রূষা করিলেন। ঠাকুরের প্রসাদ বন্ধ করিয়া দিলেন। অর্থব্যয়ে সঙ্কুচিত না হইয়া কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসকগণকে প্রত্যহ ডাকা-ইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন হয় দেখিবার জন্য শরৎ দিবারাত্রি রোগীর ঘরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এক সপ্তাহ উৎকট পীড়া সহ্য করিয়া কালীতারার স্বামী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কালীর শরীরখানি চিন্তায় আধখানি হইয়া গিয়াছিল;—এ সংবাদ পাইবামাত্র চীৎকার শব্দে রোদন করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

শরৎ অনেক জল দিয়া বাতাস করিয়া দিদিকে সংজ্ঞা দান করিলেন, তখন কালীতারা একবার স্বামীকে দেখিবে বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র সেটী নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না,—আলু থালু বেশে মুক্ত কেশে শোকবিহ্বলা কালীতারা স্বামীর ঘরে দৌড়াইয়া গেলেন, মৃত স্বামীর চরণ দুটী মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্রন্দন ধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। কালীতারা স্বামীর প্রণয় কখনও জানে নাই, অদ্য সে প্রণয়টী জানিল, শূন্য-হৃদয়

বিধবা অসহ্য যাতনায় স্বামীপদে বার বার লুণ্ঠিত হইয়া অভাগিনীর কান্না কাঁদিতে লাগিল। একবার করিয়া মৃত-স্বামীর মুখমণ্ডল দেখে, আর একবার করিয়া হৃদয় উথলিয়া উঠে, রোদনেও তাহার শান্তি হয় না। ক্ষণেক পর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল,—কালীর চৈতন্য শূন্য শীর্ণ দেহ হস্তে উঠাইয়া শরৎ অন্য ঘরে লইয়া আসিলেন।

কয়েক দিন পরে কালীতারার শ্বশুরবাড়ীর সকলে বর্দ্ধমানে প্রস্থান করিলেন। শোকবিহ্বলা বিধবা ভবানীপুরে শরতের বাড়ীতে আসিয়া মাতার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি লাভ করিলেন। কালীর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর হয় নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখের সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, শরীর-খানি অতি শীর্ণ, শোকে ও কষ্টে নানারূপ রোগের সঞ্চার হইয়াছে। দেখিলে তাঁহাকে চত্বারিংশৎ বৎসরের চিররোগিণী বলিয়া বোধ হয়। চিরদুঃখিনী মাতৃস্নেহে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

কুলমর্য্যাদা দেখিয়া কালীর বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল,—কিন্তু উৎকৃষ্ট কুল হইলেই সর্ব্বদা সুখ হয় না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ধনগৌরবের পরিণাম।

আমরা একজন হতভাগিনীর কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখি-লাম, আর একজন হতভাগিনীর কথা এই পরিচ্ছেদে লিখিব।

শোকের কথা আর লিখিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু যখন সংসারের কথা লিখিতে বসিয়াছি তখন শোকের কাহিনীই লিখিতে বসিয়াছি। শোক দুঃখের কথা না লিখিলে সংসারের চিত্রটী প্রকৃত হয় না। সংক্ষেপে সে কথাটি লিখিব।

কালীতারার স্বামীর পীড়ার সময় হেমচন্দ্র সর্ব্বদাই সেই বাড়ীতে থাকিতেন, সুতরাং বিন্দু বাড়ী হইতে বড় বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের পাড়ার লোকে অনুগ্রহ করিয়া যেরূপ প্রবাদ রটাইয়াছিল তাহাতে তাঁহার বাড়ীর বাহিরে যাইতে বড় ইচ্ছাও ছিল না। তবে উমাতারা কেমন আছে, জানিতে বড় উৎসুক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে লোক পাঠাইতেন, লোকে যে খবর আনিত তাহাতে বিন্দুর বড় ভয় হইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে তিনি পাল্কী করিয়া উমার বাড়ী গেলেন।

বিন্দু পথে মনে করিতেছিলেন তাঁহার জেঠাইমা তাঁহাকে কত তিরস্কার করিবেন, কিন্তু বাড়ী পঁহুছিয়া তাঁহার জেঠাই মাকে যে অবস্থায় দেখিলেন তাহাতে বিন্দুর চক্ষুতে জল আসিল। জেঠাইমার সে চিরপ্রফুল্ল মুখ খানি শুখাইয়া গিয়াছে, ভাসা ভাসা নয়ন দুটী বসিয়া গিয়াছে, কাক পক্ষের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ গুলি স্থানে স্থানে শুক্ল হইয়াছে, সে স্থূল শরীর খানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কন্যার সেবায় দিবারাত্রি জাগরণ করিয়া, কন্যার মানসিক কষ্টের জন্য দিবারাত্র রোদন ও চিন্তায় উমার মাতা অকালে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিন্দু আসিবামাত্রই তাঁহার জেঠাইমা চক্ষুর জল ফেলিয়া

বলিলেন, "আয় মা তোরা একে একে আয়, বাছা উমাকে একবার দেখ, যা করিতে হয় কর, আমি আর পারি না।"

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বিন্দু জেঠাইমার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন, উমাতারাকে দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। মৃত্যুর ছায়া সেই রক্তশূন্য, জোতিঃশূন্য মুখমণ্ডলে পতিত হইয়াছে।

বিন্দুদিদিকে দেখিয়া রোগীর মুখখানি একবার একটু উজ্জ্বল হইল, বিন্দুর দিকে উমা হাত বাড়াইলেন, বিন্দু সেই হাতটি ধরিয়া বাল্য-সহচরী উমাতারার নিকট বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। মনে মনে ছেলে বেলার কথা উদয় হইতে লাগিল। অতি শৈশবে বিন্দু জেঠাইমার বাড়ী খেলা করিতে আসিত, উমার সঙ্গে কত খেলা করিত, উমা আপনার সন্দেশটী ভাঙ্গিয়া বিন্দুকে দিত, আপনার খেলানা হইতে বিন্দুকে একটী দিত। তাহার পর বিন্দুর পিতার মৃত্যু হইলে বিন্দু জেঠাইমার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিল, তখনও উমার সঙ্গেই খেলা করিতে ভালবাসিত, উমাও গরিবের মেয়ে বলিয়া বিন্দুকে তুচ্ছ করিত না।

তাহার পর উভয়ের বিবাহ হইল, উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গেলেন, কিন্তু বাল্যকালের প্রণয়টী ভুলিলেন না, যখন জেঠাই মার বাড়ীতে উমার সঙ্গে দেখা হইত তখনই কত আনন্দ। ছয় মাস পূর্ব্বে জেঠাইমার বাড়ীতে দুইজন কত আহ্লাদে দেখা করিয়াছিলেন, আজ সে আনন্দ কোথায়! উমার সেই জগতে অতুল সৌন্দর্য্য কোথায়? সেই সুন্দর ললাটে হীরকের সিঁতি কোথায়? সে সুগোল বাহুতে হীরক খচিত বলয় কোথায়? সরলচিত্তা জেঠাইমার সেই মিষ্ট হাসি কোথায়? সেই একটু

ধনগর্ব্ব, একটু সাংসারিক গর্ব্ব কোথায়? সে সংসার সুখ অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে, সে সুখ উমাতারার অদৃষ্টাকাশে আর কখনই হইবে না। সে সুখ সাঙ্গ হইয়াছে, উমাতারার লীলা খেলাও সাঙ্গ প্রায়, ধন, যৌবন, অতুল সৌন্দর্য্য, অকালে লীন হইল।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষীণ স্বরে উমা কহিলেন,—

বিন্দুদিদি, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম, তোমাকে একবার দেখিয়া প্রাণটা জুড়াইল।

বিন্দু। কালীতারার স্বামীর বড় পীড়া হইয়াছিল তাই আমরা বড় ব্যস্ত ছিলাম, উমা সেই জন্য তোমাকে দেখিতে আসিতে পারি নাই।

উমা। ব্যারাম আরাম হইয়াছে?

বিন্দু ধীরে ধীরে বলিলেন,—কালী বিধবা।

উমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; এক বিন্দু অশ্রুজল সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে বলিলেন,

কালী এখন কোথায়?

বিন্দু। শরতের বাড়ীতে আছে। কালীর মাও সেইখানে আছেন, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

উমা। কালীকে বলিও, তাহার মন সুস্থ হইলে একবার আসিয়া দেখা করে। মরিবার আগে তাকে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা করে।

বিন্দু। ছি উমা, অমন কথা মুখে আন কেন? তোমার উৎকট রোগ হইয়াছে, তা ডাক্তার দেখিতেছে, ব্যারাম ভাল হবে এখন; ছি, অমন ভাবনা মনে আনিও না।

উমা। ভাল হয়ে কি হবে?

বিন্দু। ভাল হইয়া আবার সংসার করিবে। মানুষের কষ্ট কি আর চিরকাল থাকে? আজ যে কষ্ট আছে, কাল তাহা থাকিবে না, সুখ দুঃখ সকলেরই কপালে ঘটে। ব্যারাম ভাল হইলে তুমি সুখী হইবে, পতিপুত্রবতী হইয়া সোণার সংসারে বিরাজ করিবে।

উমা কোনও উত্তর করিলেন না,—একটী ক্ষীণ হাসি সেই শীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা গেল। ক্ষণেক যেন কি শব্দ শুনিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন,—

ঐ জানালা থেকে দেখ।

বিন্দু ও বিন্দুর জেঠাইমা জানালার নিকট গিয়া দেখিতে লাগিলেন। জুড়ী আসিয়া ফাটকের নিকট দাঁড়াইল, ধনঞ্জয় ও একটী বাবু গাড়ী হইতে নামিলেন। দ্বারদেশে একটী বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া ছিল তাহার সঙ্গে দুই জনে কি কথা কহিতে লাগিলেন। তিন জনে পরামর্শ করিতে করিতে উপরে গেলেন।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,—জেঠাইমা, ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে ও বাবুটী কে?

বিন্দুর জেঠাইমা। ও গো ঐ ত আমার জামাইয়ের শনি। ওঁর নাম সুমতি বাবু, কলিকাতার যত বড় মানুষের কাছে গিয়ে পোড়ামুখো অমনি করে হেসে হেসে কথা কয় গো, আর যত মন্দ রীত চরিত শিখায় আর টাকা ফাঁকি দেয়। জামাইয়ের কত টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে ভগবান্‌ই জানেন! যম কি পোড়ামুখোকে ভুলে আছেন?

বিন্দু। আর ঐ বুড়ীটা কে, ঐ যে হাত নেড়ে নেড়ে

হেসে হেসে বাবুদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে উপরে গেল ?

জেঠাইমা। কে জানে ও হতভাগী মাগীটা কে,—এই কয়েক দিন অবধি জোঁকের মত আমার জামাইয়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে। কি কুচক্রে ঘুরচে, কে জানে ?

ক্ষীণ স্বরে উমা কহিলেন, "মা, আমি জানি, তোমরাও শীঘ্র জানিবে।" রোগী পাশ ফিরিয়া শুইলেন ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উমা একটু ঘুমাইয়াছে বিবেচনা করিয়া বিন্দু সে দিন বিদায় হইলেন।

সেই দিন অবধি বিন্দু প্রায় প্রত্যহ উমাকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু বিন্দুর স্নেহ, উমার মাতার যত্ন, সমস্তই বৃথা হইল। রোগীর মনে সুখ নাই, আশা নাই, জীবনে আর রুচি নাই ; তাহার কাশি অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাশাও বাড়িল ; দুর্ব্বল ক্ষীণ উমা সমস্ত দিন প্রায় আর কথা কহিতে পারিত না। তখন চিকিৎসকগণও আরোগ্যের আশা ত্যাগ করিল, আজ যায় কাল যায়, সকলে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিল।

শেষে বিন্দু কালীর বাড়ীতে খবর পাঠাইলেন ও কালীকে সঙ্গে করিয়া উমাকে দেখিতে গেলেন।

হতভাগিনী বিধবা কালীদিদিকে দেখিয়া রোগীর চক্ষু হইতে ধারা বহিয়া জল পড়িতে লাগিল ; রোগী কথা কহিতে পারিলেন না। কালী ও উমার একটী হাত ধরিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পীড়া বড় বাড়িল। সন্ধ্যার সময় নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ, প্রায় পাওয়া যায় না। চিকিৎসক আসিয়া মুখ ভারি করিল,

একটী নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, বলিলেন,—সমস্ত রাত্রি দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে, প্রাতঃকালে আবার আসিব।

উমার মাতা এ কয়েক দিন ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন। বিন্দু বলিলেন,—জেঠাইমা আজ তুমি ঘুমাও, আজ আমি রাত্রিতে থাকিব, উমার কাছে আমিই বসিয়া আছি।

কালীতারাও থাকিতে ইচ্ছা করিল।

রাত্রি ৯টা হইয়াছে, তখন বিন্দু একবার ঔষধ খাওয়াইলেন। উমা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—আর কেন ঔষধ? আমি চলিলাম। যাইবার সময় তোমাদের মুখ দেখিয়া মরিলাম এই আমার পরম সুখ। বিন্দুদিদি, কালীদিদি, আমাকে মনে রাখিও।

বিন্দু ও কালী রোগীর দুই হস্ত আপনাদিগের বক্ষে ধারণ করিলেন, নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পর উমা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,— মা, মা। উমার মাতা পাশেই শুইয়া ছিলেন, তাঁহার ঘুম হয় নাই। তিনি কন্যার আরও নিকটে আসিলেন। উমা দুই হাত তুলিয়া মার গলা ধরিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টে বহিতে লাগিল, হস্ত পদ হিম হইল, নখ গুলি নীল বর্ণ হইল, চক্ষু স্থির হইল, মাতৃ বক্ষে স্নেহময়ী উমার মৃত দেহ শান্তি প্রাপ্ত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় উমার মাতা ও বিন্দু ও কালীতারা পাল্কী করিয়া সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। ফাটকের নিকট তাঁহারা দেখিলেন সেই সুমতি বাবু সেই বৃদ্ধার

সঙ্গে, বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া নামিয়া আসিতেছেন। বিন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,

জেঠাইমা, ও বুড়ী কে তুমি এখন জেনেছ।

জেঠাইমা কোনও উত্তর করিলেন না। দুই তিন বার বিন্দু জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,—ঐ বুড়ী মাগীর বনঝি না কে একটা আছে, সে এই থিয়েটারে সীতা সাজে, সাবিত্রী সাজে, রাধিকা সাজে,—তার মুখে আগুন। সুমতি বাবু সেইটাকে ধনঞ্জয় বাবুর কাছে আনিয়াছিলেন, তার নাম করে ১০।১৫ হাজার টাকা বাব করে নিয়েছেন, ভগবান্ই জানেন। বাছা উমা বেচে থাকিতে সেটাকে বাড়ী আনেন নি, এখন নাকি বাড়ীতে এনে রাখবেন, তার জন্য অনেক টাকা দিয়ে ঘর সাজান হয়েছে।

* * * * *

ধনবান্, গুণবান্, রূপবান্ ধনঞ্জয় বাবু কলিকাতা সমাজের একটী শিরোরত্ন। সকল সভায় তাঁহার সমান আদর, সকল স্থানে তাঁহার গৌরব, সকল গৃহে তাঁহার খ্যাতি। তাঁহার অমাত্যেরা তাঁহার বদান্যতার সুখ্যাতি করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার রুচির প্রশংসা করেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার হিঁদুয়ানীর প্রশংসা করেন, কন্যাকর্ত্তাগণ (উমার মৃত্যুর পর) তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনার্থ ঘন ঘন ঘটকী পাঠাইতেছেন। রাজপুরুষেরা ধনাঢ্য বদান্য জমিদার পুত্রকে রাজা খেতাব দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

সুবিজ্ঞ সুশিক্ষিত সুমতি বাবু শীঘ্র কলিকাতার এক জন অনরারি মেজিষ্ট্রেট হইবেন এইরূপ শুনা যায়। তিনি

সাহেবদিগের সহিত সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ করেন, এবার লেভিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ভদ্রাচরণ ও সুমার্জ্জিত কথা বার্ত্তা শ্রবণে সকলে তুষ্ট হইয়াছেন। সুমতি বাবুর গাড়ী ঘোড়া আছে, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, ও মিষ্ট কথায় অসাধারণ ক্ষমতা আছে; তিনি সাহেব সুবোকে তুষ্ট রাখেন, বড় মানুষদের সর্ব্বদাই মন যোগান, উন্নতির পথে ক্রমশঃই উঠিতেছেন। তিনিও সমাজের একটী শিরোরত্ন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

শরৎ বাবুর পরীক্ষা অতি নিকটে, তিনি সমস্ত দিনই পড়েন; বাড়ীর ভিতর বড় যান না। শরৎ পড়িয়া পড়িয়া বড় কাহিল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহার অনেক যত্ন সুশ্রুষা করেন, শরতের খাওয়া দাওয়া দেখেন, যাতে শরৎ একটু ভাল থাকেন, একটু গায়ে সারেন সে বিষয়ে দিবা রাত্রি যত্ন করেন। কিন্তু শরতের চেহারা ফিরিল না, শরৎ বড় পরিশ্রম করেন, রাত্রি জাগিয়া একাকী পড়িবার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকেন, তিনি দিন দিন আরও বিবর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন।

শরতের মাতা বলিলেন,—বাছা, এত পড়ে পড়ে কি ব্যারাম করিবে? তোমার পরীক্ষা দিয়ে কায নাই, চল আমরা তালপুখুরে ফিরে যাই, তোমার বাপের বিষয় দেখিও,

সচ্ছন্দে থাকিবে। কলিকাতার জল হাওয়া তোমার সহ্য হয় না।

শরৎ বলিলেন,—না মা, এই বয়সে লেখা পড়া ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় না। পরীক্ষা নিকট, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

কালীতারা পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে শরতের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। মনে করিল বৌ ঘরে এলে শরতের মনে স্ফূর্ত্তি হইবে, শরৎ একটু গায়ে সারিবে। সেই বিবাহের কথা এক দিন শরতের নিকট উত্থাপন করিলেন। শরৎ বলিলেন,—দিদি পড়িবার সময় ব্যস্ত কর কেন?

বিন্দুর জেঠাইমা এখন বিন্দুদের বাসায় থাকেন, এখনও তালপুখুরে ফিরিয়া যান নাই। তিনি সর্ব্বদাই শরতের মাতার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, এবং সমস্ত দিন ধরিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেন। তাঁহারা দুই জনে উমার কথা কহিতেন, কালীর কথা কহিতেন, আর মনের দুঃখে রোদন করিতেন। উমার মা বলিতেন,—দিদি, তখন যদি লোকের কথা না শুনে আমরা একটু বুঝে সুঝে কায করিতাম তা হইলে আর আজ এমনটী হইত না। তুমি তখন বড় কুল দেখিয়া বামুন পুরুতের কথা শুনিয়া কালীর বিবাহ দিলে, আমিও পড়সীর কথা শুনে বাছা উমার বড় মানুষের সঙ্গে বিবাহ দিলাম তাই আজ এমন হইল। তা ভগবানের ইচ্ছা, এতে কি মানুষের হাত আছে, আমরা যা মনে করি সেইটী কি হয়? তা দিদি, আমার যা হয়েছে তা হয়েছে, তুমি শরৎকে একটু দেখিও, বাছা পড়ে পড়ে বড় কাহিল হইয়া গিয়াছে। শরৎকে মানুষ কর, সুখে সংসার

করিতে পারে এইরূপ বিয়ে থা দাও, বৌ ঘরে নিয়ে এস, বৌয়ের মুখ দেখে শোক একটু ভুলিবে।

শরতের মাতা বলিতেন,—আমার তাই ইচ্ছে, বাছা যে কাহিল হয়ে গিয়াছে, আমার বড়ই ভাবনা হয়েছে। আমার ও বোধ হয় বিয়ে থা দিলে বাছা একটু গায়ে সারবে। তা শরৎ যে এখন বিয়ে করতে চায় না। তার উপর লোকে যে একটা নিন্দা রটিয়েছে, মনে হইলে কষ্ট হয়।

উমার মাতা। ছি, ছি, সে কথা আর মুখে এন না। আমি তখন মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত, কিছু দেখতে শুনতে পাইনি, তা না হইলে কি আমার এমন হয়। বাছা বিন্দু ছেলে মানুষ, হেম আর শরৎও ছেলে মানুষ, ওরা সব সে দিনকার ছেলে, সে দিন ওদের হাতে করে মানুষ করেছি, ওদের কি এখনও তেমন বুদ্ধি সুদ্ধি হয়েছে? তা নয়। বুদ্ধি থাকলে কি আর এমন কায করে? তা যা হয়েছে হয়েছে, বিন্দু আর সে কথাটা মুখে আনে না; তা তাতে তোমার ছেলের বিয়ে আটকাবে না, নিন্দে মেয়েদেরই। ভুগিতে হবে, নিন্দে সইতে হবে, বিন্দুকে আর বাছা সুধাকে। আহা সে কচি মেয়ে, কিছু জানে না, সে দিন অবধি বেরাল নিয়ে খেলা করিত, আর আঁকুসি দিয়ে পেয়ারা পেড়ে খেত, তাকে ও এমন কলঙ্কে ডোবায়। আহা বাছার শরীর খানি যেন খেংরা কাঠী হয়ে গিয়েছে, মুখ খানি সাদা হয়ে গিয়েছে, চোক দুটী বসে গিয়েছে। দুদের ছেলে, এমন কলঙ্ক কি সে সইতে পারে? তা কপালে নিন্দে আছে, কে খণ্ডাবে বল?

শরতের মা। আহা বাছা সুধার কথা মনে হলে আমার

বুক ফেটে যায়। কচি মেয়ে, ছেলে বেলায় বিধবা হয়েচে, আহা বাছার কপালে যে কি কষ্ট তা আমরাই বুঝি, সে দুদের ছেলে সে কি বুঝিবে? তার উপর আবার এই নিন্দে? যারা নিন্দে করে তাদের কি একটু মায়া দয়া নেই গো, একটু বিচার নেই? সুধা কি করেছিল? তার এতে কি দোষ বল? আর কাকেই বা দোষ দি? বাছা বিন্দুও ত মন্দ ভেবে এ কায করে নি; শরৎ সুধাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কলিকাতায় নাকি এমন বিয়ে কটা হয়ে গিয়েছে; বিন্দু ছেলে মানুষ, সে মনে ভাবিল এ বিয়ে হলেই বা। না হয় লোকে দুটা মন্দ বলিবে, শরৎ আর সুধা ত সুখে থাকিবে। এই ভেবেই বিন্দু কাযটা করিতে চেয়েছিল, সেও মন্দ ভেবে করে নি। আহা বিন্দুকে আমি ছেলে বেলা থেকে জানি, তার মত মেয়ে আমাদের গ্রামে নেই। তা বিন্দু আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তাকে আসিতে বলিও, তাকে দেখলেও প্রাণটা জুড়ায়।

উমার মা। আমি বলি গো বলি, তা সে সমস্ত দিনই কায করছে তাই আসতে পারে না। বাছা সুধা ত আর এখন কিছু কায করিতে পারে না, তার যে শরীর হয়েছে, তাকে বড় কায করিতে দি না। আমিও এই শোকে আর পেরে উঠি নি, কুটনো কুটতে উমাকে মনে পড়ে, ভাত বাড়তে উমাকে মনে পড়ে, উঠতে দাঁড়াতে উমাকে মনে পড়ে। আহা বাছারে, এই বয়সে মাকে ফেলে কেমন করে গেলি?—উভয়ে অনেকক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন।

কালীতারা সেই সময়ে ঘরে আসিলেন। উমার মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

হেঁ কালী, তোর ভাই অমন হয়ে যাচ্ছে কেন? তুই একটু দেখিস বাছা একটু খাবার দাবার যত্ন করিস, পড়ে পড়ে কি ব্যারাম করবে?

কালী। আমি যত্ন করিগো, কিন্তু সদাই পড়া শুনা করে; খাওয়া দাওয়ায় তেমন মন নেই, তাই কাহিল হয়ে যাচ্ছে।

উমার মা। বিয়ের কথা বলিছিলি?

কালী। একবার কেন, অনেকবার বলেছিলাম।

উমার মা। কি বলে?

কালী। সে কথায় কাণ দেয় না, কিম্বা বলে বিবাহে আমার রুচি নাই। অনেক জেদ করিয়া, মার নাম করিয়া বলিলে বলে, মাকে বলিও, মা যদি নিতান্ত ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে আমি বিবাহ করিব, কিন্তু তাহাতে আমি সুখী হইব না।

উমার মা। ও সব ছেলে অমনই করে বলে গো, তার পর বৌকে পছন্দ হলেই মন ফিরে যায়। আমার বোধ হয় বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

শরতের মা। না দিদি, বাছা শরৎ আমার কাছে কখনও মনের কথা ঢেকে রাখে না। আমার ভয় করে, আমি জোর করে বিয়ে দিলে পাছে শরৎ অসুখী হয়। আমার কপাল ত অনেক দিনই ভেঙ্গেছে, বাছা কালীর উপরও ভগবান্ নির্দ্দয় হইলেন, (রোদন) কেবল শরৎই আমার ভরসা, শরৎ যদি অসুখী হয়, এ চক্ষে দেখিতে পারিব না।

উমার মা। বালাই, কেন গা বাছা শরৎ অসুখী হবে? তা এখন বিয়ে না করে নেই নেই, পরে বে করবে। এখন পড়া শুনায় মন দিয়েছে, না হয় পড়ুক না, সে ভালই ত।

শরতের মা। দিদি, পড়া শুনাও যে তেমন হইতেছে, আমার বোধ হয় না। শরতের চিরকাল পড়া শুনায় মন আছে, সে জন্য সে এমন কাহিল হইয়া যায় না।

উমার মা সে দিন বিদায় হইলেন। কালীতারা বলিলেন —মা, তবে শরতের জন্য কি করিব? ডাক্তার দেখাব?

মাতা। বাছা, মনের ভাবনায় ডাক্তার কি করিবে? চিকিৎসক সে রোগ চিকিৎসা করিতে জানে না।

কালী। তবে কি হবে? বিন্দুদিদির সঙ্গে এক দিন পরামর্শ করিয়া দেখিব? আমাদের যখন যা কষ্ট হইত, বিন্দু দিদিই আমাদের পরামর্শ দিতেন।

মাতা। বিন্দু এ বিষয়ে পরামর্শ দেবে না।

কালী। দেবে বৈ কি মা, আমি এক দিন বিন্দুদিদির বাড়ী যাব এখন।

শীতকালে শরতের পরীক্ষা আসিল। শরতের সহাধ্যায়ীরা সকলেই বলিল পরীক্ষায় হয় শরৎচন্দ্র না হয় তাহার এক জন সহাধ্যায়ী কার্ত্তিক চন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। এক মাস পর পরীক্ষার ফল জানা গেল, কার্ত্তিক চন্দ্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইলেন, সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র দিগের মধ্যে শরতের নাম নাই!

তখন শরতের মাতা শরৎকে ডাকাইয়া বলিলেন,—বাছা এত করে পড়ে শুনে হাড় কালী করেও ত পরীক্ষায় পারিলে না। এখন কি করিবে?

শরৎ কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন,—মা একবারে পারি নাই, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি না। পরীক্ষা বড় কঠিন, অনেকেই প্রথম বার উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

কালীতারাও কয়েক দিন বিন্দুদিদির বাড়ী গেলেন, কিন্তু বিন্দু কোনও পরামর্শ দিতে পারিলেন না, বলিলেন,—তোমার মাকে বলিও জেঠাইমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শরৎ বাবুর জন্য যাহা ভাল হয় তাহা করিবেন। আমরা বন ছেলে মানুষ, আমরা কি এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিতে পারি!

কালী এই কথা গুলি মাতাকে বলিলেন।

মাতা। বাছা সুধাকে কেমন দেখিলে?

কালী। সুধা ভাল আছে। কিন্তু কলিকাতায় এসে কি বদলে গেছে, এখন আর তাকে চেনা যায় না। সে এখন ঢেঙ্গা হয়েছে, একটু কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু বেশ কায কর্ম্ম করছে। রংটাও সে ছেলে বেলার মত কাঁচা সোণার রং নেই, এখন কাল হয়ে গেছে, এখন আর সে তালপুখুরের সেই কচি মেয়েটীর মত নেই।

বুদ্ধিমতী শরতের মাতা কোনও উত্তর করিলেন না। সমস্ত দিন আপনা অপনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কয়েক দিন অবধি প্রায়ই একাকী বসিয়া ভাবিতেন। পরে একদিন রাত্রেতে শয়ন করিতে যাইবার সময় মনে মনে বলিলেন,—

বাছা শরৎ, মাতার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা তুমি করিয়াছ। ভগবান্ সহায় হউন, সন্তানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি করিব।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

গুরুদেবের আদেশ।

পর দিন প্রাতঃকালে শরতের মাতা এক খানি শিবিকা আরোহণ করিয়া ভবানীপুর হইতে উত্তর দিকে বঁড়শে বেহালা নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একটী ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে পাল্কী নামান হইল, শরতের মাতা পাল্কীর ভিতরে রহিলেন, সঙ্গে ঝি ছিল সে কুটীরের ভিতরে গেল।

ক্ষণেক পর সেই ঝির সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার বয়স কত, ঠিক অনুভব করা যায় না। মস্তকে অল্পই কেশ আছে তাহা সমস্ত শুক্ল, শরীর গৌর বর্ণ ও বলিপূর্ণ, মুখ খানি বার্দ্ধক্যের রেখায় অঙ্কিত। ইনি তালপুখুরের ঘোষ বংশের কুলগুরু। গুরুদেবের সঙ্গে একজন তেজস্বী ব্রহ্মচারীও বাহিরে আসিলেন, তিনি সম্প্রতি কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

গুরুদেব। মা, আজ কি মনে করিয়া আমাকে সাক্ষাৎ দিতে আসিয়াছ? আইস ঘরে আইস।

শরতের মাতা বৃদ্ধের সঙ্গে ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

পিতা কুশলে আছেন?

গুরুদেব। হঁ বাছা, ভগবানের ইচ্ছায় আমার শরীর সুস্থ আছে। বাছা, তোমার সমস্ত মঙ্গল?

শরতের মাতা। ভগবান্ জীবিত রাখিয়াছেন; কিন্তু

মনের সুখলাভ করিতে পারি নাই। আমার কন্যা কালীতারা আজি কয়েক মাস বিধবা হইয়াছে।

গুরুদেব। নীরবে একটী অশ্রুবিন্দু ত্যাগ করিলেন, বলিলেন,—মা, রোদন করিও না, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই সাধিত হইবে। কে নিবারণ করিতে পারে?

শরতের মাতা। সে কথা সত্য। কিন্তু কালীর বিবাহের সময় আমি গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, আপনার কথা শুনিলে এ কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, বাছা কালীকে এই বয়সে জলে ভাসাইতাম না। সেই সন্তাপ আমার মনে দিবানিশি জ্বলিতেছে।

গুরুদেব। আপনাকে দোষ দিবেন না। এ সমস্ত মনুষ্যের হাত নহে, এ সকল বিষয়ে আমাদের পরামর্শ অতি অকিঞ্চিৎকর। আমরা অনেক পরামর্শ করিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া, ভাল বুঝিয়াই কায করি, মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদিগের কল্পনা ও চিন্তা বিফল হইয়া যায়, ভগবান্ আপনার অভীষ্ট অনুসারে কার্য্য করেন।

শরতের মাতা। তথাপি সৎপরামর্শ লইয়া করিলে পরে আক্ষেপ থাকে না। পিতা সেই জন্য অদ্য আপনার কাছে আর একটী বিষয়ে সৎপরামর্শ লইতে আসিয়াছি। একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে আপনার মত লইতে আসিয়াছি।

গুরুদেব। মা, তুমি জানই ত আমি ক্রিয়া কর্ম্মে যাওয়া অনেক বৎসর অবধি বন্ধ করিয়াছি, কোন শাস্ত্রীয় মতামতও দিতে এখন সমর্থ নহি। আমা অপেক্ষা বিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

কলিকাতায় ও নবদ্বীপে আছেন, শাস্ত্র আলোচনা করাই তাঁহাদের ব্যবসা, ক্রিয়া অনুষ্ঠানে তাঁহারা সুদক্ষ, মতামত দিতেও তাঁহারা সুপারগ। আমি সে ব্যবসা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কেবল পরকালের সুখের জন্য প্রত্যহ দেব অর্চ্চনা করি, মনের তুষ্টির জন্য একটু ইচ্ছানুসারে শাস্ত্রাদি পাঠ করি। সে অতি সামান্য।

শরতের মাতা। পিতা, যদি কেবল একটী ক্রিয়া সম্বন্ধে মত লইবার আবশ্যক হইত তাহা হইলে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না, কিন্তু আপনারা আমার স্বামীদেবের বংশানুগত গুরুদেব; আপনি আমার শ্বশুর মহাশয়ের সুহৃদ্ ছিলেন, স্বামী মহাশয়ের গুরু ছিলেন। আমাদের বংশে একটু বিপদ আপদ হইলে আপনার নিকট পরামর্শ লইব না ত কাহার নিকট লইব? আপনি আমাদের সংসারের জন্য যে টুকু স্নেহ ও মমতা করিবেন, কে সেরূপ করিবে? আমাদের আর কে সহায় আছে?

গুরুদেব। মা রোদন করিও না, আমার যথাসাধ্য আমি তোমাদের জন্য করিব। কিন্তু বৃদ্ধের ক্ষমতা অল্প, বিদ্যাও অল্প।

শরতের মাতা। যাঁহারা অধিক বিদ্যার অভিমান করেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইতে আমার রুচি হয় না। আপনার কতটুকু বিদ্যা তাহা আমাদের বঙ্গদেশে অবিদিত নাই, তা না হইলে এই ক্ষুদ্র পল্লিতে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে কাশী প্রভৃতি দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিত না। পিতা আপনার কথাই আমার পক্ষে বেদবাক্য।

গুরুদেব। মা, তোমার ভ্রম হইয়াছে, আমার শাস্ত্রজ্ঞান সামান্য। আমাদের শাস্ত্র সমুদ্রতুল্য, আমি গণ্ডূষ মাত্র জল গ্রহণ করিয়াছি। অধ্যায়ীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আমার বড় ভাল লাগে, তাহাদিগের জন্য আমার মনে একটু স্নেহ উদয় হয়, সেই জন্যই দুই এক জন আমার নিকট আসেন, সম্প্রতি কাশী হইতে এই ব্রহ্মচারী ঠাকুর আসিয়াছেন।

শরতের মাতা। পিতা, সেই স্নেহটুকু পাইবার জন্য আমিও আসিয়াছি, কন্যাকে স্নেহ করিয়া একটু পরামর্শ দিন।

গুরুদেব। মা, বল তোমার কি বলিবার আছে, আমি তোমার স্বামীর বংশ বহুকাল অবধি জানি, আমার সামান্য ক্ষমতায় যদি তোমাদের কোনও উপকার সাধন করিতে পারি, সাধ্যানুসারে তাহা করিব।

শরতের মাতা ধীরে ধীরে কহিলেন,—

পিতা, আমার পুত্র শরতের সহিত একটী বালবিধবার বিবাহের কথা হইতেছে, সেই বিষয়ে আপনার মত, আপনার পরামর্শ, আপনার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।

গুরুদেব শরতের মাতাকে বাল্যকাল হইতে জানিতেন, তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম অনুষ্ঠানে প্রগাঢ়মতি জানিতেন, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—

মা, বিধবা বিবাহ আমাদিগের রীতি বিরুদ্ধ, প্রচলিত শাস্ত্র বিরুদ্ধ, প্রচলিত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তাহা কি তুমি জান না? এ ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত, সকলেই আপনাকে এ কথা বলিতে পারিত, এটী জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ কি জন্য?

শরতের মাতা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সর্ব্বসম্মত মত জানিতে চাহি না, সে জন্য আপনার কাছে আইসি নাই। আপনার মত, আপনার পরামর্শ, জানিতে ইচ্ছা করি এই জন্য আসিয়াছি। শ্রবণ করুণ, আমি নিবেদন করিতেছি।

তখন শরতের মাতা আপন দুঃখের ইতিহাস আদ্যোপান্ত গুরুদেবের নিকট বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিন্দুর মাতার কথা, বিন্দু ও হেমের কথা, হতভাগিনী সুধার কথা, তাহাদিগের কলিকাতায় আইসার কথা, শরৎ ও সুধার পবিত্র প্রণয়ের কথা, লোকের লজ্জাবহ অপযশের কথা, নিরাশ্রয় নির্দ্দোষ সুধার অখ্যাতি, অবমাননা, অসহ্য যাতনা ও শরীরের দুরাবস্থার কথা, চিরদুঃখিনী কালীতারার কথা, হতভাগিনী উমার কথা, সমস্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। সে কথা শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল, কাশীর ব্রহ্মচারীর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। শেষে শরতের মাতা বলিলেন—

গুরুদেব, আমাদিগের চারিদিকেই দুর্দ্দশা উপস্থিত, এ ঘোর বিপদে পিতার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিলাম। লোকের কথায় মত্ত হইয়া উমার মা উমাকে বড়মানুষের ঘরে বিবাহ দিলেন,—বাল্যকালেই সে উমা যাতনায় প্রাণত্যাগ করিল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া, আপনার সৎ-পরামর্শ তখন তুচ্ছ করিয়া, আমি বড় কুলে কালীর বিবাহ দিলাম, ভগবান্ সে পাপের শাস্তি আমাকে দিয়াছেন। বাছা কালীর মুখের দিকে চাহিলে আমার বুক ফেটে যায়। সংসারে আমার আর কেহ নাই, জগতে আমার আর সুখ নাই; বাছা

শরৎ ভিন্ন আমার অবলম্বন নাই; আর বাছা বিন্দু ও সুধা আছে। তারাও আমার পেটের ছেলের মত, তাদের অভাগিনী মা মরিবার সময় তাদের আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। গুরুদেব! আপনিই এখন ইহাদের বন্ধু, আপনিই ইহাদিগের অভিভাবক, আপনি এ গুলির ভার লউন, যাহা ভাল বিবেচনা করেন করুন;—এ অনাথা বিধবা আর এ ভার বহনে অক্ষম।

এই কথাগুলি বলিয়া শরতের মাতা ঝর ঝর করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন, পিতৃতুল্য গুরুর নিকট দুঃখের কথা বলিয়া যেন সে ব্যথিত হৃদয় একটু শান্ত হইল।

শরতের মাতার কথা শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের চক্ষু অনেক-বার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়াছিল, এখন নিরাশ্রয় বিধবাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহারও নয়ন হইতে দুই শীর্ণ গণ্ডস্থল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ ক্ষণেক আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

ক্ষণেক পর বলিলেন, মা, তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার মন বড় বিচলিত হইয়াছে। এখন কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

শরতের মাতা। পিতা, আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য বিধবা-বিবাহ মহাপাপ কি না।

গুরুদেব। বাছা, জগদীশ্বরই পাপ পুণ্য ঠিক নিরূপণ করিতে পারেন;—আমরা শাস্ত্রের কথা কিছু কিছু বলিতে পারি।

শরতের মাতা। তাহাই বলুন। আমাদের সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে কি এ কায রহিত? লোক-নিন্দার কথা আমাকে

বলিবেন না; আমার অধিক দিন বাঁচিবার নাই, লোক-নিন্দায় আমার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

গুরুদেব। মা, শাস্ত্র একখানি নয়, সকলগুলি এক সময়ের নয়, সকলগুলিতে এক কথা লিখা নাই। যে সময়ে এই হিন্দু জাতির যেরূপ আচার ব্যবহার ছিল তাহারই সার ভাগ, উৎকৃষ্ট ভাগটুকুই আমাদের শাস্ত্র।

শরতের মাতা। পিতা, আমি স্ত্রীলোক, আমি ও সমস্ত কথা ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সনাতন শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ কি না, এই কথাটুকু বলুন।

গুরুদেব। এখন ও প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখনকার শাস্ত্রে ও কার্য্যটী নিষিদ্ধ বৈ কি।

শরতের মাতা। পিতা এখনকার শাস্ত্র আর পুরাতন শাস্ত্র আমি জানি না,—আমি মূর্খ অবলা। আপনার পড়িতে কিছু বাকি নাই, যেগুলি আমাদের ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র তাহার মর্ম্ম কি এ দরিদ্র অনাথাকে বুঝাইয়া বলুন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। শুনিয়াছি কলিকাতার কোন কোন প্রধান পণ্ডিত বলেন যে শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে; কিন্তু আপনার মুখে সে কথা না শুনিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিব না। আপনার মতই আমার বেদবাক্য।

গুরুদেব অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন—

মা, তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ আমি কিছুই লুকাইব না, আমার মনের কথা তোমাকে বলিব। তুমি যে পণ্ডিতের কথা বলিতেছ তিনি আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্র-

বিদ্যা আমি জানি, তাঁহার প্রগাঢ় সত্যপ্রিয়তা আমি জানি। মা, এক দিন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিধবাবিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন আমি শাস্ত্রবিদ্যাভিমানী ছিলাম। কিন্তু মা, বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন, তাঁহার কথাটী প্রকৃত। বিধবাবিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। আমার পরম সুহৃদ্ রমাপ্রসাদ সরস্বতীরও এই মত,—তিনিও তাঁহার মত প্রকাশ করিয়া তোমাকে আশ্বস্ত করিবেন।

শরতের মাতা। পিতা, আপনার অনাথা কন্যাকে যে শান্তি দান করিলেন, জগদীশ্বর তজ্জন্য আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি শাস্ত্রের কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না, সামাজিক রীতির কথাও জিজ্ঞাসা করিব না। তবে ভগবানের নয়নে কাযটী ভাল কি মন্দ, এই একটী কথা জানিতে বাসনা করি। আপনারা দুইজন পণ্ডিত আছেন, একটী উত্তর দিয়া বিধবাকে শান্তি দান করুন।

রমাপ্রসাদ সরস্বতী। মা, যিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনিও এ কথার উত্তর দিতে অক্ষম, এ হীনবুদ্ধি কিরূপে ইহার উত্তর দিবে? জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অণুমাত্রও জানিতে পারে, মনুষ্যের এরূপ ক্ষমতা নাই। তবে যিনি করুণাময়, তিনি বালবিধবাকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুভব হয় না।

সরস্বতী ঠাকুরের স্থির, গম্ভীর, পুণ্যময় কথাগুলি সেই ক্ষুদ্র কুটীরে শব্দিত হইতে লাগিল। সরস্বতী ঠাকুর কে?

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

বৈশাখ মাসে তালপুখুর গ্রামে আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র ও তাঁহার পরিবারের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদের এক বৎসর মাত্র পরিচিত হইলেও বড় স্নেহের পাত্র। পুনরায় বৈশাখ মাস আসিয়াছে, চল তাঁহাদের সেই তালপুখুর গ্রামের বাটীতে যাইয়া বিদায় লই।

হেমের কিছু হইল না, তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। তিনি বৎসর যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া পুনরায় চাষবাস দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাকে হাইকোর্টে কোনও একটী কার্য্য দিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মার্জ্জিতবুদ্ধি যুবক মাত্রই এমন সুবিধা পাইলে আপনার বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু হেমের বুদ্ধিটা তত তীক্ষ্ণ নহে, বুদ্ধিটা কিছু পাড়াগেঁয়ে, সুতরাং তিনি সে কার্য্য না লইয়া পাড়াগাঁয়ে ফিরিয়া আসিলেন। শরৎ তাঁহাকে কলিকাতায় আর কয়েকমাস থাকিতে অনেক জেদ করিয়াছিলেন; হেম বলিলেন, না শরৎ, কলিকাতা নগরী যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর দেখিতে বড় রুচি নাই।

বিন্দু পূর্ব্ববৎ কচি আঁবের অম্বল রাঁধিতে তৎপর, এবং এক্ষণে সে রন্ধন কার্য্যের একটী সুবিধাও হইয়াছিল। বিন্দুর জেঠাইমার উমা ভিন্ন আর সন্তানাদি ছিল না; উমার মৃত্যুর পর তাঁহার জীবনে বিশেষ সুখ ছিল না; তিনি প্রায়ই দুই

প্রহরের সময় বিন্দুর বাটীতে আসিতেন। বিন্দুর বাড়ীর রকেতে তিনি পা মেলাইয়া বসিতেন, বিন্দুর ছেলেগুলিকে লইয়া খেলা করিতেন, অথবা সনাতনের গৃহিণীর সহিত বসিয়া গল্প করিতেন, সেও বিন্দুর জেঠাইমার চুলের সেবা করিত। আর বিন্দু, (আমাদের লিখিতে লজ্জা হইতেছে) সমস্ত দুই প্রহর বেলা নাউশাক কাটিত, সজনে খাড়া পাড়িত, অথবা আঁকসি দিয়া কচি আঁব পাড়িত। জেঠাইমা বলিতেন, বিন্দু মেয়েটী ভাল বটে, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি কখনও পাকিল না।

তারিণী বাবুর একমাত্র কন্যা মরিয়াছে তাহাতে তিনি একটু শোক পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক, শীঘ্রই সে শোক ভুলিলেন। তাঁহার কার্য্যেও বিশেষ উৎসাহ ছিল, বিশেষ বৰ্দ্ধমান কালেক্টরির সেরেস্তাদারি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং উৎসাহী তারিণীবাবুর জীবন উদ্দেশ্য-শূন্য নহে।

শরতের মাতা সাশ্রুনয়নে বধূ সুধাকে ঘরে আনিয়া বৃদ্ধ বয়সে শান্তিলাভ করিলেন। বিবাহটা কলিকাতায়ই হইয়াছিল, কেহ বিবাহে আসিলেন, কেহ বা আসিলেন না, কিন্তু কাযটা তজ্জন্য বন্ধ রহিল না। যাঁহারা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারাও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন না। শান্ত প্রকৃতি দেবীপ্রসন্ন বাবু একবার আসিবেন আসিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার বাড়ীর ভিতরে সে কথাটা উত্থাপন করায় বিশেষ হিতকর উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার পর আর আসিবার কথাও কহিলেন না। পাড়ার দলপতি, সমাজপতি, ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একটা খুব হুলস্থূল করিলেন, খুব গণ্ডগোল

করিলেন, কাযটা বাধা দিবারও বিশেষ চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু সে কাল গিয়াছে,—সেরূপ বাধা দেওয়ার এক্ষণে লোকের গুণাগুণ প্রকাশ পায়, কায বন্ধ থাকে না। চন্দ্রনাথ সমস্ত ভবানী-পুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত সেই বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন, কলিকাতার অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিলেন; আনন্দের সহিত সে শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। পাড়ার সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিবাহ সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দলের কোন কোন পণ্ডিত আসিবেন বলিয়া সে দিকে বড় ঘেষিলেন না! পাড়ার দেশহিতৈষী আর্য্য-সন্তানগণ, যাঁহারা এই অনার্য্য কার্য্যে বাধা দিবার জন্য ঢিল ছুড়িতে আসিয়া-ছিলেন, তাঁহারা একজন অনার্য্য পুলিষের সার্জ্জনের বিকৃত মুখ দেখিয়া অচিরে (ঢিল পকেটেই রাখিয়া) তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন!

শরৎ ও হেম পল্লীগ্রামে আসিলে গ্রামস্থ লোকে প্রথমে তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিলেন না। কিন্তু তারিণী বাবুর স্ত্রীর অনেক অনুরোধে তারিণী বাবু শেষে সকলকে ডাকাইয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন। মীমাংসা হইল যে শরৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু শরৎ কলেজের ছেলে—বলিলেন, আমি যে কার্য্যটী করিয়াছি তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব না। শেষে শরতের মাতা একদিন ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া দিলেন! তারিণী বাবু কিছু রসিক লোক ছিলেন, হাসিয়া শরৎ বাবুকে বলিলেন,—ওহে বাবু তোমরা বুঝ না, বৃষ্টির জল যে দিক দিয়েই যাক শেষকালে গিয়া নদীতে পড়িবেই পড়িবে। তোমরা বিধ-

বাই বিয়ে কর আর ঘরের বৌকেই বার করে নিয়ে যাও, বামুনদের পেটে কিছু পড়িলেই সব চুকিয়া যায়। এই আমাদের সমাজ হইয়াছে, তা তোমরা আপত্তি করিলেই কি হইবে? শরৎ উত্তর করিলেন, এইরূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্ঞ-ম্ভাবী, ন্যায় অন্যায়ের বিচার না থাকিলে সে সমাজও থাকে না।

সনাতনের স্ত্রী অনেকদিন বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া কাঁদিত। বলিত,—আমি তখনই বলেছিনু গো কলিকাতায় যেও না, কলিকাতায় গেলে জাত ধর্ম্ম থাকে না। ও মা সোণার সংসার কি হলো গা? আহা আমার সুধাদিদি, আমায় চিনিপাতা দৈ খেতে বড় ভাল বাসিত গো, ও মা তার মনে এত ছিল কে জানে বল? ও মা তখনই বলেছিনু গো, কলেজের ছেলে জেন্তু মানুষের গলায় ছুরি দেয়; ওমা তাই কল্লে গা? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সনাতনের গৃহিণী মনে মনে সুধাকে অনেক তিরস্কার করিত, কিন্তু মায়া কাটাতে পারিল না, আবার লুকাইয়া লুকাইয়া চিনিপাতা দৈ শরৎ বাবুর বাড়ী লইয়া যাইত। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

শরতের মাতা পূর্ব্ববৎ ধর্ম্ম কর্ম্মে সমস্ত দিন মন দিতেন, সংসারের কিছু দেখিতেন না! কালীতারা সংসারের গৃহিণী, এত দিন পর জীবনের শান্তি কাহাকে বলে তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি ভাঁড়ার রাখিতেন, রন্ধনাদি করিতেন, সমস্ত গৃহটী পরিপাটী রাখিতেন, সংসার চালাইতেন। সুধা শরতের মাতাকে ভক্তিভাবে পূজা করিত, কালীদিদিকে স্নেহ

করিত, কালীদিদি যাহা বলিত তাহা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিত। ঘর ঝাঁট দিত, উঠান ঝাঁট দিত, পুখুর হইতে জল আনিত, বাটনা বাটিত, কুটনো কুটিত, দুদ জ্বাল দিত, আর পুখুরে যাইয়া বাসন মাজিতে বড় ভাল বাসিত। পুখুরধারে আঁব গাছ ছিল, কাঁঠাল গাছ ছিল, অন্যান্য ফলের গাছ ছিল, সুধা সেই থানেও ঘুরিত, যে ফলটা পাকিত, কালীদিদির কাছে আনিয়া দিত।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সুধা সেই গাছ গুলির মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কি একটা মনে ভাবিতেছে এমন সময়ে শরৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলিল,—কি ভাবিতেছ?

সুধা একটু লজ্জিত হইয়া মুখ ঢাকিয়া বলিল,—বলিব না।

শরৎ। হেঁ বলিবে বৈ কি, বল না।

শরৎ ধীরে ধীরে সেই কুসুম-স্তবকতুল্য দেহখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই লজ্জাবনতমুখীর প্রস্ফুটিত ওষ্ঠদ্বয়ে গাঢ় চুম্বন করিলেন। সে স্পর্শে সুধার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল। লজ্জায় অভিভূত হইয়া সুধা বলিল,—

ছি! ছেড়ে দাও।

শরৎ ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন,—তবে বল।

সুধা একটু হাসিয়া বলিল,—ছেলে বেলায় তোমাদের বাড়ীতে আসিতাম, তখন এই পেয়ারা গাছের পেয়ারা তুমি আমাকে পাড়িয়া দিতে তাই মনে করিতেছিলাম!

শরৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—সেই আমাদের প্রথম প্রণয় এখনও ভুলিতে পার নাই? আমাদের লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে শরৎ গাছে চড়িলেন, সুধা নীচে পেয়ারা কুড়াইতে।

লাগিল। এমন সময় ঘাটের নিকট একটা শব্দ হইল, কালী-দিদি ঘাটে আসিতেছেন। সুধা লজ্জিতা ও ভীতা হইল, এবার শরৎ বাবু কোন পথ দিয়া পলাইবেন? কিন্তু সুধা স্বামীর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণ জানিতেন না, শরৎ সেই গাছ হইতে এক লাফে বেড়া ডিঙ্গিয়ে গিয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন!

শরৎ সে বৎসর সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি লেখা পড়াও বিলক্ষণ শিখিলেন; কিন্তু বিন্দুদিদি আক্ষেপ করিতেন, তাঁর গাছে চড়া অভ্যাসটা গেল না।

সমাপ্ত।

লাহিড়ী এবং মিত্র কোম্পানি দ্বারা ২৯, নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ
"এলেম প্রেস হইতে মুদ্রিত।"